বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম।

সময় ও প্রবৃত্তি।*

ঈশ্বর স্বভাব সুলভ দ্রব্যে সকলকে সমান অধিকার দিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মি সমভাবে সর্ব্বত্র নিপতিত হইতেছে, এবং জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি কি ক্ষুদ্র কি ভদ্র, কি রাজা কি প্রজা, সমভাবে সকলেরই কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য মাত্রেই হস্তপদ বিশিষ্ট, এবং তাহাদের শারীরিক গঠন প্রায় সকলেরই এক প্রকার। মন ও চিন্তা শক্তি লইয়া সকলেই অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। দিবারাত্রি ষষ্টি দণ্ডে বিভক্ত। ঐ সময়ে সকলেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা রাখে, কেহই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; সেই জন্যই সংসারে মনুজকুল ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মনের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঈশ্বরানুকম্পায় যে সকল লোকের কিছুরই অভাব নাই, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে সুস্থির নহে; উহারা সাংসারিক সমস্ত সুখ সত্ত্বেও সুখানুভব করিতে পারে না। এরূপ শান্তি ভঙ্গের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হয়, বহু মূল্য সময় নিরর্থক নষ্ট করা হইবে না।

---

* Time and tendency.

মনুজকুলের আদিম অবস্থায় সকল বিষয়ই অনায়াস প্রাপ্য ছিল। এই জন্য সে সময় মানবজাতির আহার, নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য ব্যতিরেকে আর কিছুতেই রুচি ছিল না। উদর পূরিয়া আহার করিতে পাইলেই, গিরিগুহায় কি বৃক্ষের শীতল ছায়ায় পরম সুখে নিদ্রা যাইত। স্ত্রী পুরুষেরা বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ না থাকাতে, পশুবৎ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিত। ক্রমে কালের পরিবর্ত্তন হইলে, মনুষ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া কুটীরাদিতে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত বাস করিতে শিখিল। সেই সময় আপন আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে স্বার্থ রক্ষা এক বল ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে হেতু, তৎকালে রাজা নাই, ব্যবস্থা নাই, এবং ধর্ম্ম নাই যে, তাহার সাহায্যে কেহ আপন স্বার্থ রক্ষা করিবে; সুতরাং সমস্ত লোকেরই এই বিশ্বাস হইল যে, এক শারীরিক বলই সর্ব্ব সুখের মূল। যে বলবান্, সেই সকলের পূজ্য; এই জন্য সর্ব্ব সাধারণের বলের প্রতি লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এক এক অঞ্চলে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সেই সর্ব্ব সাধারণের আদরণীয় হইল। তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া সকলকেই চলিতে হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার নাম অধিপতি হইয়া উঠিল। সুন্দরী রমণীরা বলবানের পত্নী হইতে অভিলাষিণী হইলেন; যে হেতু, তাঁহারা জানিতেন, বলবান্ স্বামী ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা হইবেক না। পিতা মাতারাও বীর পুরুষকে কন্যা দান করিবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন ও প্রয়াস পাইতেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ ও স্বয়ম্বর, এবং ইউরোপে Tournament প্রভৃতিতে

স্বরূপা কন্যাগণ আপন আপন পতি মনোনীত করিয়া লইতেন। কেবল সুন্দরী কন্যাগণকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই Knight-errantry সৃষ্ট হইয়াছিল। বিভীষণ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবাহুকে রামচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিবার সময়, এই কথা বলিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, "হস্তী, অশ্ব, বিমানে সমান শিক্ষা ধরে। বীরবাহু সম বীর নাহিক সংসারে।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুন্তী দেবী তাঁহার পুত্র অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়-কন্যারা যে জন্য পুত্র প্রসব করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি কুরুসৈন্য সাগর মন্থন করিয়া আপন ভুজবলের পরিচয় দাও। এক সময়ে অষ্টাবক্র মুনি জনক দুহিতা সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, বৎসে, অচিরাৎ বীর পুত্র প্রসব কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার গর্ভজ পুত্র ভুজবলে এই জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য স্থাপন করিবে। পুরাণে বর্ণিত আছে, চন্দ্রবংশীয় কোনও রাজা প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, রাজ্ঞী তাহা জ্ঞাত হইয়া স্বহস্তে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। রাজা দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র কহিলেন, আর আমি তোমার মুখাবলোকন করিব না; কাপুরুষ পতির পত্নী হওয়া অপেক্ষা ক্ষত্রিয় কন্যার মরণই মঙ্গল। যখন সংসারে এইরূপ সময় ছিল, তখন শারীরিক বলে বলবান্ হইতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মিত?

মধ্যে কিছু কাল পণ্ডিতের যথোচিত গৌরব হইয়া উঠিয়াছিল। রাজারা পণ্ডিতদিগকে অতিশয় আদর করিতেন, এবং বৃত্তি দিয়া তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া দিতেন।

পরে আবশ্যক মতে সেই পণ্ডিতগণকেই সভাসদ ও প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিতেন। সেই সময় সুন্দরী কন্যারাও বিদ্যাবতী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন, যে পুরুষ আমাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। তৎকালে পণ্ডিতদিগের এতাদৃশ গৌরব হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তি জন্মিত; অধিক কি, সময়ে সময়ে লোক শরীরকে অসহ্য কষ্ট দিয়াও বিদ্যা লাভে প্রবৃত্ত হইত।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থলেই বুদ্ধির গৌরব হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধিবলে শারীরিক বল ও বিদ্যাবলকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগের উন্নতি করিতেন। প্রথম নেপোলিয়ন্, পিটর্ দি গ্রেট্, অগষ্টস্ সীজর্ প্রভৃতি মহাত্মারাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তৎকালে সামান্য কৃষকের মধ্যেও এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহন করিলে, সেও সাধারণের পূজ্য—অন্য কথা কি, রাজদরবারেও আদরের সহিত গৃহীত হইত; সুতরাং সে সময়ে এক বুদ্ধির প্রতিই সাধারণের লক্ষ্য হইয়াছিল।

কালে সংসারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। কি বলের, কি বিদ্যার, কি বুদ্ধির আদর কমিয়া আসিল। কি বলবান্, কি বুদ্ধিমান্, কি বিদ্বান্, সাধারণে সকলকেই সমভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিল। এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতি বশতঃ দ্বাদশ জন বলবান্ ব্যক্তিকে এক জন দুর্ব্বল লোক একটি বন্দুক হস্তে করিয়া অনায়াসে বিমুখ করিতে পারে। একটি উন্নত শৈলশৃঙ্গ, যাহা দশ সহস্র বলবান্ পুরুষে বহু কাল চেষ্টা করিয়াও ভূমিসাৎ করিতে পারিত না, সেই শৈলশৃঙ্গেরই দুই

পার্শ্বে দুইটি করিয়া তোপ ছুড়িলে,তাহা রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায়। এই জন্য শারীরিক বলের আর তত দূর প্রয়োজন বোধ হয় না। এতদ্ভিন্ন রাজা দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন বলিয়া শারীরিক বলে আর কাহারও বিশেষ অভিলাষ নাই। এদিকে আবার বিদ্যারও তাদৃশ গৌরব নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মূর্খ ধনীর দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া আর কেহই বিশেষ রূপ বিদ্যাবানের সম্মান রাখেন না। ঐরূপ বুদ্ধিমান্ লোকেরও আর বিশেষ আদর নাই। পূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা আপন গ্রামে এক জন বুদ্ধিমান্ লোক থাকিলে, তাঁহাকে সমূহ আদর ও সম্মান করিত, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। এক্ষণে প্রায় আর কেহই বুদ্ধিমান্ লোককে আদর করে না দেখিয়া আর কাহারও বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য নাই। এখন সর্ব্বতোভাবে ধনবানেরই আদর হইয়াছে। ধনবলে বলবান্ লোকদিগের অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইতেছে, এবং ধনবলের নিকট সমস্ত বল পরাভূত হইয়াছে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের এক মাত্র ধনের প্রতি লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন কালাবধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যে সময়ে অধিকাংশ লোকের যে দিকে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সময় অপরাংশ লোকেরও সেই রূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমাদের দেশের লোক তৎকালে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই, যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময় ভারতবর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, সেই সময় এক জন নিবিড় অরণ্যবাসী কিরাত আপন অধিকারের মধ্যে অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এক জন পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় ভূপাল কিরাত কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া বলপূর্ব্বক যজ্ঞের ঘোটক ও অপরাপর যজ্ঞীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। যবন রাজ্যের প্রথম অবস্থায় এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সামাজিক আচার ব্যবহার প্রতিপালনে ত্রুটি করিতেন না। যাগ যজ্ঞ, পিতৃমাতৃর শ্রাদ্ধ, ও নানা প্রকার ক্রিয়া কাণ্ড করাই হিন্দুজাতির প্রধান পুরুষার্থ বোধ ছিল। গ্রাসাচ্ছাদন হইয়া কিছু উদ্বৃত্তধন থাকিলেই, সামান্য গৃহস্থেরাও কোনও একটি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত। ন্যূন কল্পে সংকল্প করাইয়া পুরাণ পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইত। পরিবার মধ্যে এক জন উপার্জ্জনক্ষম হইলে, নিঃস্ব জ্ঞাতিবর্গ তাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ঐ অক্ষম জ্ঞাতিগণকে অন্ন বস্ত্র দিতে কৃতী এক দিনের জন্যও কষ্ট বোধ করিতেন না; বরং দশ জনে তাঁহার বাটীতে আহারাদি করে বলিয়া আপনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেন। তৎকালে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগেরও প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র ছিল। কিসে উত্তমরূপে রন্ধন করিতে শিক্ষা করিব, কিসে প্রতিবেশীরা আমাকে বুদ্ধিমতী গৃহিণী বলিয়া গণ্য করিবে, কিসে স্বামী আমার সেবা শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইবেন, ও কিসে পরকাল রক্ষা হইবে, এই সকল চিন্তাই তাঁহাদিগের নির্ম্মল মানসক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিচরণ করিত। তাঁহাদিগের সুপ্রবৃত্তি ছিল' বলিয়া কুপ্রবৃত্তি মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না। পূর্ব্ব কালে বালক বালিকারাও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। কিশোর বয়স্ক ব্রাহ্মণপুত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের পরই প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্প চয়ন করিত, এবং শিব পূজা ও সন্ধ্যা বন্দনাদির সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া

পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিত। কি ক্ষুদ্র, কি ভদ্র, কি ধনী, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র সমস্ত লোকেরই কন্যারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতানুযায়ী সাংসারিক কার্য্যের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। এতদ্ভিন্ন অবিবাহিতা কন্যাগণের কতকগুলি মনঃকল্পিত ব্রত নিয়ম ছিল। অদ্যাপি কোনও কোনও গৃহস্থের গৃহে সেই সকল ব্রত নিয়ম প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সেই সকল প্রবৃত্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। বালকগণ প্রত্যুষে উঠিয়াই চা ও বিস্কুট খাইয়া দিল্লীর দাস রাজগণের রাজত্বের বিবরণ পাঠে মনোযোগী হইয়াছে। বালিকাগণের মধ্যে কেহ বা 'বোধোদয়' পাঠ করিতেছে, কেহ বা কার্পেট বুনিতেছে, কেহ বা ভ্রাতার পাএর মাপ লইয়া জুতা বুনিবার উদ্যোগ করিতেছে।

ভালই হউক বা মন্দই হউক, সময়ে সময়ে কতকগুলি লোক এক এক বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে আরও কতক গুলি লোক তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে; ক্রমে অধিকাংশ লোকের সেই রূপ প্রবৃত্তি ঘটিতে থাকে। বিষয়ের ভাল, মন্দ, কিম্বা প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া সাধারণ লোক সেই সকল কার্য্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। কথিত আছে যে, এই কলিকাতার জন কতক শিক্ষিত হিন্দু যুবকই বর্ত্তমান হিন্দু আচারের বিপরীত সমাজ বহির্ভূত কার্য্য করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগকে সমাজ বহির্ভূত কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ হিন্দু সমাজ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্বজাতির চীৎকার শব্দে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া আপনাদিগের স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে

দেখিতে বহু সংখ্যক হিন্দু যুবক তাঁহাদিগের দলভুক্ত হইলেন। তৎকালে ধনবান্ লোকের পুত্রেরাই হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের আচার ব্যবহার দর্শনে নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন সকল ঘরের প্রায় একটি না একটি যুবক সেই দলভুক্ত হইল, তখন কুসংস্কারাপন্ন বৃদ্ধ সম্প্রদায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন, ও কর্ণে তুলা দিলেন। হিন্দু সমাজের বন্ধন শিথিল হইবার এই প্রথম সূত্রপাত হইল। ক্রমে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর যুবকবৃন্দ মিলিত হওয়াতে একটি প্রকাণ্ড দল হইল। তখন তাঁহারা চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন, 'আমরা মন্দ লোক নহি, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরাই আমাদিগকে মন্দ লোক বলে। আমরা যখন জ্ঞানালোকে আসিয়াছি, তখন কলুষিত হিন্দু সমাজের সংস্কার করিব, এবং দোষাকর দেশাচার উঠাইয়া দিব।' এই রূপে প্রত্যেক গৃহে পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ বপন হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ঘোরতর প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কেহ বা অর্থ সঞ্চয়ে ব্যতিব্যস্ত, কাহারও বা গবর্ণমেন্টের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবার জন্য বিশেষ ঝোঁক হইয়াছে, কেহ বা লোকের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। আবার, অন্য দিকে কাহারও বা কদর্য্য আমোদ, আহ্লাদ, ও বিলাস ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অধিক। অনেকেই সুরা সেবন, বারাঙ্গনা সহবাস, উদ্যান বিহার প্রভৃতি নীচ আমোদে সময় যাপন করে।

প্রবৃত্তি দুই প্রকার, সৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি। যাঁহারা ধর্ম্ম সঙ্গত, সমাজ সঙ্গত, ও যুক্তি সঙ্গত পথে বিচরণ করেন, এবং

পরোপকার, আত্মোন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল প্রভৃতি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের মতি, তাঁহাদিগকে সৎ প্রবৃত্তির লোক কহে। আর যাহাদের প্রতারণা, চৌর্য্য, পরস্ত্রী হরণ, সুরা পান, অবস্থার অতীত বিলাস প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে সমধিক উৎসাহ, তাহাদিগকে অসৎ প্রবৃত্তির লোক কহে। পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সময় সকলের পক্ষে সমান, সময়ের গতি কেহ রোধ করিতে সক্ষম নহে; কিন্তু যাঁহাদিগের সৎ প্রবৃত্তি, তাঁহারা অলীক আমোদে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনার ধন, প্রাণ ও মান বৃদ্ধি করিয়া সুখী হইতেছেন। আবার, যাহাদিগের অসৎ প্রবৃত্তি, তাহারা অসৎ কার্য্যে কাল ক্ষেপণ করিয়া আপনার ধন, প্রাণ ও মান নষ্ট করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। কোনও কালেই তাহাদিগের প্রকৃত সুখ বা উন্নতি দেখা যায় না।

সুপ্রবৃত্তি হউক বা কুপ্রবৃত্তিই হউক, এই দুই প্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি স্থল কোথায়, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে। কোনও কোনও পণ্ডিত কহেন যে, প্রবৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ; কারণ, দেখা যায় যে, অনেকানেক বালক বাল্যকাল হইতেই পাঠাভ্যাসে বিশেষ অনুরাগী হয়। তাহারা সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ লাভ করে, এবং অসৎ কথা শুনিতে বা অসৎ কার্য্য করিতে কোনও মতে ইচ্ছুক নহে। আবার, কোনও কোনও বালক বাল্যকাল হইতেই লোককে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে, অন্যায় বিষয়ে অত্যন্ত আবদার করে, পাঠাভ্যাসের পরিবর্ত্তে ক্রীড়া কৌতুকে বিশেষ অনুরাগী হয়। দেখা গিয়াছে, কোনও দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের জুয়া খেলায় ঘোর প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। তৎকালে তাহার অর্থ ছিল না, এবং পিতা মাতার তাড়নায় সমস্ত দিন তাহাকে বিদ্যালয়ে আবদ্ধ

থাকিতে হইত; কিন্তু সে সময় পাঠে মনোযোগী না হইয়া সেই বালক দ্যূতক্রীড়ার বিষয়ই চিন্তা করিত। সময় পাইলেই সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত জুয়া খেলিত। ক্রমে সে স্বাধীন হইয়া অর্থের মুখ দেখিল; তখন মনের সাধে জুয়া খেলিয়া অর্থ নাশ করিতে লাগিল। বাল্যকালে অর্থের অভাবেও জুয়া খেলায় যাহার এত দূর প্রবৃত্তি, কালে সে অর্থ পাইলে, তাহা কয় দিন রাখিতে পারে? উপরি উক্ত কারণে বোধ হইতেছে যে, প্রবৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ; কিন্তু সংসর্গ, অবস্থা, বংশ ও বয়স প্রভৃতি ভেদে উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এক জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই সেই পাচকের কুপ্রবৃত্তির আধিক্য বশতঃ সে সামান্য সামান্য দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করিত, ও অবসর কালে তাস পাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। তাহার প্রভু দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণে গমন করিবার সময় তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। পাচকের বয়ঃক্রম তৎকালে বিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় এক দিন কোনও সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার সঙ্গে উক্ত পাচকও গমন করিয়াছিল। সেই সভায় অনেকানেক পণ্ডিতের সমাগম হওয়াতে ঘোরতর বিচার আরম্ভ হইল। অবশেষে, পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্ব বিধায় জয় লাভ করাতে সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, এবং কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহাসম্মানের সহিত উচ্চ বিদায় দিলেন। এই রূপে চারি পাঁচ সভায় পণ্ডিত মহাশয় জয়যুক্ত হইয়া লোকের প্রশংসা ও উচ্চ বিদায় লাভ করাতে, পাচকের মনে এই রূপ চিন্তার উদয় হইল যে, যিনি

পৃথিবীতে পণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক। পণ্ডিতেরাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এত দিন বাস করিতেছি, এই সময়ের মধ্যে যদি প্রত্যহ একটি করিয়াও কথা শিখিতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, এত দিনে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খানি শেষ করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি এমন কুপ্রবৃত্তির দাস যে, তাহা না করিয়া সময় পাইলেই তাস পাশা খেলিয়া কাল হরণ করিয়াছি। অদ্যাবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিব না, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যার চর্চ্চা করিব। যদি এক জন পণ্ডিত না হইতেও পারি, তথাচ কিঞ্চিৎ শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলেও দশ জনে মান্য করিবে। কালে সেই পাচক ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের গুণে এক জন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, যদি উক্ত ব্রাহ্মণ কোনও মদ্য প্রিয় ও বিলাসী বাবুর বাটীর পাচক হইত, এবং সেই বাবুর সহিত উদ্যান ভোজে দুই দশ বার রন্ধন করিতে গিয়া বাবুদিগের বারাঙ্গনার সহিত ক্রীড়া কৌতুক স্বচক্ষে দর্শন করিত, তাহা হইলে, পণ্ডিত হইবার অভিলাষ কোনও কালেই তাহার মনোমধ্যে উদয় হইত না; বরং অধিকতর কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠিত।

অবস্থা ভেদেও মনুষ্যের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, যে মনুষ্য ভাল অবস্থায় চৌর্য্য প্রভৃতি অপকর্ম্মে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিত; সেই মনুষ্যেরই অবস্থা মন্দ হইলে, সৎ প্রবৃত্তি সকল ক্রমে অসৎ হইয়া পড়িল। তখন সে চুরি ও প্রতারণা প্রভৃতি অসৎ কার্য্য করিতে কিছু

মাত্র সঙ্কুচিত হইত না। আরও দেখা যায় যে, কোনও ব্যক্তি অর্থাভাব সময়ে সুপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোক ছিল। সে তখন বিদ্যার আলোচনা ও পরহিত চিন্তা প্রভৃতি সৎ কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিত; কিন্তু ক্রমে কিঞ্চিৎ ধনোপার্জ্জন হইলে, তাহার সে প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়া সুরা সেবন, বারাঙ্গনা সংসর্গ প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে মতি হইল। অবস্থাভেদে এই রূপে মনুষ্যের কখন বা সুপ্রবৃত্তি ও কখন বা কুপ্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

Time and tendency, এই দুইটি ইংরাজী কথার হেতুবাদ করা উচিত। সময়ের অর্থ নানা প্রকার,—প্রাচীন সময়, বর্ত্তমান সময়; মনুষ্যের সুসময়, কুসময়; বিদ্যোপার্জ্জনের সময়, অর্থোপার্জ্জনের সময়; ক্রীড়া কৌতুকের সময়, কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় ইত্যাদি। Tendencyর প্রকৃত অর্থ ঝোঁক। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শব্দের অর্থ "প্রবণতা" করিয়াছেন। এক্ষণে সময়ানুযায়ী প্রবণতা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের বয়স ভেদে যে এই প্রবৃত্তির কি রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে। শৈশবাবস্থায় জননীর স্তন্য পান করিতে শিশু সন্তানেরা অত্যন্ত ভালবাসে। সে সময়ে তাহাদিগের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা অন্য দিকে প্রায় থাকে না। কালে যখন সেই স্তন্য দুগ্ধ পূযের মত গাঢ় হইয়া উঠে, তখন তাহারা আপনা আপনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বোধ কর, কোনও শিশুর স্তন্য পানে চারি বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রবণতা ছিল, সেই শিশুর চীনের বাদাম খাওয়ার উপর নূতন প্রবৃত্তি জন্মিল। তখন সে মহোপকারী দুগ্ধের বাটীতে

চুমুক দিতে চীৎকার করে। বলপূর্ব্বক পান করাইয়া দিলে বমন করিয়া ফেলে; কিন্তু চীনের বাদাম পাইলে, আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। ঠোঙা ঠোঙা চীনের বাদাম খাইয়া তৃপ্তি বোধ হয় না, আরও খাইতে ইচ্ছা করে। কালে সেই বালকটির উদরাময় রোগ জন্মিল। এক বৎসর কাল সেই রোগে মহাকষ্ট পাইয়া আরোগ্য লাভ করিল। চিকিৎসা কালে বালকের সম্মুখে চিকিৎসক মহাশয় বলিলেন যে, কেবল চীনের বাদাম খাইয়া খাইয়াই এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত কুসামগ্রী, অত চীনের বাদাম কি ভদ্র লোকের সন্তানের উদরে পরিপাক হয়? বালকটি তখন রোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়াছিল। প্রত্যহ এক প্রকার পথ্য দেওয়ায়, নানা খাদ্য সামগ্রীর প্রতি তাহার লালসা জন্মিল। যে দুগ্ধ পান করাইয়া দিলে, সে পূর্ব্বে বমন করিয়া ফেলিত, সেই দুগ্ধ পান করিবার জন্য এক্ষণে লালায়িত হইয়া উঠিল। আর চীনের বাদামের উপর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার ঝোঁক রহিল না; বরং মনে মনে অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল, যদি পূর্ব্বে দুই তিন পয়সার বাদাম চুরি করিয়া না খাইতাম, তাহা হইলে, এখন এরূপ রোগে কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। চিকিৎসক মহাশয় যখন বলিয়াছেন যে, চীনের বাদাম ছোট লোকের খাদ্য, ভদ্র লোকের সন্তানগণের উদরে পরিপাক হয় না, তখন আমি আর উহা খাইব না; কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া উক্ত বালকের চীনের বাদামের পরিবর্ত্তে সন্দেশের উপর ঝোঁক পড়িল। জননী নিয়ম মত সন্দেশ দিতেন, বালক তাহাতে তৃপ্তি বোধ করিত না। কখন বা ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া খাইত, কখন বা বিদ্যালয়ের জলপান-ওয়ালার নিকট ধার করিয়া উদর পূর্ণ করিত। এই সন্দেশের উপর নূতন ঝোঁকের

কারণে বালকের পক্ষে দুইটি অনিষ্ট উৎপাদিত হইল; এক দিকে জলপান-ওয়ালার নিকট স্তূপাকার ঋণ, অপর দিকে অম্লের পীড়ার সূত্রপাত। ঝোঁকের জন্য সন্দেশ পাইলেই আহার করে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই গলা জ্বলিতে আরম্ভ হয়। সন্দেশ খাওয়ায় যে টুকু সুখানুভব হইয়াছিল, গলা জ্বলায় ও বুক জ্বলায় তাহা অপেক্ষা দশ গুণ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে যখন জলপান-ওয়ালা টাকার তাগাদা করে, তখন আর কষ্টের পরিসীমা থাকে না। অম্লের পীড়া ক্রমে বাড়িয়া উঠায় বালকের মনে একটি ভয় হইল যে, সন্দেশ খাইলে বড় কষ্ট পাইতে হয়, আর সন্দেশ খাইব না। বালকের সহাধ্যায়িগণ কহিতে লাগিল, সন্দেশের অম্ল আছে। এই জন্য যে অধিক সন্দেশ খায়, তাহার অম্লের পীড়া অবশ্যই হইবে। সহাধ্যায়িগণের উপদেশ, জলপান-ওয়ালার উৎপীড়ন, অম্লের পীড়ার কষ্ট ভোগ, এই তিনটি একত্র হওয়াতে বালকের চৈতন্য হইল। সেই সময় পূর্ব্বকার গর্হিতাচরণেরও একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। বালক ভাবিল, একবার চীনের বাদাম খাইয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছি, আবার সন্দেশ খাইয়া ঋণগ্রস্ত হইলাম,একটি নূতন রোগকে শরীরের মধ্যে স্থান দিলাম। কোনও বিষয়েই আর অধিক বাড়াবাড়ি করিব না, সম্ভব মত সকল কার্য্য করিব। বালক বহু কষ্টে ঋণ পরিশোধ করিল। সন্দেশ খাওয়া পরিত্যাগ করায় সামান্য ঔষধ সেবনেই অম্লের পীড়া ভাল হইয়া গেল।

সহাধ্যায়িগণের বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া তাহারও সেই দিকে প্রবৃত্তি জন্মিল। কিছু কাল বিশেষ মনোযোগের সহিত বিদ্যানুশীলন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বিলক্ষণ খ্যাতি

প্রতিপত্তি লাভ করিল। ক্রমে সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। তখন যৌবন সুলভ বিলাস আসিয়া তাহার মনো মন্দিরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিল। উত্তর সাধক নাই বলিয়া কিছু কাল বিলাসকে গুপ্তভাবেই অবস্থান করিতে হইল। যুবকের মনে মধ্যে মধ্যে নানা প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইত। কখনও অর্থাভাবে, কখনও লোক ভয়ে, কখনও বা জ্ঞানবলে সেই সকল প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিত। সেই সময় সে সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিল। ভাল মন্দ কোন্ দিকে যে সে ঝুঁকিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সেই সময় এক জন উত্তর সাধক তাহাকে যে দিকে টানিবে, সে সেই দিকে গড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সংশয় ছিল না।

যুবক এই অবস্থায় অবস্থিত, এমন সময় কতকগুলি সমবয়স্ক যুবক তাহার বন্ধু হইয়া উঠিল। অবসর কালে হাস্য পরিহাস ছলে তাহাদিগের সহিত নানা কথার আন্দোলন চলিতে লাগিল। বন্ধুগণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া যুবক বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইত, এবং বুঝিতে পারিত যে, সেও যে রূপ মনে মনে বিলাসপ্রিয় হইয়াছে, তাহার বন্ধুরাও তদনুরূপ। তবে এই মাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিল যে, তাহার অপেক্ষা তাহার বন্ধুগণ সাহসপূর্ব্বক অনেক কার্য্য করিতে পারে। এক দিন যুবক শুনিল যে, তাহার বন্ধুরা কোনও বারবিলাসিনীর বাটীতে গমন করিবে। সেই খানে প্রায় তাহারা বেলা দুইটা অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিবে। যুবকও অবশ্য বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইল; কিন্তু সাহস করিয়া তথায় যাইতে পারিল না। বন্ধুগণ গণিকালয়ে গমন করিল, আর সেই যুবক বাটীতে রহিল। বাটীতে থাকিয়া তাহার মন স্থির হইল না। বন্ধুগণের নিকট যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল।

তখন কেন তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলাম না, এই ভাবিয়া মনে মনে অনেক আক্ষেপ করিল। সেই সময় যদি কোনও উপযুক্ত শিক্ষক ঐ যুবকের মনের ভাব জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে, অতি অল্পায়াসেই তাহার মনোমালিন্য দূর করিয়া দিতেন, এবং এরূপ বুঝাইতে পারিতেন যে, তুমি তোমার বন্ধুগণের সহিত গণিকালয়ে না গিয়া বাটী থাকায় ভাল কার্য্যই করিয়াছ। তাহারা ন্যায় যুক্তি ও সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু তুমি বাটী থাকিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছ। তথাপি তুমি আক্ষেপ করিতেছ কেন, তাহাও আমি বুঝাইয়া দিতে পারি। এই সংসারে সমস্ত পদার্থই অধঃপতনের জন্য যেন ব্যগ্র হইয়া আছে, কেবল একটু সুবিধা পাইলেই সেই দিকে ধাবিত হয়। নিম্নগামী সমস্ত পদার্থকেই স্বভাব বাধা দিয়া রাখিয়াছে। বোধ কর, যদি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলে, সিন্ধুসলিল প্রবল বেগে অধঃপতিত হইয়া জগতের যে কত দূর অনিষ্ট উৎপাদন করিত, তাহা বর্ণনাতীত। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই ভূতধাত্রী ধরিত্রী সুনিয়মে সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। অসীম আকাশে নক্ষত্রাদিও পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কেবল প্রকৃতিই আপন মহিয়সী শক্তি দ্বারা তৎসমুদয়কে কক্ষচ্যুত হইতে দিতেছে না। তোমারও সেই পতনোন্মুখ অবস্থা ঘটিয়াছে, তুমি এখন যৌবনমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছ। এই সময় যদি জ্ঞানাঙ্কুশ হস্তে করিয়া কেহ তোমার পতন নিবারণ না করে, তাহা হইলে, তুমি অবশ্যই নিম্নগামী হইবে। অদ্য যাহারা তোমাকে নিম্নগামী করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু তুমি ভয়-প্রযুক্ত তাহাদিগের সহিত গমন

করিতে পার নাই। এক্ষণে মনোমধ্যে এই রূপ আলোচনা করিতেছ যে, আমার বান্ধবগণ এখন গণিকালয়ে যে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই আমোদে কোনও রূপ অনিষ্টের কারণ কিছুই দেখিতেছি না। তবে তাঁহাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত না হইয়া কেন বাটীতে রহিলাম? ইহার পর, আমি একটা অনুরোধ করিলে, তাঁহারা আমার কথা রক্ষা করিবেন না; কারণ তাঁহাদিগের অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম না। তোমার মনে এই রূপ চিন্তার তরঙ্গ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যদি তাহাদের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে, তুমিও তাহাদের ন্যায় অধোগামী হইবে।

যুবক বাটীতে বসিয়া যখন ভাবিতেছিল যে, বন্ধুগণের সহিত না যাওয়া আমার অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। সেই কার্য্য বাস্তবিক ন্যায্য কি অন্যায্য, তাহা বুঝাইয়া দিবার লোক তৎকালে কেহই ছিল না; সুতরাং সে আপন মনেই ধার্য্য করিল যে, তাঁহাদিগের সহিত না যাওয়া অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। তাঁহারা যে খানে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। যদি এক্ষণে হঠাৎ সে খানে উপস্থিত হই, তাহা হইলে, তাঁহারা আমাকে দেখিয়া অধিক আমোদিত হইবেন। এই রূপ ভাবিয়া যুবক বাটীর বাহির হইল; কিন্তু অপরিচিত স্থানে কি প্রকারে প্রবেশ করিব, ইহা ভাবিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিতেছে; এমন সময় পথি মধ্যে উহার আর একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, অমুক স্থানে। যুবক হাস্য বদনে কহিল, আমিও সেই খানে যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক; কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যাইতে

সাহস হইতেছিল না বলিয়া অগত্যা বাটী ফিরিয়া যাইতেছিলাম। অপর যুবক হাস্য করিয়া বলিল, তুমি এত হীনসাহস কেন? দশ জায়গায় না যাইলে, কি লোকে চালাক হয়? আমরা ত প্রত্যহ সে খানে যাই না যে, ইহা অপকর্ম্ম বলিয়া ধরিবে। মধ্যে মধ্যে এমন আমোদ সকলেই করিয়া থাকে। এই সকল কথা শুনিয়া যুবকের পূর্ব্বাপেক্ষা সাহস হওয়াতে, অক্লেশে মাথায় কাপড় দিয়া গণিকালয়ে প্রবেশ করিল। বন্ধুবর্গ যুবককে দেখিবা মাত্রই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যৌবন সুলভ সমস্ত বিলাসই যুবকের মনোমন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল; কেবল উত্তর সাধক ছিল না বলিয়াই এত দিন সে কিছুই করিতে পারে নাই; কিন্তু আজি সে একটা নূতন পথে পদার্পণ করিল। নূতন প্রিয় সংসারে কোনও নূতন বিষয় দৃষ্টি গোচর হইলে, সেটা প্রথম প্রথম যে কত দূর মনোজ্ঞ হইয়া উঠে, তাহা নূতন প্রিয় যুবকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সেই যুবক এই নিকৃষ্ট নূতন আমোদ চরিতার্থ করিতে গিয়া কাল ক্রমে আপনার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

অসময়ানুযায়ী ঝোঁক উপস্থিত হইলে, অবস্থার প্রতীক্ষা করে, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। এক জন দুরবস্থাপন্ন কৃষক কোনও ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ধনাঢ্য লোকের গৃহে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ড হইত। উক্ত কৃষক বিনা বেতনে পূজা পর্ব্বোপলক্ষে ব্রাহ্মণের যথোচিত সাহায্য করিত। ঐ সকল ক্রিয়া কাণ্ডে কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে কৃষকের মনে এই রূপ অভিলাষ জন্মিল যে, যদি কখনও হস্তে কিছু টাকা পাই, তাহা হইলে, অন্ততঃ এক

বারও দুর্গোৎসব করিয়া কতকগুলি কুটুম্ব বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব। এই চিন্তা বহু কাল তাহার মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল; কেবল উপায় নাই বলিয়া সে চুপ করিয়া থাকিত। এক বৎসর পলি পড়া গঙ্গার চড়ায় কতকগুলি কড়াই ছড়াইয়া দিল। কৃষকের সৌভাগ্য বশতঃ সেই বৎসর সেই চড়ায় বিস্তর কড়াই উৎপন্ন হইল। মহাজনকে বিক্রয় করিয়া কৃষক নগদ দুই শত টাকা হস্তে পাইল। ফাল্গুন মাসে কৃষকের হস্তে টাকা হইল। তাহার মনে মনে যে সঙ্কল্প ছিল, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য একেবারে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে আপন পুরোহিতকে ডাকাইয়া বিনীত ভাবে কহিল, মহাশয়, আমার বহু কালাবধি দোল ও দুর্গোৎসব করিতে অভিলাষ আছে; কেবল অর্থের অপ্রতুল বশতঃ করিতে পারি নাই। এই বৎসর কৃষিকার্য্যে কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে। অতএব দোল ও দুর্গোৎসব এই দুইটি যাহাতে সমাধা হয়, তাহার একটি তালিকা করিয়া দিউন। পুরোহিত শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। দোল পর্ব্বে যাহা যাহা ব্যয় হইবে, তাহার একটি তালিকা করিয়া দিলেন। ক্রিয়া কাণ্ডের কিছুই নিয়ম থাকে না, যে টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করা যায়, কার্য্য কালে প্রায় তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হইয়া পড়ে; সুতরাং এক দোল পর্ব্বেই কৃষকের দুই শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল। যদি অবশিষ্ট টাকা থাকিত, তাহা হইলে, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবও করিত; কিন্তু নাই বলিয়া মনের আক্ষেপ মনে রাখিল, এবং সেই ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দুর্গোৎসবে আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল; অসমানুযায়ী ঝোঁক ইহাকেই বলে। এই রূপে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই এক

এক বিষয়ে প্রবৃত্তি বা প্রবণতা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু কাহারও অর্থাভাব, কাহারও বা সময়াভাব প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হয় না। আবার, কেহ কেহ বা ধর্ম্মভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া থাকে।

কোনও কোনও প্রাচীন ঘরে অদ্যাপি পূর্ব্বকার প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। সে সকল ঘরের শিক্ষিত যুবকেরা বংশের চিরপ্রথা অমান্য করিতে হঠাৎ সাহস করেন না। কেন করেন না? আজিও সে সকল ঘরের যুবকেরা কর্ত্তৃপক্ষের শাসনে সন্ধ্যার পর বাটীর বাহিরে থাকিতে পান না, কতকগুলি অশিক্ষিত নীচাশয় লোক লইয়া বাটীর ভিতর গোলযোগ করিতে পান না, ইচ্ছামত ভোজন পান করিতে অক্ষম' আবশ্যক মত অর্থ ব্যয়ে অপারক; এই কয়েকটি প্রতিবন্ধকের জন্য বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিঃশব্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। এমন সময় বাটীর এক জন কর্ত্তার মৃত্যু হওয়াতে এক জন যুবক স্বাধীন হইল। সে যখন বুঝিতে পারিল যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; পৈতৃক ধনের একাংশে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। তখন যে সকল প্রবৃত্তি মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহার মন সেই দিকে ঝুঁকিল, আর কে বাধা দেয়? যুবক স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, প্রবৃত্তির উপযোগী সময় পাইয়াছে। ক্রমে তাহার কাছে দশ জন নীচাশয় লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহারা রকমারি কথা কহিয়া যুবকের হত চেতন প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দিল। সে আর বাটীর কাহাকেও ভয় করে না, আপন বৈঠকখানায় বয়স্যগণকে লইয়া ইচ্ছামত ভোজন পানে বহু কালের আশা চরিতার্থ করিতে লাগিল। বাটীর অন্যান্য বর্ষীয়ানেরা চরম বিবেচনা করিয়া সে যুবকের দৌরাত্ম্য দেখিয়াও

দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না। ক্রমে বাটীর অভ্যন্তরে একটি বিলাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই খানে নানা রকমের কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল দেখিয়া অন্যান্য যুবকেরা আপন আপন কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে দিন কতক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সরিয়া যাইত; তাহার পর, আর থাকিতে পারিল না, প্রচ্ছন্ন ভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সকলেই মদ্যপ হইয়া উঠিল, রজনীতে বাটীর বাহিরে থাকিতে শিখিল, অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া ব্যয় করিতে আর কাহারও ভয় রহিল না। এত দিন সেই বংশের বিলক্ষণ বাঁধুনি ছিল, যুবকেরা কর্ত্তৃপক্ষকে বিলক্ষণ ভয় করিত; কিন্তু সে ভয় ভক্তির সহিত মিশ্রিত ছিল না, স্বার্থ সম্বলিত বাহ্য ভয় মাত্র। সেই ভয় এক জন ভঙ্গ করিয়াছিল, অপর কয়েক জন তাহার অনুগামী হইয়া চলিল; তাহার পর, সকলেই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল।

এই রূপে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এক জনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া এক একটি বংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্রমে উহা সংক্রামক হইয়া উঠিলে, সেই বংশের আশ্রিতগণও নষ্ট হয়। ইহাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও কোনও গ্রামের এক ঘর ধনাঢ্য বংশের সময়ে সময়ে যে রূপ প্রবৃত্তি হয়, গ্রামস্থ ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোক তাহার অনুসরণ করে। ডুম্বুরদহের বাবুরা যখন দস্যু বৃত্তি করিত, তখন সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক তাহাদিগের সেই অপকর্ম্মের উত্তর সাধক ছিল। অদ্যাপি রজনীতে উক্ত স্থানের পথে যাইতে পথিকেরা ভয় করিয়া থাকে। যদিও তাহাদিগের সেই বংশের রুচি কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই; তথাপি রাজশাসনে সেই দুরাত্মারা স্থির ভাব অবলম্বন করি-

য়াছে। সময় পাইলেই যে উহারা আবার পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এক এক পরিবারের এক একটি প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, কেবল দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তাহারা সে প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করিতে পারে না। ইংলণ্ডের হেনেরি বংশীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক, লম্পট ও নরঘাতক ছিলেন। ক্রমে সেই বংশ লোপ হইয়া গেল। অবশেষে উক্ত বংশে দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারাও পূর্ব্ব পুরুষের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিলেন। অন্য কি কথা, মহারাজ্ঞী এলিজাবেথকেও উল্লিখিত কয়েকটি দোষ স্পর্শ করিয়াছিল।

ফ্রান্সের প্রথম নেপোলিয়নের সংগ্রামের দিকে প্রবল প্রবৃত্তি ছিল। বাল্যকালে তিনি মাটীর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সমর সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ ও তৎসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ক্রমে সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া আপন অসাধারণ সমর কৌশলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যে কেবল সামরিক বুদ্ধির প্রভাবেই ফ্রান্সের সম্রাট্ হইলেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও সুস্থ মনে সাম্রাজ্য সুখ ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ফ্রান্সের সম্রাট্ হইয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই কালযাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে সমস্ত ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ওয়াটর্লুর যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। তাঁহার পুত্র অল্প বয়সেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া পিতার ন্যায় সামরিক বিদ্যার পরিচয় দিতে পারেন নাই; কিন্তু তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন সামান্য

সূত্রে প্রসিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘটাইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন। তৎপুত্র চতুর্থ নেপোলিয়ন বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জুলু সংগ্রামে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতে কেহ বিশেষ অনুরোধ করে নাই, যাইবারও কোনও বিশেষ কারণ ছিল না; কিন্তু বংশগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইংরাজদিগের জন্য স্ব ইচ্ছায় নিহত হন। এই রূপে বংশগত এক একটি প্রবল প্রবৃত্তি থাকে। সময় পাইলেই সেই প্রবৃত্তি ভীষণ ভাব ধারণ করে। বহু চেষ্টা ও বহু যত্ন না করিলে, বংশগত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিতে পারা যায় না।

কখনও কখনও সময় প্রবৃত্তির প্রতীক্ষা করে, কখনও বা প্রবৃত্তি সময়কে চরিতার্থ করে। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি যে, সময়ের প্রতীক্ষা করে, এই স্থলে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;— এক ধনবানের পিতা অত্যন্ত বাবু ছিলেন; বাবুগিরিতে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। সেই বাবুর ঔরস পুত্র জন্মাবধি পিতার বাবুগিরি ও বদান্যতা দেখিয়াও স্বভাব দোষে ঘোর কৃপণ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই কৃপণতা এত দূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, অর্থ সঞ্চয় ব্যতিরেকে আর কোনও বিষয়েই তাহার আমোদ হইত না। পিতাকে মুক্ত হস্ত দেখিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইত। ভাবিত, যদি কখনও পৈতৃক বিষয় হস্তে পাই, তাহা হইলে, পিতার অপব্যয়ের প্রতিশোধ লইব। কালে পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র তাঁহার সমস্ত বিষয়েরই অধিকারী হইলেন। এখন পূর্ব্ব প্রবৃত্তি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিল, সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং উক্ত ধনীর পুত্র কায়মনে আপন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিল।

কখনও বা সময় প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। কোনও ধনাঢ্য যুবকের সুরা, বেশ্যা, প্রভৃতি নীচ অমোদে ঘোর প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই সকল প্রবৃত্তি স্বভাবতই যুবকের মনে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার পর কতকগুলি লোক উত্তেজক হইয়া সেই সকল প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। মনুষ্য শরীরে বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সুরাপায়ী, বেশ্যাশক্ত প্রভৃতি কদর্য্য আমোদপ্রিয় ব্যক্তিবৃন্দের বিশ্রামের অবসর নাই। দিন যামিনী তাহারা উল্লিখিত প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছে, ও সেই সকল প্রবৃত্তির এত দূর দাস হইয়া পড়িয়াছে যে, এক দিনের জন্যও স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভয় রাখে না, আয় ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবার সময় পায় না, মান মর্য্যাদা কত দূর নষ্ট হইল, এক দিনের জন্যও তাহা ভাবিয়া দেখে না, এবং কত দূর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিমূঢ় হইয়াছে, ঘোর প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া তাহা ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। তাহারা মনে মনে ভাবে, মার্কণ্ডের পরমায়ু ও কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার লইয়া অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছি। আমরা যাহা করিব, তাহার উপর কথা নাই। কখনও বা প্রবৃত্তি পরবশ ব্যক্তিরা সময়ের জন্য লালায়িত হয়। সেই সময় এক্ষণে কুপ্রবৃত্তি পরবশ ব্যক্তিদিগের হাত ধরা হইয়াছে। সময়কে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, সময় তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কখনও কখনও ঘোর প্রবৃত্তি স্বত্ত্বেও কেবল সময় বশ্য নহে বলিয়া অনেক লোক তাহা চরিতার্থ করিতে পারে না। বোধ কর, কোনও ব্যক্তি সুরা পান ও বেশ্যালয়ে বাস করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে, সেই প্রবৃত্তিই তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হই-

তেছে। আবার, সে ব্যক্তি একটি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যও করিয়া থাকে, সেই কার্য্যে মাসিক দুই শত টাকা বেতন পায়, তাহা ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। যদি সেই কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে, তাহার সকল দিক্ বন্ধ হইয়া যায়। সেই জন্য সে যত দূর কুপ্রবৃত্তির প্রবল বেগ মনোমধ্যে ধারণ করুক না কেন, বেলা দশটার সময় আহার করিয়া তাহাকে কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেই হইবে। সুতরাং সে সপ্তাহের ছয় দিন সময়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না, তাহাকে কার্য্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে রবিবার অবসরের দিন। সে দিন সময়, অর্থ ও মন এই তিনটিই প্রবৃত্তির সাহায্য করে; সুতরাং উক্ত ব্যক্তির সে দিন কুপ্রবৃত্তি যত দূর বাড়াইতে ইচ্ছা হয়, তত দূর বাড়াইয়া বসে।

কেবল অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই অনেকে দীর্ঘ কাল সৎপথের পথিক হইয়া বেড়ায়। তাহার পর, প্রবৃত্তি চরিতার্থের সময় উপস্থিত হইলেই, আর কাল বিলম্ব করে না। কত লোককে যৌবনের প্রারম্ভে এরূপ সৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইয়াছে যে, তাহাদের বিজ্ঞ গুরুজনেরা ভাবিয়াছিলেন, ইহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সংসারের মঙ্গল সাধন করিবে; কিন্তু সময় পাইয়া তাহারাও আপন অসৎ প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে।

প্রবৃত্তি যে সময়ের বশ্য থাকে, ইহা উপরের লিখিত সংক্ষেপ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে সময় কি রূপ প্রবৃত্তির বশ্য হয়, তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—কোনও ধনীর পুত্র

পিতা বর্ত্তমানে আপনার বিলাস চরিতার্থের অর্থ অনাটন হওয়ায়, গবর্ণমেণ্টের একটি সম্ভ্রান্ত পদ গ্রহন করিয়াছিলেন। পদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তিকে সময়ের বশ্য হইয়া চলিতে হইত। সেই জন্য তিনি বাধ্য হইয়া অনেকাংশে বিশিষ্ট লোকের ন্যায় থাকিতেন; কিন্তু সময় পাইলে, যত দূর প্রবৃত্তির বশ হইতে পারেন, তাহাই হইতেন। কালে তাঁহার পিতা পরলোকগত হইলেন। সময় পাইয়া প্রবৃত্তি বলিল, আর কেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হও, সময়কে আপনার আজ্ঞাধীনে রাখিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। পূর্ব্বে যে সময় নয়টা বাজিল, স্নান করিতে যাও বলিয়া ভয় দেখাইত, এক্ষণে সেই সময়ই বাবুর আজ্ঞাধীন। পূর্ব্বে যে সময়ে তিনি আহার করিতেন, এক্ষণে সেই সময়ে নিদ্রা যান; পূর্ব্বে যে সময়ে স্নান করিতেন, এক্ষণে তিনি সেই সময়ে সুরা পান করেন; পূর্ব্বে যে সময়ে তিনি মোকদ্দমার রায় লিখিতেন, এক্ষণে সেই সময়ে আমোদ করিয়া রন্ধন করেন। যে সময় পূর্ব্বে কথায় কথায় ভ্রূভঙ্গী করিত,—অর্থাৎ কহিত, শীঘ্র লও, আমি চলিলাম, এক্ষণে সেই সময়, অর্থাৎ দিবারাত্রি সমভাব হইয়া গিয়াছে; কেননা, বাবু ইচ্ছা করিলেই রাত্রিকে দিবা ও দিবাকে রাত্রি করিতে পারেন।

ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি কখনও কখনও হঠাৎ উপস্থিত হয়; কিন্তু সে প্রবৃত্তির সমতা কিছুতেই হয় না। বোধ কর, একটি শান্ত, শিষ্ট ও সুশিক্ষিত যুবক ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুসারে দীর্ঘ কাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, কস্মিন্ কালে অধর্ম্ম পথে বিচরণ করেন নাই। তিনি এক দিন চাটুকারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। তথায় হঠাৎ একটি সুরূপা

নবযৌবনা বারাঙ্গনা শিবিকারোহণে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নামিল, এবং স্নানের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, শিবিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সেই শান্তশীল ও সচ্চরিত্র যুবক উক্ত স্বরূপা বারাঙ্গনাকে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রথম দর্শনে যুবার যে রূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, ধৈর্য্যের সহিত তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনে আর সে ধৈর্য্য রহিল না। সেই যুবার সহিত যে কয়েক জন লোক ছিল, তাহারা তাঁহাকে শিষ্ট শান্ত জানিয়া শিষ্টাচার দ্বারাই তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া কালহরণ করিতে ছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই শঠ ও অর্থশোষক, কেবল সুযোগের প্রতীক্ষায় শান্ত ভাবে যুবার কাছে অবস্থিতি করিত। তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে সেই যুবতীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাঁহার মনোগত ভাব তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল, এবং যুবার নবীন প্রণয়াঙ্কুরে উৎসাহ-বারি সেচনে ব্যগ্র হইয়া সহাস্য আস্যে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, কি দেখিতেছেন? ওকে পাবার যো নাই, ও এই সহরের লক্ষহীরা! যুবা হাস্য করিয়া কহিলেন, চল চল, স্নান করা যাক্। যার যেমন মন, সে সবাইকে তেমনি দেখে। এই কথা বলিয়া যুবা সকলের সঙ্গে স্নানার্থ জলে নামিলেন। বারাঙ্গনাও দুই জন কিঙ্করীর হস্ত ধরিয়া জলে নামিল, এবং অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত স্নান করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যুবার আর ধৈর্য্য রহিল না। এক জন চাটুকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে? কোথায় থাকে? চাটুকার আনন্দের সহিত কহিল, সে জন্য ভাবনা কি, যদি আপনার নিতান্তই উহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সন্ধ্যায়

পর সুযোগ দেখা যাইবে। এখানে আর অধিক লিখিয়া আমাদের প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। উক্ত বারবিলাসিনীকে দর্শন করিবা মাত্রই সুশীল যুবকের তাহার প্রতি এত দূর ঝোঁক হইল যে, সেই বারাঙ্গনার সহিত সহবাসে তিন চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিজ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখিতে হইবে। যদি তাঁহার সেই নূতন ঝোঁকের সময় কেহ এই রূপ সদুপদেশ দিত যে, মহাশয়, উহার প্রতি দৃষ্ট করিবেন না, ঐ দুষ্টা অনেক বড় মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ইত্যাদি। তাহা হইলে, যুবকের সেই প্রবৃত্তি ক্ষণ কালের মধ্যেই নিবৃত্ত হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া যুবকের দুষ্ট চাটুকারগণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া এক দিনের মধ্যেই সেই প্রবৃত্তি শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিল। কাজেই সেই যুবক চাটুকাগণের শঠতারূপ জাল কাটিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহার যে বিষয়ে যখন ঝোঁক ধরে, বুদ্ধিমান্ লোক উপদেশের বন্ধন দিয়া সে ঝোঁকের সমতা করিয়া থাকেন; কিন্তু দুষ্ট লোকেরা সেই সুযোগ দেখিলে, নূতন বন্ধন দেওয়া দূরে থাকুক, মূল বন্ধন খুলিয়া সেই ঝোঁককে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

ব্যক্তিগত ঝোঁক কখন কখন কার্য্যানুরোধেও হইয়া থাকে, এবং সেই ঝোঁক, সময়ে কখনও বা ইষ্ট, এবং কখনও বা মহানিষ্টের কারন হইয়া দাঁড়ায়। অত্যন্ত নির্ব্বোধ লোকেরা সামান্য কার্য্যের সামান্য প্রশংসা পাইয়া সেই কার্য্যে দক্ষতা লাভের জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। বোধ কর, কোনও নির্ব্বোধ সম্পন্ন যুবক এক গণিকালয়ে বসিয়া আছে, সেই স্থানে আর দুই তিনটি

যুবক আসিয়া সমবেত হইল। দৈব বশতঃ, সেই সময় সেই গণিকার নৃত্য গীত শিক্ষাদাতা ওস্তাদেরা উপস্থিত ছিল। যুবকেরা তথায় সকলেই এক একটি গান গাহিল। উপস্থিত ধূর্ত্ত ওস্তাদেরা সুযোগ দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মহাশয়ের কি মিষ্ট গলা! বিনা শিক্ষাতেই এই প্রকার হইয়াছে, যদি কিছু কাল পরিশ্রম করিয়া এই বিদ্যার চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে, আপনি এক জন অদ্বিতীয় গায়ক হইবেন। মহাশয়, সঙ্গীত বিদ্যা কি কম! আপনার মত মিষ্ট গলার গান কোথাও শুনি নাই। নির্ব্বোধ যুবক তাহাদের সেই অযথা প্রশংসাবাদে একেবারে দুরূহ সঙ্গীত বিদ্যা চর্চ্চার ঝোঁক ধরিল। পক্ষান্তরে, কোনও নির্ব্বোধ যুবক নবদ্বীপস্থ এক বিখ্যাত পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। তথায় এক জন ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া কথকতা শিখিতেছিলেন। পূর্ব্ব কথিত যুবক ইতি পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিয়া মন্দ স্থানে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে গিয়া বহু অর্থ নাশ করে। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া নবদ্বীপে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। যদিও সেই যুবক বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, এবং সঙ্গীত শিক্ষার বাবুগিরিতে হৃতসর্ব্বস্ব হয়; তথাচ সঙ্গীত বিদ্যায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার হইযাছিল। সে চতুষ্পাঠীতে বসিয়া সেই কথকের রাগ রাগিণীর আলাপ শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও পুরাণাদিতে আমার কিঞ্চিৎ বোধাধিকার থাকিত, তাহা হইলে, আমিও কথকতা শিখিতাম। এক দিন তাহার সেই মনের ভাব উক্ত কথকের নিকট ব্যক্ত করায়, তিনি বলিলেন, তোমার বেশ সুর বোধ আছে, এবং গলাও অত্যন্ত মিষ্ট, তুমি আমার কাছে

কথকতা শিক্ষা কর। ইহাতে অধিক সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন নাই, অল্প মাত্র ব্যাকরণ বোধ থাকিলে, ও দুই তিন খানি কাব্য পড়িলেই চলিতে পারিবে। উক্ত কথকের সঙ্গীত বিদ্যায় সামান্য বোধাধিকার ছিল, তিনি আপন স্বার্থের জন্যই সেই যুবককে হস্তগত করিয়া লইলেন। তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়াইতেন, ও তাহার নিকট আপনি ভাল করিয়া সঙ্গীত শিখিতেন। এই রূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের সাহায্যে উভয়েই উৎকৃষ্ট কথক হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে যে সঙ্গীত শিক্ষা যুবকের সর্ব্ব অনিষ্টের হেতু হইয়াছিল; এক্ষণে সজ্জন সংসর্গে সেই সঙ্গীতই তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কারণ হইয়া উঠিল।

কোনও কোনও লোকের জ্ঞান উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়, সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়াও তাহারা সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত চরিতাবলী ও জীবনচরিত নামক পুস্তক দ্বয়ে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনিষ্ট পক্ষে, স্বভাব সিদ্ধ প্রবৃত্তির একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—কোনও কোনও বালক জ্ঞান উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতাকে আপনাদের এরূপ অনিষ্টকর ঝোঁক দেখাইতে আরম্ভ করে যে, তাঁহারা সেই বালকের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারেন যে, এই বালক ভবিষ্যতে বংশের কুপুত্র বলিয়া পরিচিত হইবে। যদি স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়া ইহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন, যদি আমরা লৌহমুদ্গার হস্তে করিয়া ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করি, তথাচ ইহাকে সুপথের পথিক করিতে পারিব না; এ কুপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া কুপথে বিচরণ করিবেই করিবে।

জ্ঞানার্জ্জন সকলের পক্ষেই সুলভ, সকলেই জ্ঞানী ব্যক্তির সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়, ইহা সকলেই দেখিতেছে, শুনিতেছে ও পড়িতেছে; কিন্তু এক এক জনের মস্তকে এমন এক একটি ঝোঁক থাকে যে, সহস্র প্রকার জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে ও সদুপদেশ শ্রবণে তাহাদিগের সে ঝোঁকের সমতা হয় না।

পূর্ব্বে দেশগত ও কালগত ঝোঁকের উল্লেখ মাত্র হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিষয় আর একটু বাহুল্য করিয়া বলা যাইতেছে,—ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করায়, আপামর সাধারণ লোকের এই প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিসে আপনি সুখী হইব। বাল্যকালে সেই আত্ম সুখের উপযোগী কিঞ্চিৎ বিদ্যানুশীলনে প্রায় সকলেই প্রবৃত্ত হয়। পরে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনক্ষম হইলেই, আর লেখা পড়ার দিকে দৃষ্টি রাখে না। ত্রিংশ মুদ্রা মাসিক বেতনের একটি চাকুরী পাইলেই, আপনার প্রবৃত্তি চরিতার্থের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করে। ইহাতে লোক লৌকিকতা, স্বচ্ছন্দ আহার বিহার, এবং পিতা মাতার সেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম হউক বা না হউক, নিজের পরিচ্ছদ, সুরার ব্যয় ও বারাঙ্গনার মাসিক বৃত্তি অবধারিত করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট বোধ করে। এই বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক সাত কোটি লোক বাস করে। তাহার মধ্যে প্রায় অধিকাংশ লোক এই রূপ আপন আপন ইন্দ্রিয় চরিতার্থোপযোগী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক উপার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট আছে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে কেহই দৃষ্টিপাতও করে না। এই সময়গত ঝোঁক এ দেশে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে।

কতকগুলি লোকের রিপুগত ঝোঁক থাকে, এ ঝোঁক অত্যন্ত ভয়ানক ও অনিষ্টকারক। মনুষ্য মাত্রেরই এক একটি রিপু প্রবল থাকে,—অর্থাৎ কেহ বা ক্রোধের বশীভূত, কেহ বা মোহের বশীভূত, কেহ বা কামের বশীভূত ইত্যাদি। এই রিপুগত ঝোঁকও মনুষ্য শরীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, সময় পাইলেই প্রবল হয়। বোধ কর, কোনও স্ত্রীলোক অত্যন্ত ক্রোধের বশম্বদ; কিন্তু বাল্যকাল অবধি সেই ক্রোধরিপুকে চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত পাত্র পায় নাই। যদিও সময়ে সময়ে তাহাকে শ্বশুর শাশুড়ীর তাড়না সহ্য করিতে হইত; তথাচ ক্রোধরিপুকে সাধ্যানুসারে দমন করিয়া রাখিত। সেই স্ত্রীলোকের কোনও কালে দাস দাসী ছিল না; কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর আপনার এক মাত্র পুত্রবধূর প্রতি লঘু পাপে গুরু দণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। হীনবলের প্রতি সবলের অত্যাচার করিবার যে ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকে, তাহার এই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। উক্ত স্ত্রীলোকের যদি বহুসংখ্যক দাস দাসী থাকিত, কিম্বা তাহার স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত কতকগুলি জ্ঞাতিবর্গ লইয়া তাহাকে সংসার করিতে হইত, তাহা হইলে, সেই সকল অধীনস্থ লোকের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না। পুরুষের পক্ষেও ইহা অপেক্ষা অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বহুসংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজ গুণে তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অধীনস্থ লোকেরা সেই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হয়। কেহ বা সামান্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধীনস্থ লোকের উপর উৎপীড়নের পরিসীমা রাখে না। কথিত আছে, এক জন রাজা আপন সচিবগণকে মনোনীত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সুরা পান

করাইয়া তাঁহাদের কোন্ দিকে স্বভাগত ঝোঁক, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। সুরা পান করিলে, স্বভাবগত প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। তখন কেহ বা নিকটস্থ লোকের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, কেহ বা স্ত্রীলোকের প্রতি ঘোর আসক্ত হয়, কেহ বা আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করে, কেহ বা অত্যন্ত বকিতে থাকে ; আবার, কেহ কেহ বা স্থির ভাব অবলম্বন করে। সুরা পান করাইয়া যেমন সেই রাজা মন্ত্রিগণের স্বভাবগত ঝোঁক বুঝিয়া লইতেন, সেই রূপ যে কখনও অর্থের মুখ দেখে নাই, তাহার হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে, তাহার স্বভাবগত ঝোঁক প্রকাশ হইয়া পড়ে ; কিন্তু যদি বিপুল অর্থ ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াও কোন্ দিকে তাঁহার ঝোঁক, সাধারণকে তাহা জানিতে না দেন, তাঁহাকেই যথার্থ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হয়।

মনুষ্যের কখনও কখনও কার্য্যগত ঝোঁক উপস্থিত হয় ; এই রূপ ঝোঁক নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। বোধ কর, কোনও বিশিষ্ট বংশোদ্ভব যুবার পিতৃ বিয়োগ হইল। সেই সময় পাঁচ জন স্বার্থপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং গুরু ও পুরোহিত যুবাকে এই রূপ প্রবৃত্তি দিতে আরম্ভ করিল, লোকে যে জন্য সন্তান কামনা করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যুবককে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহারা আবার পিতৃভক্তি সম্বন্ধীয় নানা প্রকার উপদেশ দিতেও আরম্ভ করিল। সেই সকল কথা শুনিয়া যুবক পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত মাতিয়া উঠিলেন, পশ্চাদ্দৃষ্টি রাখিলেন না, পিতৃশ্রাদ্ধে কত টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য, তাহাও ভাবিলেন না, ঋণগ্রস্ত হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। যদি কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইয়া

এরূপ সমারোহের শ্রাদ্ধ করিতে বারণ করিতেন, তবে তাহার প্রত্যুত্তরে যুবক এই কথা বলিতেন, মহাশয়, পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিলাম; তাহার পর, তাঁহার পুণ্য থাকে, সমস্তই পরিশোধ করিতে পারিব। যুবা এত কাল পিতার অধীনেই ছিলেন, সংসারের গতিক কিছুই বুঝিতেন না; সেই জন্য অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে লোকের মুখে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের সুখ্যাতি শুনিয়া শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তাহার পর, এক পক্ষ গত না হইতেই চারি দিক্ হইতে টাকার তাগাদা আরম্ভ হইল। রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই হিসাবের খাতা লইয়া বহুসংখ্যক লোক দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের তাড়নায় যুবক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই রূপ হঠাৎ এক এক বিষয়ে এক এক জন নর নারীর প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়াতে, অবশেষে তাহারা মহাবিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে রূপে অনিষ্ট ঘটে, এরূপ উদাহরণ অনেক প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে এক সময়ে এক বংশোদ্ভব, এবং এক পৈতৃক বিষয়ের সমানাধিকারী দুই ভ্রাতায় ভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কি রূপ ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভ করে, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—এক জন মধ্যবিত্তের দুই পুত্র ছিল। তিনি পরলোক গমন করিলে, ভ্রাতৃ দ্বয়ে তদীয় সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত করিয়া লইলেন। বাল্যকালাবধি জ্যেষ্ঠ পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, এবং মনে মনে এই সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পিতৃধনের অধিকারী হইলে, পরিমিত ব্যয়ের কি গুণ, তাহা সকলকে দেখাইব। এক্ষণে সময় পাইয়া তিনি পূর্ব্ব প্রবৃত্তি অনু-

সারে কার্য্য করিতে লাগিলেন,—অর্থাৎ মাসিক আয়ের অর্দ্ধাংশ অগ্রে সঞ্চয় করিয়া অপর অর্দ্ধাংশে নিয়মিত সাংসারিক ব্যয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, যথার্থ পাত্রে দান, এবং নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই পরিমিত রূপে ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই প্রবৃত্তি ঘোর প্রবল হইয়াছিল যে, আয়ের অর্দ্ধাংশ অগ্রে সঞ্চয় না করিয়া কোনও কার্য্যেই হস্তার্পণ করিতে অভিলাষী হইতেন না। অধিক কি, ব্যয় সম্বন্ধে অর্থের নিতান্ত অনাটন হইলেও, আয়ের তহবিলের টাকা গ্রহণ করিতেন না। আগামী মাসের এক বিষয়ের ব্যয় লাঘব করিয়া অন্য বিষয়ের কুলান করিয়া লইতেন। জ্যেষ্ঠ এই রূপে পরিমিতব্যয়ী হইয়া ক্রমে ক্রমে আপন বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন; অথচ কোনও বিষয়ে সমাজে নিন্দনীয় হইলেন না। এ দিকে, কনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, কেবল অর্থের অনাটন বশতই চুপ করিয়া থাকিতেন। তিনি একে বিলাসী, তাহাতে বিষয় কার্য্য কিছুই বুঝিতেন না; সুতরাং একেবারে আশার অতীত ধন হস্তে পাইয়া আলস্যের স্রোতে শরীর ঢালিয়া দিলেন। যে খানে বিলাস সেই খানেই আলস্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করে। পূর্ব্বে কনিষ্ঠ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন; কিন্তু পদব্রজে যাইতে হইত। পিতার মৃত্যুর পর, আর হাঁটিতে পারিলেন না। পিতা বর্ত্তমানে অনিচ্ছা ক্রমেও সাংসারিক পাঁচটি কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতে হইত। এক্ষণে আর সে ভয় নাই বলিয়া মনের সাধে নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন। বিলাসীরা প্রায় আয়ব্যয়ের তালিকা দেখিতে চাহে না, যে কোনও

প্রকারে বিলাস চরিতার্থ হইলেই হইল। কেহ কিছু না বলিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তাহারা পরম আহ্লাদিত হয়। এই রূপে অতি অল্প কালের মধ্যেই কনিষ্ঠ দুষ্প্রবৃত্তির দোষে সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। জ্যেষ্ঠ সঞ্চয় করিব, অথচ কৃপণ হইব না, এই রূপ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অল্প কালের মধ্যেই মূলধন দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন। দেখ, প্রবৃত্তির তারতম্যের জন্য মনুষ্যের অবস্থারও কত দূর তারতম্য ঘটিয়া উঠে।

Convictive tendency. এই কথা চির প্রচলিত আছে যে, কতকগুলি বিচারপতির অপরাধীকে দণ্ড দিবার পক্ষেই মহা ঝোঁক থাকে। এই ঝোঁকের বশীভূত থাকায়, তাঁহারা প্রায়ই ভ্রমে পতিত হইয়া অবিচার করিয়া থাকেন। যে স্থলে বিচারপতির কেবল দোষ অনুসন্ধানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে, এবং দোষের লেশ মাত্র পাইলেই অপরাধীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, সে খানে ন্যায়, যুক্তি ও দয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। দণ্ডবিধির বিধানে যত দূর দণ্ডাজ্ঞা লিখিত আছে, তাঁহারা সেই বিধানানুসারেই লঘু পাপে গুরু দণ্ড করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদিগের Convictive tendency, তাঁহাদিগের দ্বারাই বিশিষ্ট বিধানে দুষ্টের দমন হয়, ইহাও আবার আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যৎকালে স্যর্ মর্ডন্ ওয়েলস্ সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের সেশ্যন্‌বেঞ্চ একচেটে করিয়া লইয়াছিলেন, সে সময়ে শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণের দুষ্ট লোকেরা একেবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনিই বিখ্যাত দস্যু 'মতিবাবুর' দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'মতিবাবু' বার বার সেশ্যন্ সোপর্দ্দ হয়; কিন্তু প্রতি বারেই আপন অসাধারণ বুদ্ধি

কৌশলে অব্যাহতি পাইয়াছিল। শেষ বারে ওয়েল্‌স্ সাহেবের হস্তে আর নিস্তার লাভ করিতে পারিল না; যে হেতু, ওয়েল্‌স্ সাহেব 'মতিবাবুর' নাম শুনিয়াই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীর সময় স্বয়ং তাহাদিগকে সওয়াল করিতে লাগিলেন, আর আসামীর পক্ষীয় বারিষ্টারদের বক্তৃতার সময় বধির হইয়া রহিলেন। জুরিদিগকে চার্জ্জ দিবার সময় আসামীর অপরাধ যে প্রমাণ হইয়াছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যে স্থলে স্বয়ং বিচারপতি বিপক্ষ, সে স্থলে সহস্র বারিষ্টার অপরাধীর স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলেও ফলদায়ক হয় না। 'মতিবাবুর' কারারুদ্ধ হওয়ার কিছু দিন পরেই কলিকাতার নামলুব্ধ, দাঙ্গাবাজ ও মোকদ্দমাবাজ জনৈক ধনবান্ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত Convicitve tendencyর বিচারপতি আর কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করেন নাই। এক্ষণে প্রায় সকল বিচারপতিরই Acquittal tendency প্রবল, এই জন্য তাঁহারা অপরাধীকে গুরু দণ্ড দিতে ইচ্ছুক নহেন।

এক্ষণকার রাজমন্ত্রিগণেরও জিদ বজায় রাখা সম্বন্ধে এক মহাঝোঁক আছে। কিসে আপন পক্ষ সমর্থন করিব, ও আপন দলের পুষ্টি সাধন করিব, ইহার জন্য তাঁহারা সকল প্রকারের কার্য্য করিতেই প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের যদি ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ বুদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে, অতি অল্প কালের মধ্যেই অনাদৃত হইয়া নিজ নিজ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন।

এতদ্দেশীয় কতকগুলি ধনীর পরনিন্দা শ্রবণে অত্যন্ত প্রবৃত্তি আছে। তাঁহারা সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত কতকগুলি

বিশ্বনিন্দুক লোককে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন। কেননা, পরকুৎসা না শুনিলে, তাঁহাদিগের কর্ণবিবর পরিতৃপ্ত হয় না। যে সময়ে পাঁচ জন সাধু ব্যক্তি কোনও নিতান্ত দোষীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময় প্রবৃত্তির দোষে কোনও কোনও নরাধম নিতান্ত সুশীল ব্যক্তির অপকীর্ত্তি শ্রবণে আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া থাকে। কতকগুলি লোক অকারণ অর্থ দ্বারা কলহ ক্রয় করিয়া প্রতিবেশীর সহিত শত্রুতা করে। যে সকল কার্য্য দ্বারা অমঙ্গল ব্যতিরেকে আর কোনও লাভ নাই, তাহারা প্রবৃত্তির দোষে সেই অনর্থক কলহ ঘরে আনিয়া উপস্থিত করে। যদি মোকদ্দমায় হারিল, তবে আপনি ধনে প্রাণে সারা হইল, ইহা প্রথমে না বুঝিয়া কেবল প্রবৃত্তির পরবশ জন্য অনেকে এই আমোদে হৃতসর্ব্বস্ব হয়।

কুপ্রবৃত্তিই হউক বা সুপ্রবৃত্তিই হউক, মনুষ্য যখন যে প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, তাহাতেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ পাইতে থাকে। বোধ কর, এক জন যৌবন কালে তস্কর বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইল। কিছু কাল সেই কার্য্য করিতে করিতেই তস্কর বৃত্তিতে তাহার অসাধারণ বুদ্ধির বিকাশ পাইয়া যায়। কারণ সেই বিষয়েই তাহার সর্ব্বদা ধ্যান থাকে, আপনা হইতেই তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লয়। ইহার পোষকতার জন্য আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে যে, এক ব্যক্তি যৌবন কালে ঘোর লম্পট হইয়া উঠিল; কিন্তু গুরুজনের ভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পায় না, এবং অর্থ সম্বন্ধেও কুলান হয় না। সেই লম্পট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যেমন বিনা উপদেশে ঐ দুইটি

বিষয়ের সুবিধা করিয়া লইতে পারে, সেই রূপ যে যখন যে প্রবৃত্তির ঘোর বশীভূত হয়, তাহাতেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে,তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় দুইটি মহাবাক্য লিখিত আছে, "Where there is a will there is a way," এবং "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

এরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই সহোদরের মধ্যে এক জনের সঙ্গ দোষে নীচ প্রবৃত্তি হইল,—অর্থাৎ বাল্যকালাবধি বিশিষ্ট বিদ্যার চর্চ্চা পরিহার করিয়া লম্পটগণের সহিত 'গাওনা বাজনা' শিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যদি বল, এ প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য কি? আর কোথা হইতে এ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইল? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয় এক রজনীতেই এক জন থিয়েটার দেখিতে, অপর জন বেথুন সমাজের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিল। বোধ কর, কনিষ্ঠ থিয়েটার দেখিতে বসিয়াছে, যথা সময়ে 'গিরিজায়া' আসিয়া রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া এবং সুশ্রাব্য স্বর ও লয় সংযুক্ত সঙ্গীতে কনিষ্ঠের মন মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সেই সময় হইতেই ঐ যুবকের 'গাওনা বাজনা' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল। প্রাতে তাহার এক জন বন্ধুর সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে, বন্ধু কহিল, সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যা আর নাই, এই বিদ্যায় জগৎ মোহিত হয়। আমাদের বড় লাট সাহেবকে কয় জনে চেনে? কিন্তু যদু ভট্ট প্রভৃতি গায়ককে না চেনে এমন লোকই নাই। বন্ধুর এই কয়েকটি কথা উক্ত যুবকের প্রবৃত্তি রূপ অনলে ঘৃতাহুতি প্রায় হইল। সে সেই দিন বৈকালে এক জোড়া তবলা

কিনিয়া আনিল। গুরু জনের তাড়নায় তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে হইত বটে; কিন্তু মন প্রাণ সেই তবলার উপর পড়িয়া থাকিত। কখন বাটী যাইব, কখন তবলা বাজাইব, এই রূপে 'গাওনা বাজনার' প্রতি তাহার অত্যন্ত ঝোঁক হইল। সেই জন্য অনেক নীচ লোকের সহিত তাহার আলাপ হইতে লাগিল। কারণ সেই যুবক যদি শুনে যে, অমুক লোক ভাল বাজাইতে পারে, তাহা হইলে, সে যে রূপ লোক হউক না কেন, তাহার নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা পাইব, এই আশায় তাহার সহিত আলাপ করিতে বাধ্য হয়। সঙ্গীতের অনুরোধে নীচ ও লোভী লোকের সহিত সর্ব্বদা সহবাসে সে তাহাদের রীতি, নীতি ও প্রবৃত্তি শিক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেথুন সমাজে গিয়া দেখিলেন যে, এক জন যুবক ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি এক জন প্রধান বিদ্বান্। বক্তার বক্তৃতা প্রণালী ও শ্রোতাগণের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আমাদের যুবকের মন আর্দ্র হইল। সেই অবধি তাঁহার বিদ্যা শিক্ষায় ঘোর প্রবৃত্তি জন্মিল। পর দিন প্রাতে Blear's Lecture নামক পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া আনিলেন, ও বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেই খানি ও অন্যান্য পুস্তক পাঠে অল্প দিনের মধ্যেই এক জন কৃতবিদ্য লোক হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ, প্রবৃত্তি ভেদে অবস্থার কিরূপ তারতম্য ঘটে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। এক সময়েই উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া হৃদয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বীজ বপন করিয়া বাটী আসিলেন। সময় ও অবস্থা দুই জনেরই এক

প্রকার; কিন্তু কালে প্রবৃত্তির দোষ গুণে এক জন অবনত ও অপর জন উন্নত হইয়া পড়িলেন।

মনুষ্য মাত্রেই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তি দুই প্রকার। লোক বিগর্হিত এবং যুক্তি ও ন্যায় বহির্ভূত কার্য্যের অভিলাষকেই কুপ্রবৃত্তি কহে; আর ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গত কার্য্যের ইচ্ছাকে সুপ্রবৃত্তি কহিয়া থাকে। একটি অন্যায় কার্য্য করিতে গেলে, কত দূর যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বোধ কর, এক জন মদ্যপায়ীকে তাহার এই কুপ্রবৃত্তি সাধনের জন্য সময়ে সময়ে কত দূর লাঞ্ছনা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, অসৎ কার্য্য করিয়া মধ্যে মধ্যে দণ্ড ভাজন হইতে হয়, লোকলজ্জায় সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, সময়ে সময়ে তাহার মনে কিছু মাত্র শান্তি থাকে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই ক্ষণিক আমোদের জন্য এত দূর লাঞ্ছনা ভোগেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না। সে যদি উক্ত কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, তাহা হইলে, অনেক পরিমাণে শান্তিসুখ লাভ করিতে পায়। এই রূপে মনুষ্য সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করে, ও মনের চাঞ্চল্য ঘটাইয়া থাকে। আবার, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখনও কখনও মনুষ্য সুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াও তাহার সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যেমন কোনও দয়ালু বালকের নিকট কোনও দরিদ্র ব্যক্তি কিছু যাচ্ঞা করিল, তাহাতে ঐ বালকের উপকার করিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু অর্থের অপ্রতুল বশতঃ সে মাতার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিয়া ঐ দরিদ্রকে দান করিল। এই সকল কারণে বোধ হয় যে,

যে মনুষ্য প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, নিবৃত্তি করিবার ক্ষমতা ধারণ না করে, তাহার যে কোনও রূপ প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদয় হইলে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার হিতাহিত জ্ঞান না থাকাতে, সময়ে সময়ে সে সম্পূর্ণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অবস্থায় মন শান্ত থাকে, সে সময়েও যদি তাহার অভীষ্ট উপভোগ্য বিষয় কার্য্য গতিকে উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ লোকের তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। যেমন, কোনও মনুষ্যের আহারের ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহার প্রিয় আহার সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আর সে সুস্থির থাকিতে পারে না, তখন তাহার বুভুক্ষা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এক্ষণে উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য যে, অর্থের স্বচ্ছলতা বশতঃ, এবং সময় ও অবস্থা ভেদে মনোমধ্যে নানা কুপ্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্য কালে সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে যেন শক্তির অভাব না হয়। কখনও কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিও না, মনোমধ্যে কুপ্রবৃত্তির আবির্ভাব হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে দমন করিও। তাহা হইলে, অনেক পরিমাণে শান্তি-সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারিবে।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ আর দুঃখ কাহাকে বলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার হেতুবাদ করিয়া তাহার পর, মূল প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিব। মনের শান্তির নাম সুখ, কোনও কালে কেহ এ কথার প্রতিবাদ করেন নাই। মন বিকৃত অবস্থায় থাকিলে, সমূহ দুঃখের কারণ হয়, ইহাও সত্য। তবেই মনের শান্তি ও মনের অশান্তি সুখ দুঃখের মূল, সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা আপন আপন মনের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিতে না পারিয়া অলীক আমোদ আহ্লাদকে সুখ বলিয়া বোধ করে। যেমন তৃষিত মৃগকুল মরীচিকাকে জলভ্রমে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেই রূপ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রকৃত সুখ বা দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে না পারিয়া সুখী হইবার মানসে চরমে সমূহ দুঃখদায়ক এক প্রকার বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া কষ্ট পাইতে থাকে। তাহারা সুখী হইবার আশায় এই সংসার ক্ষেত্রে সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পাইতেছে না। বিভ্রম বশতঃ দুঃখকে সুখ জ্ঞান করিলে, মনের শান্তি জন্মিবে কেন? অর্থই যদি সকল সুখের হেতু হয়, তাহা হইলে, বিপুল ধনের অধীশ্বরেরা সচরাচর শান্তি ভোগ করিতে পান না কেন? ধনবানেরা সুখের জন্যই অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই; তথাচ, তাঁহাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃত সুখী বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সুখ ভোগের আশয়ে তাঁহারা যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়া অর্থ নাশ করেন, প্রায় তৎসমুদয়ই সময়ে সময়ে অসুখ প্রদান করে, ইহা জানিতে পারিয়াও বিভ্রম বশতঃ আবার সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোনও ধনবান্ সুখের আশয়ে কল্য যে সকল কার্য্য করিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে না পারিয়া ভাবিয়াছিলেন, আর এরূপ কার্য্য করিয়া শরীর ও মনকে কষ্ট দিব না, তিনি প্রভাতে শরীর কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেই, আবার সেই বিষম বিভ্রম বশতঃ সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অজ্ঞানতা বশতঃ যাহারা সুখ দুঃখের তারতম্য বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের নিকট সুখ দুঃখ উভয়ই সমান। গোলযোগ করিয়া কদর্য্য আমোদ প্রমোদে দিবারাত্র অতিবাহিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তবেই মনের শান্তির নাম সুখ ও মনঃপীড়ার নাম দুঃখ, ইহা সর্ব্ব সাধারণকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মনের গ্লানি সমূহই এক মাত্র দুঃখের কারণ। যখন কোনও কারণ বশতঃ মনে গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বরও সুখ অনুভব করিতে পারেন না; তাঁহাকেও সর্ব্বতোভাবে অসুখী হইতে হয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, জাতি বিশেষের ধর্ম্মের কতকগুলি কঠোর সামাজিক নিয়ম সময়ে সময়ে মানবের আত্মগ্লানির হেতু হইয়া থাকে। এক সময়ে এতদ্দেশে সতীর সহমরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। হিন্দু শাস্ত্রের প্রলোভন এই রূপ যে, যে সতী মৃত পতির সহিত হাস্যবদনে চিতানলে দগ্ধ হন, তিনি পতির সহিত অনন্ত কাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন। এই স্বর্গসুখের প্রত্যাশায় কত শত কুলকামিনী উন্মাদিনীর ন্যায় প্রজ্বলিত চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যে মরিল, সে সংসারের সকল জ্বালা হইতে নিস্তার পাইল, সে

বিষয়ের উপর এক্ষনে কিছু বক্তব্য নাই; কিন্তু সহমরণের উদ্যোগটি কত দূর ভয়ঙ্কর, এবং সেই নৃশংস ধর্ম্মাদিষ্ট কার্য্য সাধনে লোককে কি রূপে অসুখী হইতে হয়, এ স্থলে তাহাই বর্ণনের প্রয়োজন।

বোধ কর, একটি ত্রিংশ বর্ষীয় যুবকের মৃত্যু হইল। সেই উপযুক্ত পুত্রকে মৃত দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ও অন্যান্য পরিজনেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। শোকের প্রথম তরঙ্গ সমুথিত হইতেছে, এমন সময়ে পরিজনেরা দেখিতে পাইলেন যে, সেই মৃত যুবকের বিংশতি বর্ষীয় সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা তাঁহার দুগ্ধপোষ্য ক্রোড়স্থ শিশুকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আম্রশাখা হস্তে করিয়া সীমন্তে সিন্দূর দিয়া মৃত পতির শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়াই সমস্ত পরিবার কিছু সময়ের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে সতীর শ্বশুর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সকরুণ স্বরে কহিলেন, মা, তুমি আবার আমাদিগের ক্ষত শরীর লবণাক্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছ কেন? ক্ষান্ত হও। ঐ দেখ, তোমার শিশু পুত্র ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। মা, আমার তাদৃশ লোকবল ও ধনবল নাই যে, এই ভয়ানক কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিব। এই কথা শুনিয়া সতী প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন, পিতঃ, আমাকে নিবারণ করিবেন না, তাহা হইলে, আমাকে গুরুবাক্য অবহেলন জনিত পাপ ভোগ করিতে হইবে। প্রসন্ন বদনে অনুমতি করুন, আমি পতির সহিত অনন্ত ধামে গমন করি। পতির মৃত্যু সংবাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই, আমি ত মরিয়াছি। এক্ষণে আমার কায়মাত্র লইয়া গিয়া পতির সহিত সুরধুনী তটে দাহ করুন।

আপনার কিছু মাত্র ভয় নাই, আমি বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া হাস্য বদনে পতির সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইব।

অমুকের পুত্র মরিয়াছে, তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইবে, এই সংবাদ পল্লীতে প্রচার হওয়ায়, মৃত ব্যক্তির বাটীর সম্মুখ ভাগ লোকারণ্য হইয়া পড়িল। যাঁহারা নিতান্ত আত্মীয়, তাঁহারা বিরস বদনে ক্রমে ক্রমে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সমাগত নর নারীগণ মৃত ব্যক্তির পিতা মাতার অবস্থা দেখিয়া শোক করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে যাঁহারা দুই এক বার সতীদাহে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সদর্পে মৃত ব্যক্তির পিতাকে কহিলেন, মহাশয়, আপনি অত ভাবিবেন না, এ সকল বিধি কৃত কার্য্য; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, কেহই তাহার গতি রোধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলেই, আমরা শব এবং সতীকে তীরস্থ করি; যে হেতু, এ সকল কার্য্য দুই চারি ঘণ্টায় সমাধা হইবার নহে। মৃত ব্যক্তির পিতা অগত্যা সম্মতি দান করায়, কয়েক জন বলবান্ যুবক হরিধ্বনি করিতে করিতে শবের সহিত সতীকে গঙ্গাতীরে আনিলেন। গঙ্গাতীর জনতাপূর্ণ হইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্ ঘটনা স্থলে আসিয়া, রীতি মত সতীর জবানবন্দী লইলেন, এবং ব্যবস্থা মত দাহ কার্য্যের আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এ দিকে শুষ্ক কাষ্ঠে একটি প্রশস্ত চিতা প্রস্তুত হইল। সতী গঙ্গাস্নান করিয়া অলক্তক পরিধান করিলেন। তাহার পর, রক্ত পট্টবস্ত্র, রক্তসূত্রে নির্ম্মিত আভরণ, পুষ্পমালা, এবং আলুলায়িত কেশে বিবিধ বর্ণের সুন্দর পুষ্প ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর পরিধান করিয়া প্রথমতঃ সূর্য্য অর্ঘ্য দিলেন। তাহার পর, নিম্ন

লিখিত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া স্বামীর সহিত চিতার উপর শয়ন করিলেন,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥"

পাঠকগণ, সতী চিতার উপর মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিলে পর, কতকগুলি লোক তিন গাছি মোটা দড়ি দিয়া শবের সহিত সতীকে দৃঢ় বন্ধন করিল। তাহার পর, দুইটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচা বাঁশ শবের ও সতীর উপর চাপাইয়া আট জন করিয়া ষোল জন বলবান্ যুবক চিতার দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরিল। তৎপরে রীতিমত মুখাগ্নির পর চিতায় অনল সংলগ্ন করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত সংযুক্ত পাট ও ধুনা চারি দিক্ হইতে চিতার উপর অবিরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে ঢাক ঢোল, এবং শঙ্খ ঘণ্টা ও উলু ধ্বনিতে ঘটনাস্থল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশে সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে। আর হিন্দু জাতিকে সময়ে সময়ে স্ত্রীহত্যায় উৎসাহ দান করিতে হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রাদিষ্ট সহমরণ দ্বারা তৎ কালের লোককে সময়ে সময়ে কত দূর অসুখী হইতে হইত। কেবল এক কাল্পনিক স্বর্গ লাভের জন্য সেই অল্প বয়স্কা পরমসুন্দরী স্ত্রীলোকটি ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব ইচ্ছায় মৃত পতির সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইলেন। যদি পরকালে তাঁহার যথার্থই পতির সহিত কোটি কল্প স্বর্গভোগ হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা শাস্ত্রকারেরা

তাঁহাকে কত দূর প্রতারিত করিলেন; ভাবিতে গেলে, আমাদিগের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়। কথিত স্ত্রীলোকটি প্রধানতঃ শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি বচনের উপর বিশ্বাস করিয়া ইহ কালের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গেলেন। সেই যুবতী কি অল্প বয়সে মৃত পতির সহিত চিতানলে দগ্ধ হইবার জন্য অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? না, এ কথা কখনই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পতি বিয়োগের পর, তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে, কেবল এক পতি সহবাস সুখ ব্যতিরেকে সাংসারিক অন্যান্য সুখে তাঁহার কখনই অভাব ঘটিত না। হয় ত, তাঁহার সেই ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান কালে এক জন ভাগ্যবন্ লোক হইয়া আপন গর্ভধারিণী জননীকে নানা সুখে সুখী করিত। সেই স্ত্রীলোকটি জীবিত থাকিলে, সন্তানটির রীতি মত লালন পালন হইত, শোকসন্তপ্ত শ্বশুর শাশুড়ীর বৃদ্ধাবস্থায় সেবা শুশ্রূষা হইত, স্বয়ং নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন জল, এবং বস্ত্রবিহীনকে বস্ত্র দান করিয়া পরোপকার সাধন করিতেন, ক্রিয়া কাণ্ডে সাহায্য করিয়া আত্মীয়-বর্গের অনেকাংশে আনুকূল্য করিতে পারিতেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রলোভনে তিনি একেবারে স্বার্থপর হইয়া সমস্ত পরিবারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিলেন, এবং শ্বশুর ও শাশুড়ীকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়া আপনি স্বর্গ ভোগ করিতে গেলেন। অন্য কি কথা, আপনার জনক জননী ও গর্ভজ সন্তানের প্রতিও দৃষ্টি-পাত করিলেন না। তবেই এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, কেবল এক ধর্ম্ম বিশ্বাসেই স্ত্রীলোকটি অল্প বয়সে যার পর নাই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। তাঁহার শিশু সন্তানটি

এক কালে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, মহাকষ্টে পিতামহী দ্বারা লালিত ও পালিত হইতে লাগিল। সতীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীরা দীর্ঘ কাল শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহা দ্বারা আত্মীয় স্বজনের যে ভাবী উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হইল না।

শাস্ত্রকারেরা এতদ্দেশীয় নরনারীগণকে শাস্ত্র সম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত শাস্ত্র সম্মত কঠিন নিয়মগুলি মনুজকুল প্রতিপালনে সক্ষম হইবে কি না, তাহা তাঁহারা এক বারও ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা এরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আমাদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদয় নিয়ম চির কাল সমভাবে চলিয়া যাইবে। কালের পরিবর্ত্তনে যে মনুষ্যের রীতি নীতি ব্যবহার ও প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের এত দূর দূরদৃষ্টি ছিল না। যদি কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াই পুরা কালের মত কোনও মুনি ঋষির আশ্রমে গিয়া অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে, ঋষিগণের কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া অনেকাংশে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। তিনি যখন যৌবনে বিধবা হইয়া বিলাস পরিপূরিত সংসারাশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং এক ঐহিক সুখের জন্য সমাজের প্রায় সমস্ত লোককেই ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে প্রতিক্ষণ দেখিতে লাগিলেন, তখন কেবল এক ধর্ম্ম ভয়ে তিনি কি প্রকারে আত্মশাসনে সক্ষম হইবেন? সমবয়স্কা আর দশ জন স্ত্রীলোককে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হইতে দেখিয়া কথিত স্ত্রীলোকটি মনে মনে অবশ্য ভাবিতে লাগিলেন, এ কি, আমার সমবয়স্কারা কেহই ত

পরকালের ভয়ে ভীত নহে; এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেহই প্রতিপালন করিতেছে না; তবে আমিই বা কি জন্য এরূপ মহা-কষ্ট স্বীকার করিব? দশ জনের দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার পর-কালের ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। হবিষ্যান্ন ভোজন এবং কম্বল শয্যায় শয়নও ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে বিলাসের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু এক্ষণে অঙ্গ মার্জ্জন, কবরী বন্ধন, ও উত্তম বসন পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সমবয়স্কাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে শিখি-লেন। মন সর্ব্বতোভাবেই বিলাসী হইয়া উঠিল। কেবল গুরু জনের শাসনে পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে কাল বিলম্ব হইতে লাগিল। যখন মনোবিকার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ আরম্ভ করিল, দুর্দ্দ-মনীয় ইন্দ্রিয় তাড়নে শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল, তখন আর অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি রহিল না; কেবল এক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই মন নিতান্ত অসুখী হইয়া রহিল। যে কার্য্যে যাহার অতিশয় ইচ্ছা জন্মে, সে তাহার সহজ উপায় আপনা আপনি করিয়া লইতে পারে। এই জন্য যুবতী অতি অল্প কালের মধ্যেই ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু পাপপঙ্কে পতিত হওয়াতে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। যে গর্হিত কার্য্যকে পূর্ব্বে পরম সুখ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যুবতীকে সর্ব্বদা শঙ্কিতাবস্থায় কাল হরণ করিতে হইল। যদি কেহ সঙ্গোপনে দুই চারিটি কথা কহিয়া হাস্য করিত, তাহা হইলে, যুবতীর মনে হইত, ইহারা আমার দুশ্চরিত্রের কথা জানিতে পারিয়াছে; এই বারে সর্ব্বনাশ হইল। একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, পাপ কার্য্য কখনই দীর্ঘ কাল গোপন থাকিবার

নহে। অতি অল্প কালের মধ্যেই যুবতীর দুশ্চরিত্রের কথা পরিবারের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিলেন। ক্রমে বাটীর কিঙ্কর কিঙ্করীরাও জানিল; তাহাদিগের প্রমুখাৎ দুই এক জন প্রতিবেশীও শুনিল। বাটীর পরিজনেরা যুবতীর সেই পাপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তির অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। জননী ভাবিলেন, সর্ব্ব ক্ষণ কন্যাটিকে আপন চক্ষের উপর রাখিব, রজনীতে নিকটে শোয়াইব, তাহা হইলে, আর ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইবে না। তিনি যেরূপ চিন্তা করিলেন, সেই রূপ কার্য্যও হইতে লাগিল; কিন্তু যেমন বালির বাঁধে নদীর প্রবল তরঙ্গ আট্‌কাইয়া রাখিতে পারা যায় না, তেমনি ইন্দ্রিয় সুখানুরক্ত ব্যক্তিকে লৌহগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও ফল দর্শে না। যুবতীর জনক জননী কিছু কাল সদুপদেশ দিলেন, ভবিষ্যতের ভয় দেখাইলেন, তাহাতেও প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অবশেষে পরিবার সকলে এক হইয়া যুবতীকে গঞ্জনা দিতে ও উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, উহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও; কেহ বলিলেন, উহাকে একটা ঘরের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখ; যথাকালে এক মুষ্টি অন্ন দিবে এই মাত্র। ভ্রাতারা কহিলেন, না না, উহার শিরশ্ছেদন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিব; তাহা হইলে, সমস্ত আপৎ চুকিয়া যাইবে। যুবতীর প্রতি দিন যামিনী এই রূপ সকলেই উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে ভয় প্রযুক্ত কিছু দিন ঐ সকল সহ্য করিয়াও গৃহে থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন পরিবারদিগের লাঞ্ছনা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা তাঁহাকে এক দিকে পলাইতে হইল। অমুকের

কন্যা কি অমুকের ভগিনী কুলটা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই কথা পল্লী মধ্যে প্রচার হওয়াতে দুষ্টস্বভাব জ্ঞাতিগণ এবং দলপতিরা সেই যুবতীর পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে একেবারে পাইয়া বসিল। আর উহাদের বাটীতে অন্ন জল গ্রহণ করিব না, উহাদিগের সহিত আর কোনও সংস্রব রাখিব না, সকলে একবাক্য হইয়া এই রূপ আস্ফালন আরম্ভ করিল। হতভাগিনীর নিরপরাধ পিতার ও ভ্রাতৃগণের এবং শ্বশুরকুলের একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। সমাজের তাড়নায় আর তাঁহারা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না; তস্কর অপেক্ষাও তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

পাঠকগণ, এই স্থলে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুলটা যুবতীর পিতৃকুলের এবং শ্বশুরকুলের ন্যূনাধিক পঞ্চাশ জন নর নারী সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলেই সম অংশে এই অসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন? ইহা কি তাঁহাদিগের দোষ, না সমাজ ও ধর্ম্মের দোষ? হয়ত যুবতীর উভয় কুলের নরনারীগণ কস্মিন্ কালে সমাজ বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য করেন নাই, তথাচ তাঁহারা ঐরূপ অসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন কেন? এ প্রশ্নের কে সদুত্তর প্রদান করিবেন? বোধ হয়, অনেকেই ইহার প্রকৃত উত্তর দানে সক্ষম হইবেন না। তবে যাঁহারা নিতান্ত সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ, ও যাঁহারা যুক্তি সঙ্গত কথা কহিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই কথা বলিবেন যে, এই পঞ্চাশ জন নর নারীকে অসুখী করিবার প্রধান হেতু, আমাদিগের প্রচলিত অনুদার ধর্ম্ম ও সমাজ। যদি আবহমান কাল ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিত,

তাহা হইলে, কথিত যুবতীকে কখনই এরূপ ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে হইত না। যদি সমাজের ভয়ে পরিজনবর্গ উক্ত যুবতীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ না করিয়া তাঁহার বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে, ঐ কামিনী কখনই পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে জলাঞ্জলি দিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন না। পতিহীন যুবতীগণ রিপু পরবশ হইয়া যখন ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনেরা ধর্ম্ম ও সমাজের অনুরোধে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, তাহা অসহ্য বোধে কেহ বা কুলত্যাগ করে, কেহ বা আত্মঘাতিনী হয়।

উপরি উক্ত কারণ বশতঃ অস্মদ্দেশে বহুসংখ্যক জারজ পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইতেছে। ঐ সকল পুত্র কন্যার মধ্যে যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে সুশীল ও শান্ত হয়, এবং নানা গুণে গুণবান্ হইয়া উঠে, তথাপি তাহারা ধর্ম্ম ও সমাজ বহির্ভূত বলিয়া সমাজে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য অনেককে নানা গুণ সত্ত্বেও আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়। যদি তাহারা সমাজে প্রবেশ করিতে পাইত, তাহা হইলে, হয়ত কেহ কেহ আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি বলে সমাজের বিস্তর উপকার করিত। এদেশে বিধবা স্ত্রীলোকের জন্য যখন এত দূর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন সে অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখা উচিত। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, একটি বিধবা স্ত্রীলোকের জন্য তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতি ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ ব্যক্তির ঘোর মনঃপীড়া উপস্থিত হয়। সেই রূপ শত শত বিধবা রমণীর জন্য কত শত লোক মনঃপীড়া জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের

দোষে আমাদিগকে আরও কত দূর অসুখী হইতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ;—

সমাজ সাধারণ লোকের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখে না। যদি কেহ উপযুক্ত সময়ে অর্থের অনটন জন্য আপন কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন, তাহা হইলে, তিনি ধর্ম্মে পতিত ও সমাজের নিকট নিন্দনীয় হইবেন। আবার, কোনও নির্ধন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুইটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, পুত্র দ্বয়কে দায়গ্রস্ত হইয়াও ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যগুলি সমাধা করিতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, পিতা মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে ত কোনও কঠোর নিয়ম লিখিত নাই; তিল কাঞ্চন, তদনুকল্পে, অরণ্যে রোদনও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। এ কথা সত্য; কিন্তু সমাজের অনুরোধে সে সুগম পথে কেহই বিচরণ করিতে পারেন না। পিতৃ মাতৃ দায়ের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও, কাহাকে জন সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় না; কিন্তু এরূপেও ব্যয় বাহুল্য করিয়া শ্রাদ্ধাদি না করিলে, সমাজে অতিশয় মানহানি হইয়া থাকে। এই রূপ যেখানে আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল, সে স্থলেও সমাজের বন্ধন কঠিন রূপে ব্যবহৃত হইয়া সমান ফল উৎপাদন করে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল, তৎ পাঠে পাঠকগণ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে, আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করিতেছি। সত্য ধর্ম্মই আমাদিগের এক মাত্র সুখের সাধন ও উন্নতির সোপান। যে ধর্ম্ম সকল কালে, সকল দেশে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম ভাবে চলিয়া আসিতে পারে, তাহাকেই যথার্থ ধর্ম্ম বলা যায়। হিংসা দ্বেষ পরি-

ত্যাগ করিবে, সত্য কথা কহিবে, পরোপকার করিবে, ব্যভিচারে বিরত হইবে, ও সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হইবে, ইহাকেই সাধারণতঃ সত্য ধর্ম্ম বলা যায়। সর্ব্ব সাধারণ লোকে যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উক্ত কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করে, তাহা হইলে, যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণে সুখী হইতে পারে। সামাজিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই বলিলেও বলিতে পারা যায়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হইবে যে, প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। এখানে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কয়েক পঙ্‌ক্তি পদ্য মনে পড়িয়া গেল,—

"সংসারের মধ্যে দেখ ধর্ম্মই প্রধান,
সর্ব্ব কালে এ ধর্ম্মের আদর সমান।
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসী,
ধর্ম্মামৃত পান জন্য সবে অভিলাষী।
কিন্তু এ ধর্ম্মের কেহ মূল নাহি ধরে,
ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ করি ভ্রান্তি পথে চরে।"

এক সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া আমরা সময়ে সময়ে দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। কেবল আমাদিগের দেশেই কেন? এক এক বার ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে ইউরোপ খণ্ডের এক একটি দেশ একেবারে ছার খার হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণের অবিদিত নাই, আসিয়িক তুরস্কের সীরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইন্‌কে ইউরোপীয়েরা পুণ্যভূমি (Holy Land) কহিয়া থাকেন; কারণ ঐ স্থানে যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কালে সেই স্থান বিধর্ম্মী-

দিগের হস্তগত হয়। উক্ত পুণ্যভূমি বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বহু কাল কায়মনে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বিধর্ম্মীদিগের সহিত খ্রীষ্টমতাবলম্বীদিগের সংগ্রামকে ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা ধর্ম্ম যুদ্ধ (Crusade) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৎ কালের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত ধর্ম্ম যুদ্ধে যাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইবেন, তাঁহাদিগের আর কোনও কালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এই কাল্পনিক স্বর্গ লাভের প্রত্যাশায় ইউরোপের বিস্তর লোক পুণ্য ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক বৎসর বৎসর যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইত। সেই কারণে কিছু কাল ইউরোপ খণ্ড বিধবায় ও পিতৃহীন বালকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা উদরের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইত। যদি সামাজিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের এই ফল হয়, তাহা হইলে, আমরা সেই ধর্ম্মকে কেমন করিয়া সত্য ধর্ম্ম বলিব? খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারের উপক্রমে রোমীয় সম্রাটেরা ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপর কি অত্যাচার না করিয়াছেন? কেবল এক অন্ধ বিশ্বাসের জন্য কত শত লোক প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। মার্টিন্ লূথর্ যখন পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে ধর্ম্ম বিপ্লবে ইউরোপের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেও হৃদয় কাঁদিয়া উঠে।

মহাপ্রভু চৈতন্য দেব যে নূতন ধর্ম্ম যাজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল প্রভাবে কলুষিত হইয়া এক্ষণে একেবারে বিষময় ফল ফলাইতেছে। অধুনা বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেবল এক হরি নামের দোহাই দিয়া ভিক্ষা দ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের

চেষ্টা করে। কিন্তু কাল প্রভাবে তাহাদিগের উপার্জ্জনের পথে অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। এই জন্য যে সকল বৈষ্ণব স্ত্রীপুত্র লইয়া গৃহস্থের ন্যায় কাল হরণ করে, তাহাদিগের দুর্দ্দশার অবধি নাই। অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহাও স্বীকার, তথাচ স্বধর্ম্মের অনুরোধে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবে না। যে সকল বৈষ্ণব গৃহস্থাশ্রমে বাস করে না, কেবল ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দিন পাত করে, এক এক দিন তাহাদিগকে আহারাভাবে উপবাসী থাকিতে হয়। মথুরা ও বৃন্দাবনের চতুঃপার্শ্বে অনেক বৈষ্ণবের আখ্‌ড়া আছে। তাহারা কেবল আকাশ বৃত্তিব উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে কাল হরণ করে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহাদিগের দ্বারা সংসারের কি সমাজের কোনও উপকার নাই; তথাচ তাহারা গৃহস্থগণের এক প্রকার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দ্বারে দাঁড়াইলে, লোকে তাহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত না করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াও বিদায় দিয়া থাকে।

সামাজিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের দ্বারা সংসারের লোককে যে কত দূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতে গিয়াও প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় বিস্তারে বর্ণন করিতে গেলে, এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়; সেই জন্য সমুদয় বৃত্তান্ত এ স্থলে বিবৃত করিতে পারিলাম না। তবে এ কথা পাঠকগণকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সামাজিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে প্রকৃত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই কথার যিনি যত প্রতিবাদ করুন না কেন,

বিশেষ বিবেচনা করিয়া অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, সামাজিক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম কাহারও মন নির্ম্মল করিতে পারে নাই; কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সকল দেশেই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে না; কারণ সে মর্য্যাদা রক্ষা করা রিপুপরতন্ত্র মনুজকুলের অসাধ্য। শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যের ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া যে সকল কঠোর নিয়ম পালনের আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল নিয়মই আমাদিগকে সময়ে সময়ে সর্ব্বতোভাবে অসুখী করিয়া তুলে।

পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম হইতেই পৃথক্ পৃথক্ জাতির সামাজিক নিয়ম চলিত হইয়া থাকে। উক্ত সামাজিক নিয়ম সকলও সময়ে সময়ে আমাদিগের সমূহ অসুখের কারণ হইয়া উঠে। স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনে আমাদিগকে কার্য্য গতিকে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু সামাজিক নিয়ম সেরূপ নহে। আমরা সে সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কষ্ট অনুভব করি না বলিয়া তৎ প্রতিপালনে বিশেষ চেষ্টিত হই না। স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, এই জন্য বাধ্য হইয়া তৎ সমুদয় প্রতিপালন করিতে হয়। অধিক হিম লাগিলে, আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এটি স্বাভাবিক নিয়ম। যদি আমরা কোনও সময়ে কোনও কারণ বশতঃ সে নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দুরন্ত পৌষ মাসের শীতে সমস্ত রজনী পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তাহা হইলে, পর দিন প্রত্যূষেই তাহার ফল ভোগ করিবই করিব। হয়ত জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া এক পক্ষের অধিক কাল শয্যাশায়ী থাকিব, না হয়, কফ ও

কাশ পীড়ায় সর্ব্ব শরীর ব্যথিত করিয়া যার পর নাই কষ্ট দিতে থাকিবে। অনিয়মিত কার্য্য করিয়া তাহার এই ফল ভোগ করিতেছি, পীড়ার সময়ে মনে মনে তাহা বিলক্ষণ অনুভব হইবে। হয়ত, সেই সময়ে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রাখিব যে, আর হিম ভোগ করিয়া বেড়াইব না, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার এই রূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। পক্ষান্তরে, সামাজিক নিয়ম আছে যে, যদি আমি আমার প্রিয় পুত্রকে বিদ্যা শিখাই-বার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দি, ও তথায় কৃতবিদ্য হইয়া পুত্রটি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে, সমাজের ভয়ে আমি তাহাকে সহসা গ্রহণ করিতে পারিব না। যেহেতু, আমার পুত্রটি ম্লেচ্ছান্ন ভোজনে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজ নিষিদ্ধ অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পথে গমন করিয়াছিল। এই অপরাধে সেই সদাশয় ও কৃতবিদ্য পুত্রকে প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজের অনু-রোধে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে, কুটুম্ব বান্ধবেরা আমার গৃহে অন্ন জল গ্রহণ করিবেন না। যদি সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া আমি সেই পুত্রটিকে গৃহে আনয়ন করি, তাহা হইলে, চির কালের জন্য আমাকে পতিত হইয়া থাকিতে হইবে। কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে পারিব না; অন্য কথা কি, সমাজে গিয়া আত্মীয় কুটুম্বের সহিত একাসনে উপবিষ্টও হইতে পারিব না। আমার পুত্র বিলাতে গিয়া ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করি-য়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে আমার বংশে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করি-বেন, তাঁহাদিগকেও পতিত হইয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা এই রূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হন, পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া

দেখুন, এক সমাজের অন্যায় পীড়নে তাঁহাদিগকে কত দূর অনুচিত ও অনর্থক মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয়।

আমাদের আর একটি সামাজিক নিয়ম আছে যে, যিনি যেরূপ মর্য্যাদাবান্ হইবেন, তিনি সেই রূপ সংসারে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবেন। ইহার অন্যথা হইলেই, সমাজের লোক তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। বোধ কর, কেহ যদি একটি নিম্ন কুলোদ্ভব পাত্রকে সর্ব্ব গুণান্বিত দেখিয়া আপনার কন্যার সহিত বিবাহ দিবার মনন করেন, তাহা হইলে, সেই প্রস্তাব কুটুম্ব বান্ধবদিগের নিকট উপস্থিত করিলে, তাঁহারা আর কোনও দিকে দৃষ্টি করিবেন না, কেবল এক বংশ মর্য্যাদার উপর কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, আপনি কি প্রকারে এ কার্য্য করিতে সাহস করিতেছন? আপনার ন্যায় উচ্চ বংশাবতংস ব্যক্তির কন্যা ঐরূপ নীচ বংশে কখনই পড়িতে পারে না। এরূপ কার্য্য করিলে, যে কেবল আপনার মর্য্যাদার হানি হইবে এরূপ নহে, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তিরা আর আপনার সহিত আহার ব্যবহার রাখিবেন না। অমুক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আপনার কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করুন; যদিও ছেলেটির তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি নাই, কিন্তু সে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না; কারণ সে কত বড় লোকের পৌত্র, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সেটিকে জামাতা করিতে পারিলে, আপনার বংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তি কেবল এক সমাজের অনুরোধে নিজ মনোনীত সৎপাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলেন না; শুদ্ধ এক বংশ মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া অপাত্রে কন্যাটি ন্যস্ত করিলেন। কালে সেই জামাতাটি যার পর নাই অত্যাচারী হইয়া

উঠিল। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আপন বিষয় বিভব নষ্ট করিতে লাগিল। যে কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছিল, এক দিনের জন্যও তাহাকে সুখী করিল না। এরূপ স্থলে সেই কন্যার পিতাকে কত দূর অসুখী হইতে হইল, তাহা অনায়াসে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন এক জনের দোষে এক একটি বংশ চির কালের জন্য কলঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই বংশে মহানুভব ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলেও সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হন না, সেই রূপ এক জনের মর্য্যাদায় এক একটি বংশ মর্য্যাদাবান্ হইয়া উঠে। বংশধরদিগের ধন না থাকুক, বিদ্যা না থাকুক, ও তাহারা যথোচিত অত্যাচারী হয় হউক, তথাচ তাহাদিগের মর্য্যাদা খর্ব্ব হইবে না; নরাধমকে মান্য করিয়া উচ্চ আসন ও উচ্চ সম্মান প্রদান করিতে হইবে। এই সামাজিক নিয়মটি যে কত দূর আমাদের মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে; তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে, প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠিবে, এই জন্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম।

এ দেশে দীক্ষা গুরুর প্রথা বহু কালাবধি প্রচলিত আছে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন,—

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥”

যাঁহার এই রূপ ক্ষমতা আছে, তিনিই দীক্ষা গুরুর উপযুক্ত পাত্র। পূর্ব্বে ঐ রূপ ক্ষমতাবান্ লোকেরাই শিষ্যগণকে ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা গুরু দক্ষিণা যাহা প্রদান করিত, তাঁহারা

সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে সেই সকল মহা-বংশে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকে প্রণব উচ্চারণ করিতে জানেন না। যখন তাঁহারা কৃতবিদ্য শিষ্যগণকে মন্ত্র প্রদান করিতে বসেন, তখন পদে পদে তাঁহা-দিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সামাজিক নিয়মানুসারে গুরু ত্যাগ করিতে নাই। যিনি যে বংশের শিষ্য, তাঁহাকে সেই বংশ সম্ভূত এক জন নরাধমের নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। ইষ্ট দেব জ্ঞানে সময়ে সময়ে পিশাচ প্রকৃতি নরাধমগণকেও অনেকে অন্তঃপুর প্রবেশ কালে নিষেধ করিতে পারেন না। তজ্জন্য এক এক সময়ে সেই সকল অশিক্ষিত দুর্ব্বৃত্ত লোক দ্বারা কোনও কোনও পরিবারের ঘোর অনিষ্টোৎপাদন হইয়া থাকে। যদিও এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় একাধিপত্য চলে না, কিন্তু দূরস্থ পল্লীগ্রামের অজ্ঞ লোকেরা আজ কালও দীক্ষা গুরুকে অত্যন্ত ভয় করে। কোনও পল্লীর প্রান্ত ভাগে গোস্বামী প্রভুদিগের রামশিঙ্গার ধ্বনি উঠিলে, গ্রামস্থ লোক ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে ; কেহ কেহ বা গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখে ; যেহেতু, গুরু আসিয়া বার্ষিক আদায়ের জন্য শিষ্যগণকে বর্ণনাতীত উৎপীড়ন করেন। পূর্ব্বে ভূস্বামিগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাপুঞ্জকে যেরূপ উৎপীড়ন করিতেন, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে দীক্ষা গুরুর উৎপীড়ন তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। প্রভুরা মনোমত দক্ষিণা না পাইলে, যাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখেন, সমাজের লোক আর তাহা-দের বাটীতে অন্ন জল গ্রহণ করে না। এই ভয়েই বহুসংখ্যক নিঃস্ব লোক গুরুর প্রণামীর জন্য দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। যাহা-

দিগের অর্থাগমের কোনও উপায় নাই, অথচ মর্য্যাদার ভয়ে গুরু-প্রণামী আনিয়া উপস্থিত করিতেই হইবে, তাহাদিগের আর মনঃপীড়ার অবধি থাকে না। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শিক্ষিত সমাজও দীক্ষা গুরুর অত্যাচার অতিক্রম করিতে পারেন নহা গুরু যত কেন মন্দ লোক হউক না, সমাজের ভয়ে আমরা তাঁহা-দিগকে একটি উচ্চ কথা বলিতে পারিব না।

ইহা অপেক্ষাও আমাদের সমাজের মধ্যে আরও একটি ভয়া-নক কাণ্ড প্রচলিত আছে; তাহার নাম দলাদলী। এক এক সময়ে দলাদলী লইয়া এক একটি গ্রামে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে। উচ্চ বংশোদ্ভব লোকেরা এক একটি দল বাঁধিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা সমাজের কিছু মাত্র উপকার নাই; কেবল নিঃস্ব ও অকুলীন লোকের ঘোর মনঃপীড়ার কারণ হইয়া থাকে। যদি কোনও গণ্ড গ্রামে এক জন অকুলীন ব্যবসায় কার্য্য দ্বারাই হউক, কিম্বা রাজকার্য্য দ্বারাই হউক্, ধনবান্ হইয়া উঠে, তবে সেই ব্যক্তি কন্যা পুত্রের বিবাহোপলক্ষে সমাজের শিরোরত্নগণকে বাটীতে আহ্বান করিবার চেষ্টা করেন। সেই সময় দলপতি মহা-শয়দিগের দম্ভের পরিসীমা থাকে না। অনুসন্ধান দ্বারা যদি সেই ব্যক্তির সপ্তম পুরুষের মধ্যে কাহারও কোনও কলঙ্ক প্রকাশ হয়, তাহা হইলে, সেই শুভ কার্য্যের সময় দলপতি মহাশয়েরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরেন। অম্লান বদনে বলিতে থাকেন, তোমার বাটীতে আমরা কি প্রকারে গমন করি? তোমার দশ টাকার বিষয় হইয়াছে বলিয়া কি একেবারে এই দিক্পালগণকে বাটী লইয়া যাইতে সাহস কর? এই কার্য্য কি সহজে হইয়া উঠিবে? ভাল, আমরা তোমাকে যে সৎপরামর্শ দিতেছি, সেই মত কার্য্য

কর। কল্য প্রত্যূষে গলবস্ত্র লইয়া সমাজের প্রধান প্রধান লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ কর। যদি তাঁহারা তোমার সৌজন্তে পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলে, এবার না হউক, অন্য অন্য কার্য্য কালে আমরা তোমার অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা দেখিব। সেই আধুনিক ধনবান্ সর্ব্ব গুণান্বিত সাধু ব্যক্তি হইয়াও কেবল কুলমর্য্যাদার অভাবে নরাধম লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হন; তথাচ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে সহজে কৃপা করিতে চাহেন না। সেই ভদ্র লোকের বিনয় নম্রতা দেখিয়া যদি গ্রামের কতকগুলি ভদ্র লোক তাঁহার বাটীতে গমন করেন, তাহা হইলে, ঘোর দলাদলী উপস্থিত হয়; পরস্পর পরস্পরের জাত্যন্তর করিবার চেষ্টা দেখেন। অন্য কি কথা, দলাদলী সূত্রে কখনও কখনও খুল্লতাতের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের, জামাতার সহিত শ্বশুরের, এবং ভাগিনেয়ের সহিত মাতুলের আহার ব্যবহার থাকে না। এই রূপে এক জন অকুলীনকে সমাজ ভুক্ত করিবার সময়ে এক একটি গ্রামের শত শত ব্যক্তিকে মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয়।

সাধারণের অসুখের দ্বিতীয় কারণ দুর্দ্দান্ত ভূস্বামী। পাঠকগণের অবিদিত নাই, এই বঙ্গ দেশের প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ এক একটি প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামী আছেন। তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে একাধিপত্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তাঁহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রজার উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অত্যাচারে প্রজাপুঞ্জ শঙ্কিত হইয়া কাল যাপন করিত। নিঃস্ব প্রজার ধন, প্রাণ ও মান হরণ করিতে নির্দ্দয় ভূস্বামিগণ কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। তাঁহাদিগের

অপরাধ রাজকীয় বিচারালয়ে প্রমাণ করে কাহার সাধ্য। যদি কোনও ধনবান্ প্রজা ভূস্বামীর দুর্ব্বিষহ উৎপীড়ন অসহ্য বোধে সাহস করিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিত, তাহা হইলে, সাক্ষীর অভাবে তাহার সে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়াতে ভূস্বামী অনায়াসে অব্যাহতি পাইতেন। যদি দুই এক জন নিতান্ত ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভূস্বামীর প্রতিকূলে বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিতেন, তাহা হইলে, ভূস্বামী মহাশয়েরা এক রজনীর মধ্যেই তাঁহাদিগের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করিতেন, তাঁহার পরিবারবর্গকে ধরিয়া আনিয়া চূণের গুদামের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নীলদর্পণ নাটক লেখক নীলকরদিগের প্রজা পীড়নের বিষয় বিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু দেশীয় ভূস্বামিগণের কথা এক বারও উল্লেখ করেন নাই। যদি আমরা নিরপেক্ষ হইয়া বলি, তাহা হইলে, নীলকর অপেক্ষা এতদ্দেশীয় দুর্ব্বৃত্ত ভূস্বামিগণের প্রজাপীড়নও ন্যূন নহে। এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অনুজ্ঞায় প্রত্যেক গণ্ড গ্রামেই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মহকুমা হওয়াতে দুর্ব্বৃত্ত ভূস্বামীরা অনেক পরিমাণে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; তথাচ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব প্রতাপ স্মরণ করিয়া কৃষিজীবী লোকদিগের এক্ষণেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জমীদারের কাছারির একটি পেয়াদা দেখিলে, পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকই তাহাকে কৃতান্তের অনুচর বলিয়া জ্ঞান করে। পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে, কোনও উত্তম ফল, কি উপাদেয় সামগ্রী সর্ব্বাগ্রে ভূস্বামীর বাটীতে পাঠাইতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে, ভূস্বামিগণ অপমান বোধ করিয়া থাকেন। যদি কোনও কৃষিজীবী লোকের গৃহে কোনও সূত্রে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, এই

সংবাদ ভূস্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে, অর্থপিশাচ ভূম্যধিকারিগণ বলে, ছলে ও কৌশলে তাহাদিগের অর্থ হরণের চেষ্টা দেখেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র, অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে অনেক ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল সম্পত্তি ব্রাহ্মণেরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্ব কথিত রাজ দ্বয়ের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গ দেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকেন। কাল মাহাত্ম্যে এক্ষণকার কয়েক জন দুর্বৃত্ত ভূস্বামী সেই সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতেছেন। যদিও কেহ কেহ আপনাদিগের বহু কালের ভোগ দখলী কাগজ দেখাইয়া আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লন, তথাপি তাঁহারা জমীদারের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কারণ, দুর্দ্দান্ত ভূস্বামিগণ আপন আপন অধিকারস্থ কৃষকগণকে বলিয়া রাখেন যে, যদি তোমরা অমুক অমুক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ভূমিতে হল চালনা কর, তাহা হইলে, তোমাদিগকে চাল কাটিয়া উঠাইয়া দিব। সেই ভয়ে কৃষকেরা ব্রহ্মোত্তর ভূমির নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের সুখে কাল যাপনের পথ বন্ধ হইয়া যায়। নগরবাসী লোকেরা পল্লীগ্রামের ভূস্বামীর চরিত্র কিছু মাত্র অবগত নহেন। তাঁহারা গবর্ণমেন্টের চক্ষের উপর রামরাজত্ব ভোগ করিতেছেন; কিন্তু পল্লীগ্রামের লোককে ভূস্বামীর ভয়ে ধন, প্রাণ ও মান লইয়া সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়।

পূর্ব্বে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, এই গুলি সময়ে

সময়ে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ঘোর মনঃপীড়ার হেতু হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্যক্তি বিশেষকে যে যে বিষয়ের জন্য প্রায়ই বর্ণনাতীত অসুখী হইতে হয়, নিম্নে তাহাই লিখিত হইতেছে।

যদি কেহ কোনও নূতন পল্লীতে আপন বাসোপযোগী একটি বাটী প্রস্তুত করণের অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রতিবেশীরা কি রূপ লোক, তাহা বিশেষ রূপে অনুসন্ধান লওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়; কারণ কলহপ্রিয় প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করিতে গেলে, গৃহস্থ-গণকে পদে পদে অসুখী হইতে হয়। এক এক পল্লীতে এরূপ দুই এক জন লোক আছে, যাহাদিগের দৌরাত্ম্যে পল্লীস্থ লোক-দিগকে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। তাহারা সামান্য সূত্র ধরিয়া নিতান্ত সজ্জন প্রতিবেশীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেই সকল দুরা-ত্মারা পরস্পরের সহিত কলহ বাধাইয়া আপনাদিগের উপা-র্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিতে যায়। শান্ত সজ্জন প্রতিবেশি-বৃন্দ সহজে কলহে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহারা আপনা আপনি এক একটি কলহের সূত্র তুলিয়া লয়। তাহারা কেবল প্রতি-বেশিগণকে কার্য্য গতিকে বিরক্ত করে এরূপ নহে। যদি পল্লীস্থ লোক উক্ত দুরাত্মাগণের সহিত কোনও অংশে সংস্রব না রাখেন, ও তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও অপকার করিলেও উপেক্ষা করিয়া যান, তথাচ ঐ সকল দুষ্ট লোকেরা আপন আপন পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা কলহ বিবাদ ঘটাইয়া নিরীহ প্রতিবেশি-গণকে কখনও কখনও বিচারালয়ে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া থাকে। কোনও কোনও রজনীতে উপরি উক্ত অসৎ পরিবারের কলহ

সম্ভূত চীৎকার শব্দে নিকটস্থ প্রতিবেশিগণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না। এরূপ কলহপ্রিয় প্রতিবেশীর সহিত এক পল্লীতে বাস যে সমূহ অসুখের কারণ, তাহাতে আর সংশয় কি?

অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা অসুখের আর একটি কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে। ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস্ অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যার হস্তে পড়িয়া যার পর নাই অসুখে কাল হরণ করিতেন। যদিও তাঁহার মন সর্ব্বতোভাবে উন্নত ছিল, সাংসারিক তরঙ্গে সহসা তদীয় শিক্ষিত মনকে বিচলিত করিতে পারিত না; তথাচ এক এক সময়ে তিনি ভার্য্যার কটূক্তি অসহ্য বোধে গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। সক্রেটিসের জীবনী পাঠে জানা যায়, এক দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী কোনও কারণে তাঁহার সহিত ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হন। সক্রেটিস্ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আপন সহধর্ম্মিণীর চীৎকার ধ্বনি শুনিয়াও শান্ত ভাবে গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যখন গৃহিণী কর্কশ স্বরে কটু কাটব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তদীয় বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া মহাত্মা সক্রেটিস্ বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গৃহিণী পতিকে অবিচলিত মনে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া উপর হইতে এক কলস জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেটিস্ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "এমন গর্জ্জনের পর যে বর্ষণ হইবে, ইহা অসম্ভব নহে।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এ দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া যাইতেছেন। পুরা কালে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি পতিপরায়ণা রমণীগণ কেবল এক স্বামী সেবার জন্য সাংসারিক সমস্ত বিলাস ভোগের উপায়

সত্ত্বেও বনবাসিনী হইয়া দুঃসহ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীসেবাই পরম সুখ বলিয়া জানিতেন। এক্ষণকার রমনীগণ নানালঙ্কারে বিভূষিত হওয়া, হস্তে কিছু অর্থ থাকা ও স্বামীকে ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ রাখাই পরম সুখ বোধ করেন। স্বামী বিপদে পড়িলে, তাঁহারা স্বয়ং সাবধান হইতে থাকেন। স্বামী যদি কোনও বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দূর দেশে গমন করেন, এক্ষণকার রমণীগণের অনেকের তাহাতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। তিনি দীর্ঘ কাল দূর দেশে অবস্থান করুন, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। উপার্জ্জন দ্বারা যদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিলাস চরিতার্থ করিতে পারেন, তাহা হইলেই, তাঁহাদের মতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রকৃত কার্য্য করা হইল; তাহার অন্যথা হইলেই, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। স্বামী যদি আপন স্ত্রীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, কোনও কালে পরস্ত্রীর মুখাবলোকন না করেন, আর আভরণ দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে, এরূপ স্বামী এক্ষণকার রমণী মণ্ডলে কুস্বামী বলিয়া গণ্য হন। স্বামী সুরাপায়ী বেশ্যাসক্ত হইয়াও যদি আপনার সহধর্ম্মিণীকে নানালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে, স্বামীর পূর্ব্ব কথিত জঘন্য বৃত্তি সকল সহধর্ম্মিণীর নিকট তত দূর দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। কেবল এক বিবাহিতা স্ত্রীর বিলাস চরিতার্থ করিতে গিয়া এক্ষণকার পুরুষ মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। স্ত্রীর প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে না পারিলে, পুরুষ মাত্রেই অসুখী হইয়া উঠে। কারণ যিনি যে অবস্থার লোক হউন না কেন, সমস্ত দিন বিষয় কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকাতে তাঁহার মনঃ প্রাণ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। সন্ধ্যার পর আপন আপন গৃহে

প্রবেশ করিয়া যদি গৃহিণীর হাস্য বদন দেখিতে পান, মিষ্ট কথা শুনিতে পান ও ইচ্ছামত পান ভোজন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, সমস্ত দিনের কষ্ট দূর হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এক্ষণকার স্ত্রীলোকেরা স্বামীর ক্ষমতার অতিরিক্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। কোটিপতিরাও আপন আপন সহধর্ম্মিণীর সর্ব্বতোভাবে বিলাস চরিতার্থ করিতে পারেন না, নিঃস্ব লোকের ত কথাই নাই। এরূপ স্থলে বিবাহিত পুরুষেরা ঐ রূপ পত্নী লইয়া কি প্রকারে সুখী হইবেন ? প্রিয়বাদিনী রমণী কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণকার অনেক লোক অনুভব করিতেও পারেন না। পতির অর্থ শোষণ করাই ইদানীন্তন স্ত্রীলোকগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা যৌবন কাল হইতেই আত্মসাবধান করিতে আরম্ভ করেন। কালে বিধবা হইব, ইহা তাঁহাদিগের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈধব্য অবস্থায় কোনও রূপ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, সুখ স্বচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে কাল হরণ করিতে পারি, এই আশয়ে চির কাল পতিকে বিরক্ত করিয়া থাকেন। আভরণের অভাব দূর হইলে, কতকগুলি সম্পত্তি নিজ নামে করিবার জন্য এক এক জন স্ত্রীলোক ক্রমান্বয়ে *প্রতি রজনীতে পতির সহিত কলহ করিয়া থাকেন।* সেই সকল পুরুষেরা কেবল এক অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীর কারণ এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন না। তবে ইহা অবধারিত *হইল যে, এক্ষণকার অনেক লোক দুঃশীলা স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া* সর্ব্বতোভাবে সুখ শান্তি ভোগে নিরাশ হইয়া থাকেন।

অবাধ্য মূর্খ পুত্র সদাশয় সাধু পিতার ঘোরতর অসুখের কারণ হইয়া উঠে। এক একটি মূর্খ পুত্র হইতে এক একটি মহা-

বংশ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। দূরদর্শী চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা। দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥" পুরাণাদি পাঠে কুলাঙ্গার পুত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যদিও মূর্খ ছিল না; কিন্তু মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অপার শোক সাগরে ডুবাইয়া আপনারা অকালে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছিল। কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্র দুর্য্যোধনের বাল্য চরিত্র অবগত হইয়া মন্ত্রী-চূড়ামণি বিদুর অন্ধরাজকে কহিয়াছিলেন, মহারাজ, আমার অনুরোধ, আপনি এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার আকার প্রকার ও রীতি নীতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কুলাঙ্গার পুত্র হইতেই কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। দেবী গান্ধারী শত পুত্র প্রসব করিয়াছেন; এই জন্য আমি বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি যে, কুলাঙ্গার এক পুত্র পরিত্যাগ করিয়া একোনশত পুত্রের ভাবী মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখুন। ধৃতরাষ্ট্র অপত্য স্নেহ বশতঃ বিদুরের কথায় কর্ণ পাতও করিলেন না। কালে পিতার অবাধ্য এক দুর্য্যোধন হইতেই ভীমসেনের প্রচণ্ড গদাঘাতে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র সমরশায়ী হয়। পুত্রগণ নিহত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরের কথা স্মরণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের ন্যায় পিতার অবাধ্য হইয়া মথুরাধিপতি উগ্রসেনের এক মাত্র পুত্র কংস, চেদীশ্বর শিশুপাল ও বিদর্ভরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী অকালে কাল কবলশায়ী হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে চির কালের জন্য শোক সাগরে ভাসাইয়াছিলেন। পিতা মাতার কুলাঙ্গার পুত্র হইতে মহাবংশের নাশ পুরাণাদিতে

ও ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীশ্বর শাহ জাহান্‌কে দুর্ব্বৃত্ত পুত্র আরঙ্গেব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া জীবনের শেষাংশ মহাকষ্টে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এক্ষণকার কালে অবাধ্য পুত্রের অভাব নাই। অনেকেই পিতা মাতার জীবদ্দশাতেই ভিতরে ভিতরে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া রাখে; কালে পৈতৃক বিষয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া আর অধিক দিন আপনার পরিবারকে ভরণ পোষণ করিতে পারে না। এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে বিপুল সম্পত্তিশালী লোকের ঘর এক একটি কুলাঙ্গার পুত্র হইতে ছারখার হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও যাইতেছে। তবেই কুলাঙ্গার মূর্খ পুত্র হইতে লোকে যার পর নাই অসুখী হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। অবাধ্য মূর্খ পুত্র পিতা মাতার চির দুঃখের কারণ হইয়া উঠে।

উদরান্নের জন্য যাঁহারা চির কাল বিদেশে বাস করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় অসুখী আর নাই। প্রতিক্ষণ তাঁহারা চিন্তার অতল সাগরে ডুবিয়া থাকেন। যদি দশ দিন বাটীর সংবাদ না পান, তাহা হইলে, আর অসুখের পরিসীমা থাকে না। মনে মনে নানা অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সর্ব্ব ক্ষণ চিন্তাকুল হইতে থাকেন। প্রবাসী লোকেরা বহু ব্যয় করিয়াও মনোমত আহার করিতে পান না। সাধ্বী পত্নীর সেবা ভক্তি প্রায়ই তাঁহাদিগের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। অপত্যগুলিকে লালন পালন করা, তাহাদিগের অর্দ্ধস্ফুট অমৃত তুল্য কথা শুনিয়া হৃদয়ের গ্লানি দূর করা, জনক জননীকে সেবা ভক্তি করিয়া মনুষ্য জন্ম সফল করা, ভ্রাতা ভগিনীগণের অকৃত্রিম প্রীতিলাভ করা প্রভৃতি প্রবাসী লোকের দুর্লভ হইয়া উঠে। যদিও দীর্ঘ কালের পর অতি অল্প কালের জন্য স্বদেশে

আগমন করেন, তথাপি সেই সংক্ষিপ্ত সময় সংসারের গোলযোগ মিটাইতেই অতিবাহিত হইয়া যায়। নিশ্চিন্ত হইয়া পরিবার-গণের সহিত সাংসারিক সুখ ভোগ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল এক অর্থের জন্য দূর দেশে বাস করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা কোনও কালেই প্রকৃত সাংসারিক সুখ অনুভব করিতে পারেন না। দূর দেশে বাস কালে যখন তাঁহাদিগের মনে জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনের কথা উদয় হয়, তখন একেবারে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, মনে আর শান্তি থাকে না। এই জন্যই সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে, যে অঋণী অপ্রবাসী হইয়া দিনের মধ্য ভাগে শাকান্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী; ইহার বিপরীত অবস্থা-পন্ন লোকেই সর্ব্বতোভাবে অসুখী। সাংসারিক লোকের পক্ষে চির কাল বিদেশে বাস যে মহৎ অসুখের মূল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। এতৎ সম্বন্ধে যে কয়েক পঙ্ক্তি লিখিত হইল, তাহাই যথেষ্ট।

উদরান্নের জন্য দাসত্ব এবং বিদেশীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার অধিকারে বাসও সময়ে সময়ে মনুজকুলের মহৎ অসুখের কারণ হইয়া উঠে। আমরা বহু কালাবধি বিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মা-ক্রান্ত রাজার অধিকারে রহিয়াছি, স্বাধীনতা সুখ কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে আর ভাবিয়া আনিতে পারি না; এই জন্যই বিদেশীয় রাজার হস্তে ধন, প্রাণ ও মান সমর্পণ করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছি। যে সকল লোক বেতন-ভোগী দাস হইয়া রাজপুরুষগণের কিম্বা বিদেশীয় বণিক-গণের সেবা করিতেছে, সময়ে সময়ে তাহাদিগের মনঃপীড়ার

অবধি থাকে না। যাহারা বেতনভোগী দাস হইয়া আপন প্রভুর নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগের মুখে সুখের কথা শ্রবণ করাই আশ্চর্য্য। পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে, মনুষ্যের মনে কি শান্তির লেশ মাত্র থাকে? যখন পাণ্ডবগণ শত্রুভয়ে আত্মগোপন করিবার জন্য বিরাটরাজের দাসত্ব স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের কুল-পুরোহিত মহাবিজ্ঞ ধৌম্য রাজসেবায় কি কি বিঘ্ন আছে, পাণ্ডু-পুত্রগণকে বিস্তারে বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মুনিবরের উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই;—

"ক্ষত্র মধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে,
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে রবে ভাল মতে,
রাজসেবা করিয়া থাকিবে রাজনীতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন,
রাজারে বিশ্বাস না করিবে কদাচন।
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজ আজ্ঞা হয়,
আপনার প্রাণপণে করিবে নিশ্চয়।
অন্তঃপুর নারী সঙ্গ না কহিবে কথা,
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা।
হরষেতে মত্ত না হইবে কদাচন,
রাজা সনে না কহিবে রহস্য বচন।
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে,
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবে।

ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত,
নৃপতি করেন কর্ম্ম সব বিপরীত।”

পরাধীন লোকদিগের জন্যও ওই নিয়মগুলি অবধারিত হইতে পারে। যাহারা কায়মনোযত্নে উপরি উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের অন্তরে কি সুখের লেশ মাত্র থাকে? অন্নদাতার ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া কাল হরণ করিতে হয়। প্রভু কোনও গর্হিত আদেশ করিলেও ইচ্ছার বিপরীতে তাহা সমাধা করিতে অগ্রসর হইতে হয়। প্রভু কিঙ্করদিগের প্রতি সামান্য কারণে ক্রোধ করেন। তাহারা প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াও অনেক সময়ে যশোলাভ করিতে পারে না। যেমন বিধবার একাদশী ব্রত—না করিলে বিলক্ষণ প্রত্যবায় আছে, করিলে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হয় মাত্র; প্রভুর নিকট কিঙ্করের কার্য্যও তদনুরূপ। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে স্বাধীনতা সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কে কোথায় সুখী হয়? এই জন্যই কোনও কবি লিখিয়াছেন;—

“সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!
এক দিন—এক দিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর গৃধিনীর করে!”

এই স্বাধীনতা যে সকল লোক উদরান্নের জন্য পরের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদের কোনও সুখেরই সম্ভাবনা নাই। বিশ্রাম সুখ সম্ভোগের কথা দূরে থাকুক, কাহারও কাহারও প্রত্যহ স্নানাহারেরও অবসর হয় না। এই রূপে দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়; কেবল প্রাণপণ চেষ্টায় প্রভুর সেবা করাই এক মাত্র কার্য্য হইয়া উঠে। মনুষ্যের সকল কার্য্যেই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা বহুসংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, কার্য্য গতিকে তাঁহাদিগের কোনও ভ্রম ঘটিলে, অধীন লোকদিগকে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়; কিন্তু দৈবাৎ যদি কোনও কিঙ্করের সেই ভ্রম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, প্রভুর ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না; আরক্ত নয়নে ভৃত্যকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্ষুদ্রজীবী কিঙ্কর হইলে, তাহার ভ্রম প্রমাদের কশাঘাত ও পদাঘাত প্রকৃত পুরস্কার হয়। কেবল মনুষ্য কেন, বন্দী অবস্থায় পশু পক্ষীরাও সাতিশয় অসুখের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া থাকে। যদি স্বর্ণপিঞ্জরে একটি শুকপক্ষী রাখিয়া প্রত্যহ তাহাকে রসাল দাড়িম্ব ফল ভক্ষণ করাও, তথাচ সে সুযোগ পাইলেই, সুরম্য অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে ও স্বাধীন ভাবে বৃক্ষ শাখায় বসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিবে।

সংসারের বহুসংখ্যক লোক আপনার ক্ষমতাতীত বিলাস ভোগ ও মান মর্য্যাদা ক্রয় করিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ঋণের ন্যায় মনঃপীড়াদায়ক বিষয় আর নাই। যখন লোকে ঋণ গ্রহণ করে, তখন অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখে না; উপ-

স্থিত কার্য্য সম্পন্ন হইলেই পরম আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু যখন ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়, উত্তমর্ণ যখন সর্ব্বদা অধমর্ণের বাটীতে গমনাগমন আরম্ভ করে, সুদে আসলে কত হইল, তাহার হিসাব দেখাইয়া দেয়, তখন ঋণগ্রহীতার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে, ঋণদাতাকে কৃতান্তের অনুচর বলিয়া বোধ হয়, আহার বিহারে কিছু মাত্র মনের সুখ থাকে না। যে নিদ্রা আমাদিগের সমস্ত সন্তাপ হরণ করে, সময় বুঝিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেও পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রাণাধিক সন্তানগণকেও আর ভাল লাগে না। কি করিলাম, কি হইল, কল্য প্রত্যুষে ঋণদাতা পুনরাগমন করিলে কি বলিব, এই রূপ চিন্তানলে জীবন্ত শরীর সর্ব্ব ক্ষণ দগ্ধ হইতে থাকে। বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চিন্তা রূপ অনলের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে পলায়ন করে। সৎ প্রবৃত্তির বিনিময়ে অসৎ প্রবৃত্তি আসিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সেই ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। ঐ বিপদের সময়ে যদি কোনও হিতৈষী বন্ধু সৎ পরামর্শ দিতে যান, অর্থাৎ এরূপ কথা বলেন, বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ কর, তাহা হইলে, সমূলে নষ্ট হইবে না, এক রূপ মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিবে। বিলাস একেবারে পরিত্যাগ কর। মনুষ্যের অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া চলাই উচিত। ঋণের উপর আরও ঋণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব ভাব রক্ষার চেষ্টা করিও না। ভাঙ্গা ঘরে তালি দিলে কখনই রক্ষা হয় না। বন্ধু বান্ধবের এই সকল ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত কথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বিষবৎ জ্ঞান

হয়; তখনও সে ঋণের উপর ঋণ করিয়া আরও দিন কতক সংসার রূপ নাট্যশালায় নৃত্য করিয়া লয়। পরে যখন ঋণ পূর্ণ মাত্রায় উঠে, তখন একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। সে সময়ে আর সে আপন মান মর্য্যাদা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে না; এক ঋণ দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চির কালের জন্য ঘোর অসুখে কাল যাপন করিতে থাকে।

শারীরিক অসুস্থতা, আত্মীয়গণের নিতান্ত কঠিন পীড়া ও সংসারের অপ্রতুল যদি কোনও গৃহস্থের এক কালে ঘটে, তাহা হইলে, সেই গৃহস্বামীর ন্যায় অসুখী সংসারে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনার শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িলে, মহাসম্পৎশালী ব্যক্তিরও মনে সুখের লেশ মাত্র থাকে না। সর্ব্ব ক্ষণ রোগের তাড়নায় মন অধৈর্য্য হইয়া উঠে। দীর্ঘ কাল ইচ্ছামত পান ভোজন করিতে না পাওয়ায় শরীর ক্ষীণ হওয়াতে কথায় কথায় ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগের যন্ত্রণায় সুখে নিদ্রা হয় না। সর্ব্বোপরি মৃত্যুভয় প্রবল হইয়া উঠিলে, একেবারে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া যায়। কিসে প্রাণ রক্ষা হইবে, কিসে পুনর্ব্বার ইচ্ছামত পান ভোজন করিতে পাইব, কবে শরীর সবল হইবে, কবে আবার আত্মীয় স্বজনের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইব, রোগী ব্যক্তিকে পর্য্যায় ক্রমে এই সকল চিন্তায় অনুক্ষণ মহৎ অসুখে কাল হরণ করিতে হয়। যদিও সে ব্যক্তির মনুষ্যের অভিলাষোচিত সমস্তই আছে; কিন্তু কেবল শরীর রুগ্ন হইয়া পড়াতে সমস্ত সুখ সত্ত্বেও নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। মনে মনে কত প্রকার বিলাসের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু সে সকল চিন্তা তৎ কালে তাহার

পক্ষে স্বপ্নবৎ বোধ হইতে থাকে। রুগ্ন ব্যক্তির সম্মুখে পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ উপাদেয় বস্তু আহার করিতেছে, উন্নত অট্টালিকার উপর সুখদ শয্যায় শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; কিন্তু সে সেই সুখপূর্ণ গৃহের সর্ব্বেশ্বর হইয়াও সুখের লেশ মাত্র অনুভব করিতে পারে না। সজ্জিত গৃহ তাহার পক্ষে শ্মশান সদৃশ, এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। রুগ্ন ব্যক্তি উপযুক্ত পথ্য সেবনের সময় বোধ করে, যেন পরিবারগণ বলপূর্ব্বক তাহাকে বিষ ভোজন করাইতেছে। আবার যে রোগী অধৈর্য্য ও অবাধ্য, রুগ্নাবস্থায় তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। ফলতঃ, পৃথিবীতে যত প্রকার অসুখ আছে, তন্মধ্যে উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘ কাল শয্যাশায়ী থাকার ন্যায় আর কিছুই নাই।

এই ভবের হাটে আসিয়া সর্ব্ব বিধায় সুখী হওয়া দুর্ঘট। বিষয় আছে, পুত্র নাই; বিভব আছে, শরীর অসুস্থ; সংসারে সর্ব্ব প্রকার সুপ্রতুল, কিন্তু সহধর্ম্মিণী দীর্ঘ কাল রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; পরিবার মধ্যে ঐ এক জনের অসুখে সকলকেই অসুখী হইতে হয়। যে গৃহে একটি মাত্র রোগী উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করে, সে গৃহে আর কাহারও মনে শান্তি থাকে না; সকলকেই অসুখী হইতে হয়। আবার দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে চারি পাঁচটি রোগী এক সময়ে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে, তখন আর পরিবারগণের ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। যেখানে একটি রোগীর উচিত মত সেবা শুশ্রূষা করা সমস্ত পরিবারের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে, সেখানে চারি পাঁচটির সেবা শুশ্রূষা করা কি সহজ ব্যাপার!

সংসারে দুই চারিটি পরিবার রুগ্ন হইয়া পড়িলে, ধন নাশ, বুদ্ধি নাশ, অবশেষে সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত হইয়া যায়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোনও ব্যক্তির এক মাত্র পুত্র যক্ষা রোগগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘ কাল শয্যাশায়ী ছিল, পিতা ধনের প্রতি কিছু মাত্র মমতা না রাখিয়া সন্তানটির আরোগ্য লাভের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুত্রটি দীর্ঘ কাল রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইল। তাহার চিকিৎসার জন্য গৃহ স্বামীর সঞ্চিত ধনের আর এক কপর্দ্দকও রহিল না।

উপরি উক্ত দুরবস্থা সম্পন্ন লোকে এক ধনের বলে অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি নিঃস্ব, সংসারে অপ্রতুল যাহাদের সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, তাহার উপর আবার তাহাদিগের যদি শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে ও মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুত্র পরিবারগণ উৎকট রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে, সে সকল ব্যক্তির আর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। তাহারা ভয়ানক মনঃপীড়া ভোগ করে।

সাংসারিক অভাবের ন্যায় অসুখ গৃহস্থের পক্ষে আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ গৃহস্থের দারিদ্র্য অবস্থা কবিতায় বর্ণন করিয়া ধনী সন্তানগণের নিকট সেই সকল কবিতা ব্যাখ্যা করিতেন। যদি লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ সেই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া দরিদ্রের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ পাত করেন, এই উদ্দেশ্যেই সেই সকল কবিতা বিরচিত হইত। অদ্যাপি অনেক পণ্ডিত পূর্ব্ব কালের রচিত কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল কবিতা কি রূপ স্থলে প্রস্তুত হইত, তাহার দুই একটি উদাহরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের বিষয়বুদ্ধি প্রায় থাকিত না। কি রূপে ধনার্জ্জন ও ধন সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা তৎ কালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা একেবারেই জানিতেন না, ও শিক্ষা করিতেন না; এই জন্য স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সময়ে সময়ে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতেন। একটি উদ্ভট গল্পে বর্ণিত আছে, এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের পর্য্যায় ক্রমে পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। পুত্রগুলি প্রত্যূষে উঠিয়া খাদ্য সামগ্রীর জন্য জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। এক এক দিন ঐ পণ্ডিতের গৃহে তণ্ডুল কণাও থাকিত না যে, দুটি দুটি আমান্ন বালকগণের হস্তে দিয়া তাহাদিগকে ভুলাইবেন। এক দিন প্রত্যূষে বালকগুলি আহার সামগ্রীর জন্য জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। জননী ক্রোধ করিয়া এক সেরের অধিক আতপ তণ্ডুল আনিলেন, ও এই খাও বলিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন। বালকেরা অম্লান বদনে তাহাই মুটা মুটা করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ পত্নী সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, তোরা এ অভাগিনীর গর্ভে কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি? যদি কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতিস্, তাহা হইলে, তোদের জনক জননী এই প্রত্যূষ সময়ে উষ্ণ দুগ্ধ ও মোহনভোগ খাওয়াইয়া তোদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মে তোরা অনেক পাপ করিয়াছিলি, সেই অপরাধে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক দিনের জন্যও ইচ্ছামত খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিতে পাইলি না। গৃহিণীর এই সকল কাতরোক্তি

শুনিয়া ব্রাহ্মণ শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণি, আজ তোমার কথায় আমার চৈতন্য লাভ হইল। এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথমে মনুষ্য পশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করে; কারণ, তাহারা এক বৎসর বয়ঃক্রমাবধি চারি পাএ হাঁটিয়া থাকে। তাহার পর মনুষ্য দুই পাএ চলে। তখন তাহাদিগকে পক্ষী বলিয়া সম্বোধন করাই উচিত, যেহেতু, এক মাত্র উদরের জন্যই তাহারা দুই চরণে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। দার পরিগ্রহের পর মনুষ্যের পুনরায় পশুত্ব প্রাপ্তি হয়; কেননা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই জনের চারি খানি চরণ একত্র না হইলে, কোনও কার্য্যই হয় না। তাহার পর পেটের জ্বালায় সর্ব্বদা তাহাকে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে হয়। আবার যাহার বহু অপত্য হইয়াছে, তাহাকে বৃশ্চিক বলিয়া সম্বোধন করা উচিত। দেখ, তুমিও বৃশ্চিক আর আমিও বৃশ্চিক। কখনও বা তোমার দংশনে আমি জ্বালাতন, কখনও বা আমার দংশনে তুমি জ্বালাতন হইয়া থাক; অতএব আমাদিগের আর কোনও সুখেরই প্রত্যাশা নাই। এক্ষণে ধৈর্য্যের সহিত বৃশ্চিকের জ্বালা সহ্য কর। পতির এই রূপ উন্মত্তের ন্যায় কথা শুনিয়া গৃহিণী আরও রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; উপরি উক্ত ভাবের দুইটি কবিতা রচনা করিয়া চতুষ্পাঠীতে গিয়া বসিলেন। তৎ কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সহজে মনকে আকুল করিতেন না। সংসারের সমূহ অপ্রতুল সত্ত্বেও কেবল এক দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনায় মনকে আনন্দ সলিলে ভাসাইয়া রাখিতেন।

কোনও সময়ে এক জন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিতান্ত অপ্রতুল

ঘটিয়াছিল। পর দিন কি প্রকারে আহার চলিবে, এই চিন্তায় গৃহস্বামী একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাসা লইয়াছিলেন। সেই নিঃস্ব ব্যক্তি মনে মনে ভাবিলেন, কল্য পুত্রটিকে ক্রোড়ে করিয়া ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে যাইব, ও তথায় দুই চারিটি কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, অবশ্যই আমার পুত্রের হস্তে উক্ত ব্যক্তি একটি মুদ্রা দিবেন, সেই মুদ্রা দ্বারা আমরা দুই দিবস অনায়াসে সুখ সচ্ছন্দে দিন পাত করিতে পারিব। ব্রাহ্মণ এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্রটি একটি ক্ষুদ্র বাটী করিয়া কতকগুলি ভর্জ্জিত তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেছে। তিনি বলপূর্ব্বক তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, আয়, আজি আর তোকে ভর্জ্জিত তণ্ডুল খাইতে হইবে না। আমি এক জন বড় মানুষের বাটীতে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আসিলে সন্দেশ খাইতে পাইবি। বালক সন্দেশের কথা শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিল। ব্রাহ্মণ শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সেই সম্পন্ন লোকের বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন।

যাঁহারা কোনও কালে দুঃখের লেশ মাত্র ভোগ করেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের মনে মনে এই রূপ ধারণা আছে যে, জগতে কাহারও অপ্রতুল নাই; এই জন্য তাঁহারা লোকের মুখ দেখিয়া দুঃখের ভাব অনুভব করিতে পারেন না। সেই ব্রাহ্মণ যখন আপনার শিশু পুত্রটি ক্রোড়ে করিয়া উক্ত ধনাঢ্য লোকের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখনও ঐ শিশুটির মুখে দুই একটি

ভর্জ্জিত তণ্ডুল লাগিয়া রহিয়াছে, এবং দক্ষিণ হস্তের মুটার ভিতরও দুই চারিটি ছিল। ধনী সেই ভর্জ্জিত তণ্ডুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এ কি মহাশয়! এমন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভর্জ্জিত তণ্ডুল খাইতে দিয়াছেন কেন? এরূপ শিশুকে প্রাতে উষ্ণ মোহনভোগ ব্যতিরেকে আর কিছুই খাইতে দিতে নাই। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণ আপন দরিদ্রতার উপর একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। দুরদৃষ্ট বশতঃ যে ব্যক্তির নিকট কবিতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তির সংস্কৃতে কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না; সুতরাং সেই কবিতায় ঐ ধনমদে মত্ত ব্যক্তি কর্ণপাত না করিয়া কিঙ্করকে বলিলেন, আমার চা খাইবার আয়োজন করিয়া দে। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ এক রজত পাত্রে চাএর সমস্ত আয়োজন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। ধনী ব্যক্তি চা খাইতে খাইতে আপন আধিপত্যের কথা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ যে কি অবস্থাপন্ন লোক তাহার একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন যে, ঈশ্বর যখন আমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, তখন সেই দারিদ্র্য ভঞ্জন ভগবান্ ব্যতিরেকে আমার দুঃখের অন্ত হইবে না। প্রত্যূষে উঠিয়া যদি হৃদয়ের সহিত ভগবানকে ডাকিতাম, তাহা হইলে, ইহ পরকালের কার্য্য হইত। আমার সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া এই ধনীর গৃহে প্রবেশ করা অন্যায় হইয়াছে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ পুত্রটিকে ক্রোড়ে করিয়া আপন আবাসে উপস্থিত হইলেন। শিশু সন্তানটি ব্যগ্র হইয়া পিতার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিল, ও পুনর্ব্বার সেই

বাটী লইয়া ভর্জ্জিত তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, স্ত্রীলোকের ন্যায় আকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন।

যে সকল লোকের পুত্র কন্যা আছে, প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা আছে; কিন্তু কেবল এক অর্থ না থাকাতেই সেই পুত্র কলত্র সত্বেও সেই সকল লোক এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হইতে পারে না। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, কোনও কোনও পতিপরায়ণা রমণী স্বামী পরলোক গত হইলে, অপোগণ্ড শিশু সন্তানগুলি লইয়া যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। যত দিন হস্তে পূর্ব্ব সঞ্চিত কিছু অর্থ থাকে, তত দিন কুটুম্ব বান্ধবের নিকট আপন দরিদ্রতার বিষয় গোপন করিয়া কায় ক্লেশে দিনপাত করিয়া থাকেন। যখন সঞ্চিত অর্থ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, সেই সময় ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে থাকেন। সন্তানগুলি তখন জননী ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তাঁহার হস্তে অর্থ আছে কি না, তাহারও সংবাদ রাখে না, ক্ষুধা হইলেই আহার করিতে চাহে, ও প্রতিবেশীদিগের সন্তান সন্ততিরা যেরূপ উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করে, উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করে, তাহারা দুঃখিনীর সন্তান হইয়াও সেই রূপ অশন বসনের জন্য ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিয়া জননীকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। তিনি অবোধ বালক বালিকাকে বচনের দ্বারা শান্ত করিতে না পারিয়া একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন।

সে সকল সাধ্বী রমণী পতি বিয়োগের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্র কন্যাগণকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সাবিত্রী। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণের মুখে গল্প শুনিয়াছি, কোনও দরিদ্র ভদ্র মহিলা

কেবল এক চরকায় সূতা কাটিয়া দুইটি পুত্রকে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। কালে সেই স্ত্রীলোটির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনবান্ হইয়া চির দুঃখিনী জননীর দুঃখের অন্ত করিয়াছিলেন। এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যেও অনেক গৃহস্থের সময়ে সময়ে সংসারে বিলক্ষণ অপ্রতুল ঘটিয়া থাকে; কিন্তু রাজধানীর লোকের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহারা আর প্রায় ধর্ম্ম পথ রক্ষা করিতে পারে না। প্রতারণা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় গিয়া পুত্র কলত্রদিগকে আরও বিপদ্‌গ্রস্থ করিয়া ফেলে। নীতি বিশারদ কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এক দারিদ্র্য দোষেই লোকের বহু গুণ নষ্ট করিয়া দেয়; কেননা, যাচককে সংসারের লোক তৃণ হইতে লঘু জ্ঞান করে। দরিদ্রগণ যত ক্ষণ হস্ত বিস্তার করিয়া লোকের নিকট যাচ্ঞা না করে, তত ক্ষণ তাহাদিগের সমস্ত মান মর্য্যাদা রক্ষা হয়। মুখে এক বার ‘ভিক্ষাং দেহি’ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই মহাবিজ্ঞ পণ্ডিতকেও লঘু হইয়া পড়িতে হয়। এই জন্যই ভগবান্ বিষ্ণু বলিরাজার যজ্ঞে বামন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন।

এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, কৃতবিদ্য পুরুষেরই প্রায় দারিদ্র্য দশা ঘটিয়া থাকে কেন? তিনি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন যে, যাঁহার বিদ্যারসাস্বাদনে রুচি জন্মে, তিনি ধনকে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন; কেননা, ধন কোনও কালেই মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে সন্তোষ দান করিতে পারে না, বিদ্যাই অনায়াসে সে কার্য্যে সক্ষম হয়। যে সকল দরিদ্র ছাত্র একাহারে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তৎ কালে তাহাদিগের শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া অনুভব হয় না। যে দিন

একটি নিগূঢ় ভাব সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে দিন আর তাহাদের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না।

যাহারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দার পরিগ্রহ-পূর্ব্বক বহু অপত্যের জন্মদাতা হয়, তাহাদিগেরই দারিদ্র্য দশা ঘটে। আপনার উদরের জন্য প্রায় কাহারও মনঃ-পীড়া উপস্থিত হয় না, যেন তেন প্রকারে দিন পাত হইতে পারে; কিন্তু অক্ষম অবস্থায় বিবাহ করিলেই কৃতবিদ্য ব্যক্তিরও শান্তি ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহার উপর আবার অপত্য হইলে, দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। যেমন একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে, তৎ সেবার জন্য ভক্তকে শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হয়; অথচ সে বিগ্রহ দ্বারা প্রতিষ্ঠাকারীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও উপকারই দর্শে না। নির্ধন পুরুষের দার পরি-গ্রহও সেই রূপ বিড়ম্বনার হেতু হইয়া উঠে। বিগ্রহের ন্যায় যদি বিবাহিতা স্ত্রীকে উত্তম রূপে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে পারে, উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী আহার করাইতে পারে, সর্ব্বদা তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে পারে, তবেই দুই এক দিনের জন্য স্ত্রী লইয়া সুখী হয়; নতুবা যত কেন কৃত বিদ্য হউন না, যত কেন শান্ত প্রকৃতির লোক হউন না, যত কেন সদাশয় ও সাধু হউন না, স্ত্রীসেবায় অক্ষম হইলে, তদীয় বাক্য বাণে সর্ব্ব ক্ষণ জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে, মুহূর্ত্ত কালও মনে শান্তি থাকিবে না। একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে যে, গাড়ী, ঘোড়া, উদ্যান, উন্নত অট্টালিকা ও স্ত্রী ঐশ্বর্য্যশালী লোকেরই শোভা পায়, ধন-হীনের পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠে।

অগ্রে ধন সঞ্চয় কর, তাহার পর দার পরিগ্রহ করিও, পুত্র

কামনা করিও। দারিদ্র্যাবস্থায় কেবল শাস্ত্রীয় বচনের উপর নির্ভর করিয়া দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সংসার তরঙ্গে ঝাঁপ দিও না। তাহা হইলে, দুঃখের অবধি থাকিবে না। কেবল এক অবিবেচনার দোষেই এ দেশের লোক দরিদ্রতা নিবন্ধন ঘোরতর মনঃপীড়া ভোগ করিয়া থাকে।

ত্রিতাপ।

সংসারীর পক্ষে যে সকল অসুখের কারণ বর্ত্তমান আছে, তৎ সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। যে তাপ দ্বারা আত্মা কলুষিত হয়, তাহাকেই আধ্যাত্মিক তাপ কহে। যদ্দ্বারা দৈব প্রতিকূল হইয়া সংসারীকে তাপিত করে, তাহাকেই আমরা আধিদৈবিক তাপ কহিয়া থাকি। ভূত সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প এবং বায়ু, অগ্নি ও জল প্রভৃতি হইতে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে আধিভৌতিক তাপ কহেন। এই ত্রিবিধ তাপ নিবারণের পূর্ব্বে ত্রিতাপের বিশিষ্ট কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

যে তাপ দ্বারা আত্মা কলুষিত হয়, তাহার কতকগুলি কারণ আমাদিগের নিজ বুদ্ধির দোষে হইয়া থাকে। ত্রিবিধ তাপের মধ্যে আত্মসম্বন্ধীয় তাপ সমূহ কষ্টদায়ক। ইহাতে চিতানলের ন্যায় সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। যে আত্মা পরিতুষ্ট হইলে, জগৎ তুষ্ট, সেই আত্মার বিকৃতি ঘটিলে, আমাদিগের আর কোনও সুখেরই সম্ভাবনা থাকে না। এক ব্যক্তি রাজাধিরাজ হইয়াও যদি বুদ্ধির দোষে উৎকট পাপগ্রস্ত হয়, তবে পাপ জনিত অনুতাপ কালে উক্ত নরপতির অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃত রাজ্যাধিকার স্বত্বেও এই সংসারকে নরকাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কোথায় গেলে চিত্তের সন্তোষ জন্মিবে, আত্মার স্ফূর্ত্তি হইবে, ও শরীরের গ্লানি নিবৃত্তি হইবে, এই রূপ সুখময় স্থানের অনু-

সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কখনও অকাতরে দান করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিতে যায়, কখনও যাগ যজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা দেখে। তাহাতেও যখন কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না, তখন সৎ সঙ্গে সৎ কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সজ্জনেরা যখন কথার প্রসঙ্গে পাপকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন, তখন সেই ব্যক্তি ভয়ে আকৃষ্ট হইয়া আরও কষ্ট পাইতে থাকে। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া প্রকৃত জ্ঞানবান্ লোককে গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট আপনার সমস্ত আন্তরিক পাপের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকে, তদ্দ্বারা আত্মগ্লানির অনেক উপশম হয়। যখন নিতান্ত সজ্জনের নিকট পাপাত্মারা আপন পাপের কথা বিস্তারে বর্ণন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই সাধুগণ তাহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন না, বরং দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাদিগকে উচিত উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। রামায়ণের দস্যু রত্নাকরের ন্যায় উৎকট পাপী আর ছিল না। আরণ্য পথে কেবল এক খণ্ড বস্ত্রের জন্য অনায়াসে একটি মহাপ্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট করিতে তাহার কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব হইত না। কোনও সময়ে দেবর্ষি নারদ অপর এক জন মহাবিজ্ঞ ঋষিকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই আরণ্য পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। রত্নাকর বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, দুই জন ঋষি তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। রত্নাকর তৎক্ষণাৎ মুদ্গার উত্তোলন করিয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নারদ বলিলেন, তুমি কি সাহসে ব্রহ্মহত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছ? তোমার এরূপ পাপকার্য্য করিবার অভিপ্রায় কি? রত্নাকর হাস্য

করিয়া কহিল, আমি আমার রমণীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হই-য়াছি, তাহার গর্ভে আমার তিন চারিটি পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে। অনেকগুলি পরিবার হইয়া পড়াতে আমি এই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের ভরণ পোষণ করি। এক্ষণে তোমরা নয়ন মুদ্রিত কর, এই মুদ্গরাঘাতে তোমাদিগের জীবনান্ত করিয়া যাহা কিছু পাইব, তদ্দ্বারা আমাদের অদ্যকার আহারাদি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। নারদ পুনর্ব্বার বলিলেন, আমরা যখন তোমার হস্তে পড়িয়াছি, তখন আমাদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের পথে আর কোনও প্রতি-বন্ধক ঘটিবে না; কিন্তু মৃত্যু কালে আমরা তোমাকে একটি অনু-রোধ করিতেছি, যদি সেই অনুরোধটি রক্ষা কর, তাহা হইলে, আমরা তোমার হস্তে মরিতে কিছু মাত্র অসুখ বোধ করিব না। রত্নাকর বলিল, আচ্ছা বল, যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে, অবশ্য শুনিব। নারদ বলিলেন, আমরা যেমন অদ্য তোমার হস্তে মরিলাম, তোমাকেও এক দিন আমাদের ন্যায় মরিতে হইবে কি না? রত্নাকর বলিল, হাঁ, মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া মরিতে হইবে, তাহা ত জানি, তবে দুই চারি দিন অগ্র পশ্চাৎ, এই মাত্র প্রভেদ। নারদ পুনর্ব্বার বলিলেন, মৃত্যুর পর জীবের কি দশা ঘটিয়া থাকে? রত্নাকর বলিল, যে যেরূপ কার্য্য করিবে, তাঁহার সেই রূপ গতি হইবে, এই ত শুনিয়াছি। নারদ বলি-লেন, তুমি যে সকল কার্য্য করিতেছ, ইহা দ্বারা পরকালে তোমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কি না? রত্নাকর প্রত্যুত্তর দিল, আমি একাকী কেন ভুগিব? যাহাদিগের লালন পালনের জন্য দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা আমার

পাপের সম অংশী হইবে। নারদ বলিলেন, ভাল, এই কথা তোমার স্ত্রী পুত্রগণকে এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যদি তাহারা তোমার পাপের সম অংশী হয়, তাহা হইলে, আমরা তোমাকে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বলিব না। রত্নাকর বলিল, তোমারা কি ধূর্ত্ত! আমি বাটীতে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, আর সেই অবসরে তোমরা পলায়ন করিবে। নারদ বলিলেন, না, আমরা কখনই পলায়ন করিব না। যদি কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে লতা পাশে বৃক্ষের সহিত আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও। রত্নাকর বলিল, উত্তম, আমি তোমাদিগের এই সামান্য অভিলাষ পূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া ঋষিদ্বয়কে বৃক্ষে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। ইতি পূর্ব্বে নারদ যে পরকালের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, রত্নাকর তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহার মনোমধ্যে পূর্ব্ব সংস্কার জনিত সামান্য জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে সে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবে আবাসে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যে এই দস্যুবৃত্তি করিয়া তোমার ভরণ পোষণ করিতেছি, এ পাপের উচিত দণ্ড কে ভোগ করিবে? দস্যুপত্নী বলিল, তুমি এই সামান্য কথার মীমাংসা করিতে পারিতেছ না? যে পাপ করে, সেই তাহার ফলভোগী হয়। আমি তোমাকে পাপ দ্বারা উপার্জ্জন করিবার পরামর্শ দিই নাই; যে প্রকারে পার, আমার ভরণ পোষণ করিবে, তোমার সহিত আমার এই মাত্র সম্বন্ধ। পত্নীর এই কথা শ্রবণ মাত্রেই রত্নাকরের মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে পুত্র কন্যাগণকে

জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদিগের লালন পালনের জন্য আমি পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ করিয়াছি। তোমরা যেমন আমার উপার্জ্জনের সমান অংশ ভোগ করিতেছ, সেই রূপ চরমে আমার পাপের সমান অংশ গ্রহন করিবে কি না? ইহাতে দস্যু সন্তানগণ কহিল, না পিতঃ, কেহই কাহারও পাপের ভাগী হয় না। এই কথা শুনিয়া রত্নাকর উচ্চ স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দিব্য জ্ঞান বিকশিত হওয়াতে সে পাপ পুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে লাগিল। পূর্ব্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, তৎ সমুদয় স্মরণ হইল। সে আর ক্ষণ কালও পরিবারের মধ্যে না দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে ঋষিদ্বয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, ও তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করপুটে বলিল, গুরুদেব! আমাকে রক্ষা করুন, আমি পাপ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর পাপের ভার বহন করিতে পারিতেছি না—অসহ্য হইয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে ঋষিদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। নারদ দেখিলেন, রত্না-করের দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক তাপ কাহাকে বলে, সে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে।

রত্নাকর সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র গল্পটি লিখিত হইল, ইহার পরি-শিষ্টাংশে আধ্যাত্মিক তাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ত্রিতাপের মধ্যে উক্ত গল্পটিতে রত্নাকরের মনে আধ্যাত্মিক তাপ ঘটিয়াছিল।

যে সকল মহাত্মারা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, ত্রিবিধ তাপ বর্ত্তমানেও সামান্য কারণে তাঁহারা সে তাপে তাপিত হন না। সংসারীর পক্ষে আত্মা কলুষিত হইবার সামান্য সামান্য

শত শত কারণ আছে। যাঁহারা সংসারী নহেন, তাঁহাদিগের আত্মা কি জন্য সামান্য কারণে আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইবে? জ্ঞানী লোকেরা আপনার আত্মাকে সেই আত্মাময় ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া দিন যামিনী নিমীলিত নয়নে চৈতন্য স্বরূপ পরম বিভুকে ধ্যান করিতেছেন। যদিও তাঁহাদিগের সম্মুখে সংসারের প্রবল তরঙ্গ অজ্ঞ সংসারী লোককে প্রতিক্ষণ আকুল করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু সে তরঙ্গে জ্ঞানবানের কিছু মাত্র আতঙ্ক হয় না। যেহেতু, তাঁহারা সংসারের মহামোহে সুপ্ত নহেন। তাঁহারা অন্তরের সহিত চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখনও হাসিতে-ছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও বা নৃত্য করিতেছেন। রোদন দুই প্রকার,—শোক দুঃখে আত্মা কলুষিত হইলে, নয়ন অশ্রু-পূর্ণ হয়; কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু পাত করিয়া থাকেন। সে রোদনে আত্মা কলুষিত হয় না, বরং স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কতকগুলি লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক তাপকে আকর্ষণ করে। দার পরিগ্রহ করিবার পরই তাহাদিগের মনে একেবারে বিলাস মূর্ত্তিমান্ হইয়া উদয় হয়। কিসে সহধর্ম্মিণীকে একটি সুন্দর গৃহে রাখিব, গৃহটি উত্তম রূপে সজ্জিত করিয়া দিব, কি প্রকারে প্রিয়তমাকে উত্তম উত্তম বস্ত্রা-লঙ্কারে বিভূষিত করিব, ও কি করিলে পত্নী সর্ব্বতোভাবে আমাতে অনুরক্ত হইবেন, এই সকল বিষয়ের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটি-লেই, আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে। যদি কোনও ব্যক্তি সৌভাগ্য বশতঃ একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সেই রমণীর চরিত্রের প্রতি অকারণ সন্দেহ করিয়া সে

ব্যক্তি দিবা রাত্রি মানসিক সন্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে। যদি সেই স্ত্রীলোকটি আপনার সহোদরকে দেখিয়াও হাস্য করে, তাহা হইলে, সেই রমণীর পতির আর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। তাহার স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, তাহাতে নব যৌবনা; এই জন্য সেই অবোধ পুরুষ সর্ব্ব ক্ষণ এই ইচ্ছা করে যে, জগৎ শুদ্ধ লোক অন্ধ হইয়া থাকুক, তাহা হইলে, আর কেহই তাহার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে না। ন্যূনাধিক পঞ্চ বর্ষ অতীত হইল, কলিকাতা নিবাসী কোনও সম্পন্ন তন্তুবায় পুত্র একটি সুরূপা কামিনীর পানি গ্রহণ করে। পতি ও পত্নীর বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিকতা অতি অল্পই ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে সেই যুবক বিদ্যা অভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী থাকাতে সর্ব্বদাই লেখা পড়ার চেষ্টা করিত। বিবাহের পর সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্ব ক্ষণ চক্ষের উপর রাখিতে আরম্ভ করিল। রজনীতে শয়ন গৃহের বাহিরে আসিলে, সন্দিগ্ধ চিত্তে নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আপন স্ত্রীর সদসৎ চরিত্রের পরীক্ষা করিত। কেবল এক স্ত্রী লইয়া উক্ত যুবক একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাটীর বহির্ভাগে আসিত না। সেই তন্তুবায়দের বাটীর পশ্চাতেই কতকগুলা গণিকা বাস করিত। তাহার স্ত্রী এক দিন ছাদের উপর উঠিয়া ঐ সমবয়স্কা বারবিলাসিনীদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, উক্ত যুবা নিভৃতে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল। বেশ্যার সঙ্গে আমার স্ত্রী কথা কহিতেছে, ইহাতে অবশ্যই উহার মনে কোনও দুরভিসন্ধি আছে। তবেই ত আর উহাকে গৃহে রাখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। বোধ হয়, বেশ্যাদিগের গৃহ সজ্জা, বস্ত্রালঙ্কার ও পর পুরুষের সহিত স্বাধীন ভাবে আহার

বিহার প্রভৃতি করিতে দেখিয়া আমার স্ত্রীরও বেশ্যাবৃত্তি অব-লম্বনে নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে, ঐ গণিকা-গণের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে যাইবে কেন ? এই রূপ ভাবনা যুক্ত হইয়া সেই যুবক ভূরি পরিমাণে আধ্যাত্মিক তাপ ভোগ করিতে লাগিল।

আমাদিগের দেশে লোকে পুত্র না জন্মিলে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে। কেননা, শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র ব্যতিরেকে মানবের পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হয় না। এই কুসংস্কারের জন্য এ দেশের অনেক লোক বহু কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার পর, যদি সময়ে সন্তান না হয়, তাহা হইলে, পুত্র কামনায় দেব দেবীর নিকট মনন করিয়া বেড়ায়, যত দিন পুত্র না হয়, তত দিন আর মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। কালে সেই সকল লোকের যদি একটি পুত্র হয়, তাহা হইলে, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া সেই পুত্রের জাতকর্ম্মে, অন্নপ্রাশনে ও কর্ণবেধ প্রভৃতি কার্য্যে আপনার ক্ষমতার অতীত ব্যয় করিয়া থাকে। ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে গেলে, লোকে যে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হইলে, কেবল গৃহিণীকে পরিতুষ্ট করিতে গিয়া এক্ষণকার অনেক লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। কালে সেই ঋণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তখন উত্তমর্ণগণের তাড়না ও তিরস্কারে আত্মা কলুষিত হইতে থাকে। সাধনের ধন পুত্ররত্নকে ক্রোড়ে পাইয়াও আর মনে শান্তি থাকে না, ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া দিন যামিনী চিন্তা সাগরে ডুবিয়া থাকে। এ দিকে আবার এই সকল কষ্টের উপর সেই প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু হইলে, গৃহস্বামীকে

কি রূপ আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইতে হয়, তাহা আমরা সর্ব্ব বিধায় ভাবিয়া উঠিতে পারি না। যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইত, তাহা হইলে, পুত্রের অভাবে পুত্র কামনায় অধৈর্য্য হইয়া মনোদুঃখ ভোগ করিত না, কিম্বা পুত্র বিয়োগেও আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইয়া হাহাকার করিত না।

পুরাণে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা উদ্ধবকে বলিয়া ছিলেন, সখে, গৃহস্থাশ্রমের অপেক্ষা উত্তম আশ্রম আর নাই; কেননা, গৃহস্থেরাই কেবল সকল আশ্রমীয় লোকের সহায়তা করিতে পারে। বিশেষতঃ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবার লইয়া যাঁহারা সংসারাশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা এই মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে নানা কথার প্রসঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু আবার সর্ব্ব শেষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, মনুষ্যের দার পরিগ্রহ করার ন্যায় অপকার্য্য আর কি আছে? দারা হইতে কন্যা পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের লালন পালনের জন্য গৃহীরা সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। কিসে ধন উপার্জ্জন করিব, কিসে পুত্র কলত্রাদিকে সুখী করিব, এই চিন্তাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা হইয়া উঠে। দিন যামিনীর মধ্যে এক বারও ভগবানকে ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। অতএব হে উদ্ধব, আমি তোমাকে স্বরূপ কথা বলিতেছি যে, কেবল পুত্র কলত্রের জন্যই গৃহীরা অসুখী হইয়া থাকে। দারা পুত্র পরিবারই মনুষ্যকে শান্তি সুখ ভোগ করিতে দেয় না। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া উদ্ধব যুগ্ম করে নিবেদন করিলেন, হে যদুকুলতিলক, আপনার কথার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনিই

পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক্ষণে আবার পদে পদে সেই গৃহস্থাশ্রমেরই দোষ দেখাইতেছেন, ইহাতে আমার বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্, আপনি আমার সংশয়োচ্ছেদ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পার নাই, এই জন্যই সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছ। বিষয় রূপ বিষ ভোজন ব্যতিরেকে কি সহসা লোকের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়? তবে বেদব্যাসাত্মজ শুকদেবের ন্যায় বাল্য কাল হইতেও অনেকের মনে বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ যোগী সংসারে অতি বিরল। দেখ, তস্করের অগ্রগণ্য রত্নাকর সদ্গুরুর উপদেশ পাইয়া সংসারের মায়া পাশ ছিন্ন করিয়াছিল, অবশেষে সেই রত্নাকরই ঋষি শ্রেষ্ঠ বাল্মীকি হইয়া সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বামিত্র যৌবনে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে আপন ভুজ বলে ক্ষত্রিয় কুলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মবল ও তপোবলের প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা হয়; সেই জন্যই রাজ্য সুখকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যোগ সাধনে মনোনিবেশ করেন। সখে, তোমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমি একটি উদাহরণ বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর;—

কোনও গৃহস্থের এক মাত্র পুত্রের পিত্ত রোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পিত্ত রোগে নিম্ব সেবন করা শ্রেয়ঃ বোধে চিকিৎসক সেই বালককে নিম্ব সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বালক সহজে তিক্ত রস পান করিতে চাহে না দেখিয়া তাহার পিতা

বলিলেন, তুমি যত্নের সহিত এই তিক্ত রস টুকু পান কর, তাহা হইলে, আমি তোমাকে খাঁড়ের লাড়ু খাইতে দিব, সে অতি উপাদেয় সামগ্রী। বালক সেই খণ্ড লড্ডুকার লালসায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিম্ব রস পান করিল। এ স্থলে উভয়েরই অভি-প্রায় স্বতন্ত্র। নিজ পুত্রকে পিত্ত রোগের হস্ত হইতে নিস্তার করণের মানসে তাহার পিতা খাঁড়ের লাড়ুর প্রলোভন দেখাইয়া নিম্ব রস পান করাইলেন; কিন্তু রোগ হইতে মুক্ত হইব, শুদ্ধ এই অভিপ্রায়েই বালক নিম্ব রস পান করিল না, কেবল একটি উপাদেয় লাড়ু খাইতে পাইব, এই লালসায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালক সেই তীব্র তিক্ত রস পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। শাস্ত্রকারে-রাও মনুজকুলকে গৃহস্থাশ্রমে রত করাইবার জন্যই শাস্ত্রে তদাশ্র-মের প্রশংসা করিয়াছেন। যদি প্রথম হইতেই কেবল এক বৈরা-গ্যের উপর সমস্ত শাস্ত্রকারেরা লেখনী সঞ্চার করিতেন, ও সংসারাশ্রমের পদে পদে দোষ দেখাইতেন, তাহা হইলে, মনুষ্য সমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ঘটিত। তোমরা সংসারাশ্রমে প্রবেশ কর, ইহাতে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে পারিবে। গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট আশ্রম আর নাই, এই রূপ বাক্য দ্বারা সংসার-বাসী মানবমণ্ডলীকে গৃহস্থাশ্রমে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহার পর, যখন সংসারী লোক পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কর্ত্তব্য কার্য্য একেবারে ভুলিয়া যায়, ত্রিতাপে তাপিত হইয়া দিন যামিনী মনোদুঃখে কাল হরণ করে, সেই সময়ে সংসারাশ্রমের অসারত্ব দর্শাইবার জন্য সদ্-গুরুরা যদি আমা দ্বারা যে সকল যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎ সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে, মনুষ্যের

ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে পারিবে। সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনায়াসে যোগ সাধনে অধিকারী হইবে। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ কথা শুনিয়া উদ্ধবের সংশয় ছেদন হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এক আধ্যাত্মিক তাপই সকল তাপের শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থাশ্রমই সেই আধ্যাত্মিক তাপের আশ্রয়। যাঁহারা বাল্য যোগী, সাংসারীক বিষয় কিছু মাত্র অবগত নহেন, তাঁহাদিগেরও আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু গৃহস্থ লোকের ন্যায় তাঁহারা সে তাপে তাপিত হন না। বোধ কর, কোনও নিবিড় বন্য পথের মধ্য স্থলে একটি স্রোতস্বতী নদী আছে। দুই জন ধনবান্ বণিক্ ও সাত জন যোগী সেই স্রোতস্বতীর অপর পারে যাইবার জন্য এক খানি তরণীতে আরোহণ করিলেন। নৌকা খানি নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত হইবা মাত্রই প্রবল তরঙ্গে ভগ্ন হইয়া গেল। দুই জন বণিক্ হা হতোঽস্মি! বলিয়া সেই বেগবতী নদীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। সাত জন সন্ন্যাসীও অকুতোভয়ে স্রোত জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন; কিন্তু সেই দৈব বিপাকে কাহারও মৃত্যু হইল না। সকলেই বহু দূর ভাসিয়া গিয়া যে স্থানে নদী সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের সৈকতময় তীরে উঠিলেন। সাত জন যোগী কিছু ক্ষণ শ্রম শান্তি করিয়া হাহা শব্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে বণিকদ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মহাশয়গণ, আপনারা এই বিপদের সময় কি সুখে হাসিতেছেন? ইহা আমরা কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আমাদিগের ত একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, অদ্য এই দৈব বিপাকে পড়িয়া আমরা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত

হইলাম, বোধ হয়, ইহ জন্মেও তাহার পূরণ করিয়া উঠিতে পারিব না। আমাদিগের পুত্র কলত্রগণের কি হইবে? তাহারা যে দুঃখের বার্ত্তা জানে না। আমরা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম, তাহাতে তাহাদিগকে আর রাজভোগে লালন পালন করিতে পারিব না। বণিকদ্বয়ের কথা শুনিয়া যোগিগণ পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের ন্যায় আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি অলাবু পাত্র ও লৌহ নির্ম্মিত এক একটি চিম্‌টা ছিল, নদীর জলে সন্তরণ করিবার সময় দুই হস্তের দুইটি দ্রব্যই বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; সেই জন্যই আমরা হাস্য করিতেছি। তোমরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ বল। দেখি, আমাদিগের দ্বারা যদি তাহার কিছু উপায় হইতে পারে।

বণিক্‌দ্বয় বলিলেন, আমরা দুই জনেই রত্ন পরীক্ষক বণিক্। দুই জনের হস্তেই বিবিধ মূল্যবান্ রত্ন পরিপূরিত এক একটি কৌটা ছিল। তাহার এক একটি কৌটার মূল্য দশ লক্ষ মুদ্রার ন্যূন নহে। হে মহাভাগগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, অদ্য আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমরা দেশে গিয়া রত্ন ব্যবসায়ী বণিকগণের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইব? এই কথা বলিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার রোদন আরম্ভ করিলেন, ও পুনঃ পুনঃ কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। যোগিগণ কহিলেন, ওহে বণিকদ্বয়, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। যদি আমাদিগের উপদেশ মত কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাদিগের এই উপস্থিত আধিদৈবিক তাপ ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যাইবে, আত্মারও স্ফূর্ত্তি হইবে। বণিকদ্বয় বলিলেন, কি আজ্ঞা

করিতেছেন করুন। যোগিগণের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান্, তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, বণিকদ্বয়, অদ্য তোমরা দুই জন ও আমরা সাত জন এই নয় জন একত্র এক সময়ে একটি দৈব বিপাকে নিপতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের সকলেরই প্রাণান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমরা কেহই প্রাণে বিনষ্ট হই নাই। সকলেই অক্ষত শরীরে এই সৈকতময় পুলীনে উঠিয়া বসিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তোমরা কাঁদিতেছ ও আমরা হাসিতেছি। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তোমাদিগের মনঃপ্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু আমাদিগের সে চিন্তার লেশ মাত্র নাই। এরূপ তারতম্য কেন ঘটিল ? ইহার উত্তর আমিই করিতেছি। তোমরা অদ্য যে দৈব বিপাকে পড়িয়াছিলে, ও বহু কষ্টে এই স্থানে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, সংসার আবর্ত্তন ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। সেই আবর্ত্তনে পড়িয়া অনুক্ষণ দুর্ব্বিষহ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছ ; কিন্তু বিষয় মদে মত্ত হইয়া তাহা কিছুই অনুধাবন করিতে পার না। অদ্য সেই মদের কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া তোমাদের একেবারে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে। এই আধিদৈবিক তাপ হইতে আধ্যাত্মিক তাপ উপস্থিত হইয়াছে। বাটী গমন না করিলে, সে তাপের পরাক্রম জানিতে পারিবে না। যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বাটীতে উপস্থিত হইবে, শ্রবণ মাত্রেই উত্তমর্ণগণ আসিয়া উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিবে, বিলাসী স্ত্রী পুত্রগণের কিয়ৎ পরিমাণে বিলাসের পথ রুদ্ধ হইলেই, আর তাহাদিগের নিকট সুখের প্রত্যাশা থাকিবে না, নিরন্তর বাক্যবাণে জর্জ্জরীভূত হইবে। তাহারা স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়া তোমাদিগের ক্ষত শরীর লব-

শাক্ত করিতে আরম্ভ করিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, এই আধিদৈবিক তাপ হইতে আধ্যাত্মিক তাপ কি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। হয় ত, এই দুই তাপে জর্জ্জরীভূত হইতে হইতেই আধিভৌতিক তাপটিও প্রচ্ছন্ন ভাবে তোমার ভৌতিক দেহে প্রবিষ্ট হইবে। কালে সেও নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ত্রিতাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিবে। সেই জ্বালা অসহ্য হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেও পার, উন্মত্ত হইতেও পার, কিম্বা আত্ম নাশ করিয়া একেবারে সকল জ্বালা হইতে নিস্তার পাইতেও পার। এই জন্য বলিতেছি, যদি আধ্যাত্মিক তাপ হইতে নিস্তার লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে, আর বিষয় বাসনা করিও না, আর সংসারে প্রবেশ করিও না, স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। যদি যোগ সাধন দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণেও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহা হইলে, এই রূপ কয়েক খানা প্রস্তর হারাইয়া আর রোদন করিতে হইবে না। সেই নিষ্প্রয়োজন প্রস্তর কয়েক খানা যাহাকে তোমরা রত্ন বলিয়া থাক, যাহার জন্য তোমরা ইহ জন্মের মত দুঃখের সাগরে পড়িতে যাইতেছ, যাহা হারাইয়া তোমাদিগের হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সংসার শূন্য দেখিতেছ, সেই সকল অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যকে আমরা দুই পদে দলন করিয়া থাকি। সংসারের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন, তাহা আমরা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি, হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়াছি, সে রত্ন কোনও কালেই তস্করে কাড়িয়া লইতে পারিবে না। যত কাল আমরা জীবিত থাকিব, তত কাল আমরা সেই রত্ন ভোগ করিব। সসাগরা ধরাপতিও আমাদিগকে সেই

রত্ন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। ইতি পূর্ব্বে তোমরা আপন মুখেই বলিয়াছ যে, আমরা রত্ন পরীক্ষক; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তোমরা ভস্ম অঙ্গারের পরীক্ষা করিতে পার, প্রকৃত রত্ন কাহাকে বলে, তাহার নাম গন্ধও শ্রবণ কর নাই। আমাদিগের সমভিব্যাহারে আইস, আমরা তোমাদিগকে অমূল্য রত্নের আকর দেখাইয়া দিব। পরিশ্রম করিতে পারিলেই, মনের মানসে রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে। বণিকদ্বয় বলিলেন, মহাশয়গণ, আপনারা যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিতেছেন, ধনলোভী বণিকেরা কি তাহার অধিকারী হইতে পারে? আমরা কেবল এক অর্থের ক্রীতদাস হইয়া আজন্ম কাল এই অসার সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জীবনের অবশিষ্ট কালও সেই উপার্জ্জনের জন্য যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিব; কিন্তু কোনও কালেই মনের মানস পূর্ণ হইবে না। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধুসঙ্গ করিতে পারিলাম না। কেবল এক ধনোপার্জ্জনের জন্য ইহ কাল ও পরকাল হারাইলাম। শুদ্ধ অর্থ লোভেই এক দিন না এক দিন এই মহামূল্য জীবন রত্ন হারাইব; কারণ জলমগ্ন হইয়া মরা বণিকের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। তবে এত দিন যে মরি নাই, ও অদ্য মরিলাম না, ইহাই আশ্চর্য্য। এক্ষণে আপনাদিগকে প্রাণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন যেন উপস্থিত ঘটনার জন্য বণিক সমাজে অপমানিত না হই। যোগিগণের মধ্যে এক জন বলিলেন, ওহে অর্থ লোলুপ বণিকগণ, তোমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, আমরা এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পবিত্র আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করি।

বণিক দ্বয় যোগিগন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে সে

স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগিগণও তথা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া একটি বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট হইলেন, ও তত্ত্ব কথার আন্দোলন করিয়া দিনের অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই যাপন করিলেন। তাহার পর, অনায়াস লভ্য ফল ও জল খাইয়া আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বণিকদ্বয় সমস্ত দিন দুর্গম বন্য পথ পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপন আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আপনাদিগের দৈব বিড়ম্বনার কথা আত্মীয় পরিবারগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া রোদন করিতে বসিলেন। এক এক জন রত্ন বণিকের অদৃষ্টের ফলভোগী নরনারীগণ সেই আশ্রয় দাতার আধিদৈবিক তাপে সকলেরই আধ্যাত্মিক তাপ ঘটিল। এখানে কেবল এক বিষয় বিভবই যে উপরি উক্ত তাপের প্রধানতম কারণ, তাহাতে আর সংশয় নাই।

পূর্ব্বে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, সাত জন যোগী ও দুই জন রত্ন বণিক্ দৈব বিপাকে পড়িয়া কিয়ৎ ক্ষণ সকলেই সমান অংশে কষ্ট ভোগ করিলেন। তাহার পর, সন্তরণ দ্বারা নীর হইতে তীরে উঠিয়া যোগিগণ হাস্য ও রত্ন বণিকদ্বয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আধিদৈবিক তাপে যোগিগণকে তাপিত করিতে পারিল না। তাঁহারা কিয়ৎ ক্ষণ শ্রম শান্তি করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রত্ন বণিকগণ কতকগুলি বহু মূল্যের রত্ন হারাইয়া অগ্রে আধিদৈবিক ও তৎপরে আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপন আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেই রূপ কোনও সমৃদ্ধিশালী নগরে এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ও অপর এক জন বিপুল ধনশালী মহাজন বাস করিতেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত লোকের দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, তদ্দ্বারা সিদ্ধ পক্ব করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারান্তে আপনার কুটীর দ্বারে বসিয়া মনের আনন্দে গান গাইত। তাহার কুটীরের সম্মুখস্থ উন্নত অট্টালিকার উপর বিপুল ধনশালী মহাজন দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উপর উপবিষ্ট হইয়া রজত ময় স্বর্ণখচিত আলবোলায় তাম্রকুটের ধুম পান করিতেন ও চিন্তানলে দগ্ধ হইতেন। তাঁহার চিন্তার কারণ এই যে, হঠাৎ সংবাদ পাইলেন, কয়েক খানি বোঝাই কিস্তী পদ্মা দিয়া কলিকাতায় আসিতেছে। এই কাল বৈশাখীতে যদি ঝড় তুফানে পড়িয়া তরণী কয়েক খানি মারা যায়, তাহা হইলে, যথোচিত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অমুক ইংরাজ বণিককে দুই লক্ষ টাকার তণ্ডুল দেওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট হইতে অদ্যাপি এক কপর্দ্দকও আদায় হয় নাই। যত দিন টাকাগুলি ঘরে না আসিতেছে, তত দিন আমার মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যহ এই রূপ নূতন চিন্তায় তাঁহার মন আকুলিত হওয়াতে, বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়াও তিনি মুহূর্ত্ত কাল সুখানুভব করিতে পারেন না।

কিয়দ্দিবসান্তে ঐ মহাজনের দক্ষিণ চরণের উপর একটি বিস্ফোটক হইল। তাহার জ্বালা যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। এক দিন দুইটি নরম বালিসের উপর দক্ষিণ চরণ রাখিয়া বাতায়নের নিকট উপবিষ্ট আছেন, ও মুহুর্মুহুঃ রাজ-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পল্লীর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যষ্টির উপর ভর দিয়া বহু কষ্টে আপন কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে ধনবান্ মহাজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, আপনার কি হইয়াছে, খঞ্জের

স্থায় চলিতেছেন কেন? ব্রাহ্মণ বলিল, বাবুজি, আর দুঃখের কথা কি কহিব? এই দেখুন, বাম চরণের উপর একটা বিস্ফোটক হইয়াছে। ইহার যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে অস্থির হইতে হই-তেছে; তথাচ, উদরান্নের জন্য ভিক্ষায় যাইতে হইয়াছিল। মহাজন বলিলেন, আমারও দক্ষিণ চরণের উপর একটা বিস্ফো-টক হইয়াছে, তাহাতে বড় কষ্ট পাইতেছি। মহাজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত এই রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় মহাজনের একটি পঞ্চম বর্ষীয়া পৌত্রী ছুটিয়া আসিতে তাঁহার দক্ষিণ চরণের উপর পতিত হইল। মহাজন সেই আঘাতেই একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাঁচা ফোড়ার উপর সাংঘাতিক আঘাত লাগাতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। মহাজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়াতে আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার ও কর্ম্ম-চারিগণ যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ঊর্দ্ধ শ্বাসে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, কেহ ক্ষত স্থানে বাতাস দিতে লাগিল, কেহ মুখে জল সেচন করিতে লাগিল, কেহ বা এক বাটী উষ্ণ দুগ্ধ আনিয়া মুখের কাছে ধরিল। মহাজন যত ক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তত ক্ষণ পরিবারবর্গের রোদন ধ্বনিতে বাটীর অভ্যন্তর প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। সহসা বড় লোকের বাটীতে কি হইল, তাঁহার সটীক সংবাদ জানিবার জন্য পূর্ব্ব কথিত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহার দরজার দিকে অগ্রসর হইবে, আর অমনি হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাহার সেই কাঁচা ফোড়া একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ কিয়ৎ ক্ষণ রাজপথের মধ্যে বসিয়া আপনা আপনি সামলাইয়া লইল। তাহার পর, বহু কষ্টে

কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রুধিরাক্ত ক্ষত স্থান জল দ্বারা বিলক্ষণ ধৌত করিয়া ফেলিল। পরে চূর্ণের সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া সেই ক্ষত স্থানে চাপাইয়া অনলের উত্তাপ দিতে লাগিল। এই রূপ প্রায় এক ঘন্টা কাল আপনি আপনার সেবা শুশ্রূষা করিয়া অবশেষে দগ্ধ বার্ত্তাকু সংযোগে কতকগুলি অন্ন আহার করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

এ দিকে মহাজনকে লইয়া তদীয় বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এক জনের স্থলে দুই জন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঔষধালয় হইতে নানাবিধ ঔষধ আসিল। মহাজন পূর্ব্বাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া ঘন্টায় ঘন্টায় ঔষধ খাইতে লাগিলেন। ক্ষত স্থানের সেবা শুশ্রূষার জন্য এক জন চিকিৎসক নিযুক্ত রহিল। এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নিঃস্ব লোক অপেক্ষা ধনীরাই অধিক পরিমাণে ত্রিতাপে তাপিত হয়। দরিদ্র লোকেরা দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই ধরে না, দিনান্তে শাকান্ন পাইলেই যথেষ্ট বোধ করে; কিন্তু ধনবান্ বিলাসী লোকের যদি দৈব বশতঃ এক দিন এক খানি মলিন বসন পরিধান করিতে হয়, কিম্বা মনের নিতান্ত অন্যায় অভিলাষ পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে, হৃদয় আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইয়া উঠে। ধনী লোকের ধনের জন্য, বিলাসের জন্য ও অসদভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য প্রায়ই ব্যাঘাত ঘটে। সর্ব্বদা অনিয়ম ও অন্যায় কার্য্যে রত থাকাতে শরীরে দুশ্চিকিৎস্য রোগ সমূহ আসিয়া আশ্রয় করে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া বিলাস

সাগরে ভাসিয়া থাকে, তাহারাই এক একটা উৎকট রোগ ভোগ পূর্ব্বক অবশেষে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। সেই সকল উৎকট রোগের ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, তাহাদিগের মন যে রূপ তাপে তাপিত হয়, সামান্য গৃহস্থ লোকের তাহার শতাংশের একাংশ হয় না।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নরদেহ ধারণ করিয়া একেবারে ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে গেলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ মনুষ্যকে সহ্য করিতেই হইবে। এই ত্রিতাপ নিবারণের উপায় শাস্ত্রকারেরা এক মাত্র তত্ত্ব জ্ঞানকেই অবধারিত করিয়াছেন। সংসারত্যাগী হইয়া ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ কর, তাহা হইলে, আর ত্রিতাপে তাপিত হইতে হইবে না; কিন্তু যেমন গৃহস্থাশ্রমে ত্রিতাপের ভয় আছে, সেই রূপ আরও কতকগুলি পরম সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে। গৃহত্যাগী হইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এক্ষণকার কালে কয় জন লোক অতুল ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে? যে সকল যোগী, সন্ন্যাসী, পরমহংস ও দণ্ডাশ্রমী লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব যদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে, স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল সংসারত্যাগী লোক কেহ বা পরান্নে অনায়াসে প্রতিপালিত হইবার জন্য, কেহ বা সংসারের ঘোর অপ্রতুল জন্য, কেহ বা উৎকট পাপের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া, এবং কেহ কেহ বা যথার্থই ত্রিতাপের উগ্র তাপ সহ্য করিতে

না পারিয়া গৃহত্যাগী হইয়া তীর্থস্থানে কিম্বা নির্জ্জন গিরি-গুহায় অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা ঐ সকল কারণে গৃহ-ত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে সুখী নহেন; যেহেতু, ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভগবানের প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনকে রত করিয়া একেবারে সংসারের সমস্ত কামনা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন না। যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, অথচ, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তজ্জন্য সময়ে সময়ে লোকের তিরস্কার অসহ্য বোধে তাহাদিগকে কটু কাটব্য বলে, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে, তাহাদের মাদক দ্রব্য সেবনে ব্যতিক্রম ঘটিলে আর মনঃপীড়ার অবধি থাকে না। অন্য কি কথা, অনেক অনেক মহাপ্রাজ্ঞ তীর্থ স্বামী, যোগী ও সন্ন্যাসীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। এ রূপ লোকের গৃহ ত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, উপরি উক্ত বৈরা-গ্যাশ্রম করিয়া সমাজের কণ্টক হওয়া অপেক্ষা দার পরিগ্রহ কর, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনের ন্যায় ব্যবহার কর। মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কোনও আশ্রমেই সুখের সম্ভাবনা নাই। যদি ষড়্‌রিপুকে আয়ত্তে রাখিতে পার, সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিতে পার, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার, সম্পদে উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য না কর, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের প্রতি অনিয়মিত রূপে অনুরক্ত না হও, যখন যে অব-স্থায় ঈশ্বর রাখিবেন, তখন সেই অবস্থাতেই মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তাহা হইলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও অধিক পরি-মাণে ত্রিতাপে তাপিত হইতে হইবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিও

যে, আমি একাকী নগ্নবেশে রিক্ত হস্তে এই জগতে আসিয়াছি, ও সেই ভাবেই এক দিন এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। অদ্যই হউক বা শত বর্ষ অন্তেই হউক, মরিতেই হইবে। মৃত্যু যখন অবধারিত,—অথচ,কবে মরিব,তাহার সময়ের স্থিরতা নাই, তখন সর্ব্ব ক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করা উচিত। এই সংসার সুখ ও দুঃখে পরিপূর্ণ। কেহ হাসিতেছে, কেহ বা কাঁদিতেছে, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, কেহ বা লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা পরিবারের অন্ন বস্ত্র যোগাইতে অক্ষম হইয়া মনের দুঃখে কাল হরণ করিতেছে, কেহ বা বিপুল সম্পত্তি লইয়া একটি পুত্র বা কন্যার জন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের গুপ্ত ভাব কেহই সম্পূর্ণ রূপে অনুমাবন করিয়া উঠিতে পারেন না। মুখে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু কার্য্য কালে কাহারও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সংসার একেবারে স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ, সকলেই অর্থের দাস,—এ সকল জানিয়া শুনিয়াও যাহারা অসার সংসারকে সার ভাবিয়াছে, বিষয় পদে মত্ত হইয়া সত্য পথ ভুলিয়াছে, আমার আমার করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটা ছুটী করিতেছে, তাহারাই উগ্র তাপ ভোগের যোগ্য পাত্র। যদি অল্পে সন্তুষ্ট হও, অধিকার বিস্তার না কর, পুত্র কলত্রের স্নেহে অন্যায় রূপে মুগ্ধ হইয়া না পড়, ও মনে মনে সর্ব্বদা এই ভাবিয়া রাখ, যেমন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নানা স্থান হইতে কতকগুলি বিহঙ্গম একটি উচ্চ মহীরুহে আসিয়া আশ্রয় করে, প্রত্যূষে দিগ্দিগন্তে উড়িয়া যায়, আত্মীয় বন্ধু লইয়া আমাদিগের সংসার করাও তদনুরূপ। বিবেচনা

করিয়া দেখ, যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন যে জননী দশ মাস দশ দিন উদরে বহন করিয়া বহু কষ্টে প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও চিনিতাম না। কে পিতা, কে ভ্রাতা, কে আত্মীয় বন্ধু তাহার কিছুই অবগত ছিলাম না; কেবল ক্ষুধার সময় খাইতাম, ও জড়পিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিতাম। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হইল। পিতা মাতাকে ও আত্মীয় বন্ধুকে জানিলাম, ভাই ভগিনীর সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। সে সময়ে যদিও আমাদিগের পুত্র কলত্র ছিল না, তথাচ, আত্মীয় বন্ধুর বিয়োগে হৃদয় তাপিত হইত; কিন্তু সে তাপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত না। ক্রীড়া কৌতুকে বিশেষ মনোযোগী থাকাতে বন্ধু বান্ধব বিয়োগ জনিত শোক অতি অল্প কালের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতাম। যৌবন সীমায় আসিয়া দার পরিগ্রহ করিলাম। বিবাহ কালে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তখন এক বারও ভাবি নাই যে, এ দার পরিগ্রহ আনন্দের নহে, সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া দুঃখ ভোগের সূত্রপাত হইল। যাহাকে পূর্ব্বে চিনিতাম না, গুটি কতক মন্ত্রের বন্ধনে অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তিনিই আমার গৃহলক্ষ্মী হইলেন, শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ হইলেন, ও আমার পাপ পুণ্যের সমান অংশী হইয়া দাঁড়াইলেন। যদি বিবাহের পর দিন জননীর ক্রোড়ে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, আমার সঞ্চিত ধনের এক কপর্দ্দকও গর্ভধারিণী পাইবেন না; কিন্তু এক দিনের সম্বন্ধেই পত্নী আমার সমস্ত বিষয় বিভবের উত্তরাধিকারিণী হইয়া বসিবেন। যদি বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত দীর্ঘ কাল সহবাসে কতকগুলি অপত্য জন্মে, তাহা হইলে, ক্রমে ক্রমে জনক জননীর

প্রীতি স্নেহ মমতা শূন্য হই, সেই দারা পুত্রই আপনার বলিয়া বোধ হয়, সহোদরগণকে জ্ঞাতির মধ্যে ধর্ত্তব্য করি, ভগিনী-গণ ত বিবাহের পরই একেবারে পর হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য! জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর বিয়োগ অনা-য়াসে সহ্য করিতে পারি, তাঁহারা লোকান্তরিত হইলে, সংসার শূন্য হইয়াছে, কেহই বলে না; কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পরই লোকে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে, বলিয়া থাকে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পর্য্যায় ক্রমে এক শত বার বিবাহ করিয়া গৃহ পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু জনক জননী লোকান্তরিত হইলে, সে ক্ষতি পূরণ আর কোনও কালেই হয় না। পুনঃ পুনঃ স্ত্রী পুত্র বিয়োগ হইলে, আবার স্ত্রী পুত্র হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে; তথাচ, পিতা মাতার বিয়োগ অপেক্ষা লোকে স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে অধিক তাপে তাপিত হয়। বৃদ্ধ জনক জননী মরিলে, কেহই শয্যা-শায়ী হয় না, বরং সঞ্চিত ধন পাইব বলিয়া অনেক কুপুত্র মনে মনে তাঁহাদিগের মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু যুবতী স্ত্রীর বিয়োগে অনেকের উন্মাদ দশা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। তবেই পূর্ব্বের কথা পুনরায় এ স্থলে উত্থাপন করিতে হইতেছে যে, এক দার পরিগ্রহই আমাদিগের আধ্যাত্মিক তাপ ভোগের প্রধানতম কারণ হইয়া থাকে। স্ত্রী পুত্রকেই সর্ব্বতোভাবে সুখী করিব বলিয়া আমরা নানা পথের পথিক হই, সেই সূত্রেই আধ্যাত্মিক তাপ উপস্থিত হয়। দৈব ও ভৌতিক তাপ হইতে আধ্যাত্মিক তাপ প্রবল হইয়া উঠে। সেই ত্রিতাপের তাপ অসহ্য হইলেই লোকে আত্মনাশ পর্য্যন্ত করিয়া সংসারের সমস্ত দুঃখ হইতে নিস্তার লাভ করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা নগ্নবেশে এই সংসারে একাকী আসিয়াছি, আবার এক দিন একাই যাইতে হইবে। স্ত্রী পুত্র পরিবার বিষয় বিভব কিছুই আমার সমভিব্যাহারে যাইবে না; তথাচ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিষয়, আমার বিভব বলিয়া কি জন্য প্রলাপ দেখি? লক্ষ মুদ্রার বিষয় বিভব হইলে, এক ব্যক্তির স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, ত্রিতাপের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে এড়াইবার সম্ভাবনা আছে। আপনার ও আত্মীয় পরিবারের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা হইলেও যাহার লোভের শান্তি হয় না, পদে পদে তাহারই আধ্যাত্মিক তাপ ঘটিয়া থাকে। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যার আকর স্থান। অদ্যাপি নবদ্বীপে নানা শাস্ত্র বিশারদ কয়েক জন পণ্ডিত অকাতরে বহুসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যা ধন বিতরণ করিতেছেন। নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কাণ্ডে এতদ্দেশীয় লোকেরা যথা সাধ্য দান দিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত ও ছাত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত নবদ্বীপে এক জন অসাধারণ ধী শক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইত, পূর্ব্ব কথিত পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হই-

তেন। এই রূপে কিছু কালের মধ্যে তিনি ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সম্পৎশালী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তৎ কালে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার যে রূপ স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের আয় হইয়াছিল, তদ্দ্বারা পরমানন্দে দিনপাত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন, তাহাতে আর সংশয় ছিল না; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাধনবান্ হইয়াও এক খানি অর্দ্ধ মুদ্রা মূল্যের পিতলের থাল বিদায় আনিবার জন্য পদব্রজে তিন ক্রোশ পথ অবধি গমনাগমন করিতেন। এক দিন সেই পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ হইতে পঞ্চ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক খানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধ সভায় গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক জন শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া উঠিলেন, আপনার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে পুনঃ পুনঃ পথ পর্য্যটন করা কোনও ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে; এই জন্য বলিতেছি, আপনি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া থাকুন, আমি পত্র খানা লইয়া বিদায় আনিতে যাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বাপু হে, তোমাদিগের এখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। যদি স্বয়ং না গিয়া ছাত্র পাঠাইয়া দি, তাহা হইলে, কৃতী কখনই উচ্চ বিদায় দিবেন না। আয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, সংসার করা যায় না; এই জন্যই আমি স্বয়ং যাইতেছি, তোমরা চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আপনাদিগের পাঠাভ্যাস কর।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া ছাত্র মনে মনে ভাবিলেন, যে, ইহার ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছে, শমন ভবনে

আতিথ্য স্বীকারের আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। যথেষ্ট বিভব সত্ত্বেও এই সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ইনি পদব্রজে পঞ্চ ক্রোশ পথ পর্য্যটনে অগ্রসর হইলেন। এই জন্য বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ষড় দর্শনবেত্তা পণ্ডিতেরাও লোভের ক্রীতদাস। লোভ বশতই ইঁহারা বাধ্য হইয়া আধ্যাত্মিক তাপের উগ্র তাপ সহ্য করিয়া থাকেন। ছাত্র এই রূপ চিন্তা করুন, এ দিকে পণ্ডিত মহাশয় আপন কিঙ্করের মস্তকে তল্পী চাপাইয়া শ্রাদ্ধ বাটীতে চলিয়া গেলেন। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সর্ব্ব শরীর দগ্ধ করিয়া দিবা দুই প্রহরের সময় কৃতীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ শান্তির পর, কৃতী তাঁহাকে নগদ পঞ্চ মুদ্রা ও একটি পিতলের কলসী বিদায় দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অপরাহ্নে বাটী আসিতেছেন, এমন সময় কাল মাহাত্ম্যে পথি মধ্যে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল। তিনি প্রাণ ভয়ে পথ পার্শ্বস্থ আম্র কাননের এক খানি ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ঝড় বৃষ্টি বশতঃ পূর্ব্ব হইতে দুই জন দস্যুও সেই কুটীরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সমাগত দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, বিধাতা বড় চমৎকার শিকার মিলাইয়া দিলেন। ক্রমে ঝড় বৃষ্টির কিঞ্চিৎ সমতা হইয়া আসিতেছে অনুমান করিয়া দস্যুদ্বয় ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার কিঙ্করকে সাংঘাতিক আঘাত এবং সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিল। পণ্ডিত মহাশয় দিগম্বর বেশে কিঙ্করের সহিত সেই শূন্য কুটীরে পড়িয়া রহিলেন। সমস্ত রজনী সেই অবস্থায় অবস্থান করিয়া প্রত্যূষে কিঙ্করের সহিত ধীরে ধীরে পথের ধারে আসিয়া বসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে অনেকেই

চিনিত। প্রাতঃকালে কথিত শ্রাদ্ধ বাটী হইতে কয়েক জন কুটুম্ব আপন আপন আবাসাভিমুখে যাইবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের রক্তাক্ত কলেবর ও দিগম্বর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, এ কি হইয়াছে! ভট্টাচার্য্য আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের নিকট বর্ণনা করাতে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আপনাদিগের উত্তরীয় বসন দুই খানি দুই জনকে পরিতে দিলেন, ও পণ্ডিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া নবদ্বীপের সীমানায় আনিয়া দিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে কিঙ্করের সহিত আপন চতুষ্পাঠীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাত্রেরা প্রথমে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, পরে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধ শ্রাদ্ধ বাটীর বিদায় আনিতে গিয়াই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এক কালে ত্রিতাপের ভাজন হইলেন। প্রথম আধিদৈবিক, সেই সঙ্গে প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীভূত হওয়াতে আধিভৌতিক তাপ উপস্থিত হইল। তাহার উপর বিদায়ের কয়েকটি টাকা, পিতলের কলসী এবং তল্পী স্থিত পরিধেয় বস্ত্র, গাড়ু, গামছা ও কোশাকুশী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে, আধ্যাত্মিক তাপের পরিসীমা রহিল না। যদি পণ্ডিত মহাশয় উপযুক্ত ছাত্রের কথা শুনিয়া শ্রাদ্ধ বাড়ীতে বিদায় আনিতে না যাইতেন, তাহা হইলে, এই ত্রিতাপের কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না।

এক লোভই মানবের সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে। আমরা যদি আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, বৃদ্ধ কালে আশার দাস হইয়া আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই,

সৌভাগ্য ক্রমে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলেই ব্যবসায় কার্য্য দ্বারা কি ঋণ দানে সেই অর্থ দ্বিগুণ করিব, এই আশায় সঞ্চিত ধন পর হস্তগত না করি, লক্ষপতি হইয়া কোটিপতি হইবার জন্য শশ-ব্যস্ত না হই, ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সাম্রাজ্য লাভের নিমিত্ত সমস্ত সংসার সুখে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিয়া পুত্র পৌত্রাদিকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে, ত্রিতাপের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। যদি এ রূপ ইচ্ছা কর যে, সংসারে থাকিব, বিষয় কার্য্যাদিও করিব, তজ্জন্য যুদ্ধ বিগ্রহেও প্রবৃত্ত হইব, তাহা হইলে, আপনার মনকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে রাখ। লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেও একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত হইও না, দৈব বশতঃ আবার লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইও না। তখন ভাবিও, সৌভাগ্য বশতঃ আমিই অর্জ্জন করিয়াছিলাম, আবার দুঃসময় উপস্থিত হওয়াতে নষ্ট হইয়া গেল। পুনর্ব্বার দেবতা অনুকূল হইলে, যাহা নষ্ট করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্জ্জন করিলেও করিতে পারি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ও যাহা হইবার তাহা হইবে; তজ্জন্য চিন্তা সাগরে ভাসমান হইয়া মনের শান্তি ভঙ্গ করি কেন? দেহ রক্ষা করিতে পারিলে, আবার ধনের মুখ দেখিতে পারিব। যে ধন মৎ কর্ত্তৃক এক দিনে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া একেবারে শয্যাশায়ী হই কেন? পূর্ব্বে নিঃস্ব ছিলাম, মধ্যে ধনবান্ হই; আবার নিঃস্ব হইয়াছি, "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যান্তরং সুখম্। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥" সংসারের গতিকই এই।

পূর্ব্বে অবিবাহিতাবস্থায় কেবল বিদ্যা অর্জ্জনে রত ছিলাম, বহু কষ্টে কিঞ্চিৎ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া তাহার পর, দার পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। কন্যা পুত্র হইয়াছিল, তাহারা একে একে আসিয়া আমার শূন্য সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাহার পর, একে একে প্রস্থান করিয়া আবার সংসার শূন্য করিয়া দিয়া গেল। পূর্ব্বে আমি একাকী ছিলাম, পুনর্ব্বার আবার একাকী হইয়াছি। যাহারা আমা কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা আমার সম্মুখেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার জন্য কেন আক্ষেপ করি। যদি সংসারে থাকিয়া কি স্ত্রী পুত্র, কি বিষয় বিভব সকল বিষয়েই এই রূপে মায়া শূন্য হইতে পার, তাহা হইলে, আর ত্রিতাপের উগ্র তাপ সহ্য করিতে হইবে না।

আপনাকে আপনি চিনিয়া লও। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অবধারিত কর। যখন যে কার্য্য করিবে, তখন মনে রাখিও যে, ঈশ্বর তৎ সমুদয় দেখিতেছেন। যখন আনন্দে উন্মত্ত হইবে, যখন বর্ষীয়ান্ হইবে, তখন মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া যাইও। ভ্রম বশতঃ মৃত্যুকেও ভুলিও না, আর ঈশ্বরকেও ভুলিও না। যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কোনও গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেল, তজ্জন্য আপনা আপনি অনুতাপ করিও, তাহা হইলে, মন পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এক বার যে কার্য্য করিয়া মনঃপীড়া পাইয়াছ, লোক নিন্দার ভাজন হইয়াছ, সে কার্য্য আর কখনও করিও না। প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্প্রয়োজন বিষয়ের প্রয়াস পাইয়া অনর্থক মনকে কষ্ট দিও না। ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বিহীন হইয়া কার্য্য করিও না। শারীরিক নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া আধি-

ভৌতিক, সতর্ক ও সাবধানতা দ্বারা আধিদৈবিক এবং মন আয়ত্ত দ্বারা আধ্যাত্মিক তাপ অনেক অংশে নিবারিত হইতে পারে।

সুখ দুঃখ আপনার হস্তে।

মনুষ্য প্রকৃতি এক প্রকার নহে। প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র। সাধারণ সুখ কাহাকে বলে, তাহারও স্থিরতা নাইঃ এই জন্যই জগতের লোক এক ভাবে নিরূপিত সুখের অধিকারী হইল না। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, অধুনা লোক সুখের সাধারণ অর্থ কি কি করিয়া রাখিয়াছে, ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা কি সুখের জন্যই বা সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। মনের অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হওয়াই এক্ষণকার লোক পরম সুখ বলিয়া ধর্ত্তব্য করেন। সেই অভিলাষ সিদ্ধ না হইলেই মনোদুঃখের অবধি থাকে না। মনুষ্যের অভিলাষের আদি নাই, অন্ত নাই। যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে সেই রূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যেমন কুক্কুরকে পায়সান্ন ভোজন করিতে দিলে, সে আগ্রহ পূর্ব্বক আহার করে না, পায়সান্নের বিনিময়ে এক খণ্ড মাংস প্রদান করিলে, তাহার আর আনন্দের অবধি থাকে না, সেই মাংস খণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অস্থিগুলা পর্য্যন্ত পরম উপাদেয় জ্ঞানে চর্ব্বণ করিতে থাকে, মনুষ্য প্রকৃতিও সেই রূপ। কোনও কোনও ব্যক্তিকে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা দিয়াছেন, ইন্দ্রালয় তুল্য উন্নত অট্টালিকা দিয়াছেন, সংসারে কিছু মাত্র অপ্রতুল নাই সংসার ধনে

জনে সর্ব্ব বিধায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে; কিন্তু এত সুখ সত্ত্বেও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোনও নীচ কুলোদ্ভবা কুরূপা নারীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্ব ক্ষণ কেবল তাহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। কি সুযোগে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে প্রতারণা দ্বারা ভুলাইয়া তাহার নিকট গমন করিবেন, দিবা দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকেন। সেই চিন্তার সময় যদি রূপবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা আসিয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে, তাঁহার বিরক্তির পরিসীমা থাকে না। এক বার সুযোগ করিয়া আপনার রাজ-প্রাসাদ তুল্য আবাস হইতে বাহির হইতে পারিলেই বোধ করেন যেন অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইলাম, এই বারে সুস্নিগ্ধ স্থানে গিয়া শরীর ও মন জুড়াইতে পারিব। এই রূপ আশার দাস হইয়া উক্ত নারীর পতনোন্মুখ গৃহে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। দুরদৃষ্ট বশতঃ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝটিকার প্রবল তরঙ্গে ভগ্ন গৃহ দুলিতে লাগিল। বৃষ্টির জলে গৃহের অভ্যন্তর ভাসিয়া গেল। তদ্দৃষ্টে কুলটা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, এই জন্যই ত আপনার একটু কুঁড়ে করিতে চাই। দেখ দেখি, বৃষ্টির জলে শয্যা প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ভিজিয়া গেল। রজনীতে কি জলের উপর শয়ন করিব? বাবু অপ্রতিভ হইয়া গৃহের যে অংশ শুষ্ক ছিল, স্বয়ং সেই অংশে শয্যাদি স্তূপাকার করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বহস্তে গৃহের জল সেচন করিয়া গণিকাকে সান্ত্বনা করিলেন। কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! যাঁহার পরিচর্য্যায় বহুসংখ্য কিঙ্কর কিঙ্করী নিযুক্ত আছে, যিনি ভোজন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিলে, দুই পার্শ্বে দুই জন

ভৃত্য জলাধার লইয়া দণ্ডায়মান থাকে, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে, যাঁহার গৃহের সার্সী খড়্খড়ি বন্ধ করিবার জন্য কিঙ্করেরা ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়, যদি উনপঞ্চাশ বায়ু এক কালে প্রবল হইয়া উঠে, তথাচ, যাঁহার সুদৃঢ় উন্নত অট্টালিকা পতনের আশঙ্কা নাই, তিনিই কি না ভগ্ন গৃহে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইতেছেন, ও কুলটার কপট প্রেমের দাস হইয়া স্বহস্তে বৃষ্টির জল সেচন করিয়া সুখানুভব করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সুখ আর কি আছে? বাবুর বাটীর সুখ আর বহির্ভাগের সুখ, এই দুই সুখের মধ্যে কোন্ সুখটি প্রকৃত সুখ বলিয়া ধরিব? কোনও সদাশয় ব্যক্তি, যিনি বাবুকে বিশেষ রূপে জানেন, তিনি যদি হঠাৎ সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বাবুর জল সেচন ও শয্যা উত্তোলন কার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে, 'সুখে থাকিতে ভূতের প্রহার সহ্য করা' ব্যতিরেকে এ রূপ অবস্থাকে আর কি বলিতে পারেন?

নিম্নে দ্বিবিধ স্থলে দুই প্রকার সুখ রহিল। ইহার কোন্ সুখটি অধিকাংশ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, তাহাই দেখিতে হইবে? বোধ কর, সেই ঝড় বৃষ্টির সময় এক জন ত্রিংশ মুদ্রা বেতন ভোগী সামান্য কেরাণী ভিজিতে ভিজিতে বাটী চলিয়াছে। সে ব্যক্তি মনে মনে ভাবিতেছে, পরের দাসত্ব করা অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। দিবা দশ ঘটিকা অবধি পঞ্চ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎকট পরিশ্রম করিয়া বাটী যাইতেছি, দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ পথি মধ্যে বৃষ্টির জলে বস্ত্রাদি সমস্ত আর্দ্র হইয়া গেল। এক্ষণে শীতে সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে। এক বার বাটীতে উপস্থিত হইতে পারিলে, প্রাণ

রক্ষা হয়। শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ হস্ত পদে অনলের উত্তাপ না দিলে, কোনও ক্রমেই শীত নিবারণ হইবে না। আবার, যাঁহারা এই সময়ে উন্নত অট্টালিকার উপর সজ্জিত কক্ষে আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্ঠিত হইয়া একাগ্র চিত্তে মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠ করিতেছেন, তাঁহারাই মর্ত্ত্য লোকে স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। অন্য এক ব্যক্তি সেই তরঙ্গ তুফানের সময় তরী আরোহণে প্রভুর আদেশ অনুসারে নদী পার হইতেছিল। সে দিন দৈব অনুকূল বশতই তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। যদিও সে ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ ভয়ে তরী হইতে লম্ফ দিয়া পড়িবার সময় পদতল খোলা খাপরায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, এবং পরিধেয় বস্ত্র খানিও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্ পুরুষ বলিয়াই কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতে হইতে বহু কষ্টে নদী তীরস্থ এক খানি কুটীরে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। সেই কুটীর অভ্যন্তরে বসিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে উপরি উক্ত কেরাণীর ন্যায় অবিকল চিন্তা করিয়াছিল।

এক্ষণে এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, বাবুর বাটীর সুখই সর্ব্ববাদী সম্মত, ও বহুসংখ্য লোকের প্রার্থনীয়। ঈশ্বরের অনুকম্পায় তিনি সেই অতুল সুখের অধিকারী হইয়াও কেবল কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নরক ভোগ করিতেছেন; কিন্তু তাহাই অভিলষিত সুখ বলিয়া তদুৎপন্ন দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই তাঁহার বোধ হইতেছে না। যদি সেই সময়ে তাঁহাকে কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহার নিজ বাটীতে লইয়া যাইত, ও সেই পতিপ্রাণা ভার্য্যার সহিত একটি সুরম্য সজ্জিত গৃহে আবদ্ধ করিয়া

ফেলিত, তাহা হইলে, তাঁহার মনোদুঃখের অবধি থাকিত না। এই জন্য বলিতেছি যে, কে কোন্ অবস্থাকে সুখ বলিয়া ধরে, তাহা স্থির করা কঠিন।

সংসারের প্রাণী মাত্রেই এক ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। যেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয়ই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই রূপ ভৌতিক মনুষ্য শরীরাভ্যন্তরস্থ মনও কোনও প্রকারে এক ভাবে দীর্ঘ কাল অবস্থান করে না। যে ব্যক্তি বাল্য কালাবধি পরম সুখে লালিত ও পালিত হইয়াছে, সর্ব্বদা উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়া থাকে, সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে; তথাপি, এই রূপে দীর্ঘ কাল সেই এক ভাবে কালযাপন করিয়া তাহার মন একটি পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। এ রূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা অমৃত তুল্য দুগ্ধ পান করিতে নানা প্রকার আব্দার উপস্থিত করে। ধাত্রীরা বহু কষ্টে তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। সেই সময় যদি কোনও নির্ধনের পুত্র রাজপথে দাঁড়াইয়া মুড়ী খাইতে থাকে, তাহা হইলে, সেই ধনী সন্তানেরা ঐ দরিদ্র লোকের সন্তানের ন্যায় মুড়ী খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। কখনও কখনও কিঙ্কর কিঙ্করী দ্বারা উক্ত দ্রব্য ক্রয় করাইয়া উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিয়া থাকে। এ দিকে যে দরিদ্র সন্তানেরা চির কাল মুড়ী চর্ব্বণ করিয়া থাকে, তাহারা ধনী সন্তানদিগের ন্যায় উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে, যেরূপ আনন্দের সহিত ভোজন করিতে আরম্ভ করে, তদ্দৃষ্টে তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য খাওয়াইতে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির ইচ্ছা না জন্মে?

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, এক জন ধনাঢ্য লোক দৈব বিপাকে পড়িয়া কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে রাত্রি কালে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সপরিবারে রজনীতে লেবু ও খুঁড়ের ডাল পোড়া দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া থাকেন। অতিথিকেও সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে দিয়া ব্রাহ্মণ সবিনয়ে বলিলেন, মহাশয়, আমার অপরাধ লইবেন না। দুই বেলা আমাদিগের গ্রামের কোনও ব্যক্তির বাটীতেই রন্ধন কার্য্য হয় না। রজনীতে এই স্থানের সকলেই পান্তা ভাত খাইয়া থাকেন; অতএব রাত্রি কালে উপবাসী না থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন। সেই ধনাঢ্য লোক তৈল লবণ সংযুক্ত খুঁড়ের ডাল পোড়া দিয়া উদর পূরিয়া পান্তা ভাত খাইলেন। আচমনান্তে গৃহস্থকে বলিলেন, মহাশয়, আজ আমার যে রূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন হইল, বোধ হয়, জন্মাবচ্ছিন্নে এ রূপ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন কখনও ভোজন করি নাই। বাটী গিয়া প্রত্যহ রজনীতে এই রূপ অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিব। কথিত ভাগ্যবান্ লোক বাটী আসিয়া পাচককে আদেশ করিলেন যে, গত রজনীতে আমি যে রূপ অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়াছি, অদ্য রজনীতে তাহাই করিয়া দাও। তাহাকে পান্তা ভাত বলিয়া থাকে। নেবু ও খুঁড়ের ডাল পোড়া দিয়া তাহা খাইতে হয়। পাচক বলিল, অদ্য কি প্রকারে পান্তা ভাত হইতে পারে? যাহা বলিলেন, কল্য তৎ সমুদয় আয়োজন করিয়া দিব। পর দিবস রজনীতে তাহাই হইল; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহা আহার করিয়া পূর্ব্ব দিনের মত তৃপ্ত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, এ সকল সামগ্রী সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে যে রূপ সুস্বাদু হইয়াছিল, অদ্য সে রূপ বোধ

হইল না। পাচক বলিল, মহাশয়, দৈবাৎ এক দিন সেই সকল সামগ্রী আহার করিয়াছিলেন বলিয়াই উপাদেয় জ্ঞান হইয়াছিল, অদ্য আর সে রূপ হইবে কেন? ভাল, অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন, সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে যে রূপ তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও উপাদেয় দ্রব্য কল্য রজনীতে ভোজন করাইব। পাচকের কথায় ধনবান্ পরিতুষ্ট হইলেন।

পর দিন বৈকালে পাচক ধনবানের নিকট একটি টাকা চাহিয়া লইয়া কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিল, ও পাক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া যাহা কিছু প্রস্তুত করিতে হয়, তৎসমুদয় করিয়া রাখিল। রজনী অষ্ট ঘটিকার সময় ধনবান্ আহার করিতে চাহিলেন। পাচক একটি শ্বেত প্রস্তরের বড় বাটী তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। ধনবান্ তাহার কিয়দংশ আহার করিয়াই একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, ও বলিলেন, ওহে, তুমি এ অমৃত তুল্য সামগ্রী কোথায় পাইলে? কি জন্যই বা এত কাল এ রূপ ভোজনে আমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে? এখন প্রতি রজনীতেই আমাকে এই সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিও। পাচক বলিল, না মহাশয়, তাহা আমি পারিব না। অদ্য যে দ্রব্য আহার করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন, তাহা উপর্য্যুপরি তিন চারি দিন, খাইলেই আপনার তত দূর ভাল লাগিবে না, ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ, যে যে দ্রব্যের সংযোগে আমি এই উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার নাম শুনিলেই আপনি আর আহার করিতে চাহিবেন না; যেহেতু, আপনি দীর্ঘ কাল বাত রোগে সমূহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। আমি যে যে দ্রব্যের সংযোগে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি,

শ্রবণ করুন,—পক্ক কদলী, দধি, পাতি-লেবু, চিনি ও চিপিটক; বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এ সমুদয়ই বিষ তুল্য। মহাশয়, আপনি প্রত্যহ রজনীতে যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, সে সমুদয় সুসামগ্রীতে প্রস্তুত হয়, ও তৎসমুদয় আহার করিয়া দিন দিন আপনার শরীর সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। এই এক রজনীর মন্দ সামগ্রী ভোজনে আপনার কিছু অপকার হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

বাবু পাচকের অর্থ পরিপূরিত কথা শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। বলিলেন, তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কি রসনার তৃপ্তিকর, কি নয়নের তৃপ্তিকর, কি মনের তৃপ্তিকর সকল বস্তুই আমাদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুখকর নহে; ইহা জানিয়া শুনিয়াও আমাদিগের অখাদ্য ভোজনে কখনও কখনও তৃপ্তি বোধ হইয়া থাকে। যেমন মনুষ্যের মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, তেমনি আমাদিগের রসনাও নিত্য নূতন সামগ্রীর স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। রসনার তৃপ্তি বোধ হইলে, ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না। দীর্ঘ কাল অমৃত তুল্য দুগ্ধ পান করিয়া আমার এক্ষণে সেই দুগ্ধ বিষবৎ জ্ঞান হইয়াছে। ভোজনের সময় দুগ্ধের বাটী দেখিলেই বিরক্ত বোধ হয়। যদি দুগ্ধের বিনিময়ে এক ভাণ্ড দধি খাইতে পাই, তাহা হইলে, রসনা পরিতৃপ্ত হয় সত্য; কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরস্থ রোগ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া উঠিবে। এই জন্য চিকিৎসকের আজ্ঞাবহ হইয়া আমাকে নিতান্ত সুপথ্য সামগ্রীগুলি ইচ্ছার বিপরীতে আহার করিতে হইতেছে। চিকিৎসক বলিয়াছেন, যদি এই রূপ নিয়মে চির কাল চলেন, তাহা হইলে, ঐ উৎকট ব্যাধি আর বল করিতে

পারিবে না। তথাচ, কেবল এক রসনার তৃপ্তির জন্য সময়ে সময়ে আমি সমূহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। যখন কুপথ্য ভোজনে বসি, তখন আর পূর্ব্বের কষ্ট কিছুই মনে থাকে না। আমার ন্যায় সংসারে বহুসংখ্য লোক কেবল নূতন প্রিয় হইয়া অসীম সুখ সত্বেও পদে পদে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কেহ বা দীর্ঘ কাল পুষ্টিকর অথচ উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী আহার করিয়া সে আহারে পরিতৃপ্ত হয় না ; সেই জন্য সুপথ্যের বিনিময়ে কুপথ্য ভোজন আরম্ভ করিয়া কিছু দিন পরিতোষ লাভ করে ; কিন্তু অল্প দিনেই তাহার ফল ভোগ করিবার সময় কি করিয়াছি বলিয়া আক্ষেপ করিতেও ত্রুটি করে না। কেবল এক ভোজন সম্বন্ধে কেন, কি আহার, কি বিলাস, সর্ব্ব বিষয়েই মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করে। সে পরিবর্ত্তন ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে বিষয় বিবেচনা করিয়া লইতে অনেকের ক্ষমতা নাই ; কিন্তু মনে যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, সেই বিষয়ের সংযোগ হইলেই পরম সুখ বোধ হয়, না হইলে, মনঃপীড়ার অবধি থাকে না।

এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মনুজকুলকে পর্য্যায় ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই হইবে। চির কাল এক ভাবে কেহই অতিবাহিত করিতে পারে না। দেখ, শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য আপনাদিগের ভুজ বলে ত্রিজগতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। অন্য কি কথা, দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞ ভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া নিজ বুদ্ধির দোষে অবশেষে পুত্র শোকে, ভ্রাতৃ শোকে ও বন্ধু বান্ধবের শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া কালরূপা কাল-কামিনীর হস্তে নিহত হয়। শুম্ভের এ রূপে মৃত্যু মুখে নিপ-

ভিত হইবার কারণ কি? শুম্ভ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াও সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। যে দিন সুগ্রীব নামক এক জন সৈনিক দৈত্যাধিপতি শুম্ভকে সংবাদ দিল, মহারাজ, আমি হিমালয় শিখরে একটি রমণী-রত্ন দেখিয়া আসলাম। আপনি অন্যান্য সমস্ত ধনেরই অধিকারী হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাদৃশ রমণী-রত্নে অদ্যাপি বঞ্চিত আছেন। এই কথা শুনিয়া শুম্ভ সুগ্রীবকে বলিল, তুমি এক্ষণেই তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। সুগ্রীব বলিল, আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষা করি নাই; কিন্তু সে রমণীর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছে যে, যে আমাকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করিবে, তাহারই গলে বরমাল্য দিব। এই কথা শুনিয়া শুম্ভ হাস্য করিতে করিতে বলিল, কি আশ্চর্য্য কথা, রমণী আমার অধিকারে থাকিয়া দৈত্যগণের সহিত সমর প্রার্থনা করিতেছে! যাও ধূম্রলোচন, তুমি এখনই গমন কর। সেই কামিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া অবিলম্বে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে; দেখিও, যেন কাল বিলম্ব না হয়। দৈত্যপতির আদেশে ধূম্রলোচন সসৈন্যে দেবীর সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্রই তাঁহার একটি মাত্র হুঙ্কারে স্বগণ সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। শুম্ভ ধূম্রলোচনের মৃত্যুর কারণ শুনিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। দৈত্যপতি পর্য্যায় ক্রমে রক্তবীজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পাঠাইল; কিন্তু কেহই সমর ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত না হওয়াতে অবশেষে প্রাণ সম সহোদর নিশুম্ভকে রণ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। যখন নিশুম্ভও কাল-কামিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে সমরশায়ী হইল, তখন শুম্ভ একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রিয় বিয়োগ জনিত

কষ্ট কাহাকে বলে, তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। অবশেষে শোকে, দুঃখে, অপমানে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ সেই কালরূপা কামিনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া নিশুম্ভও গতায়ুঃ হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এক দৈত্যপতি শুম্ভের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, এ সংসারে কেহই সমভাবে চির কাল সুখ ভোগ করিতে পারে না। লোকে সমস্ত সুখ সত্ত্বেও কোন না কোনও সময় কোনও একটা মনোবৃত্তির নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

পাঠকগণ, ইতিহাসাদিতে পাঠ করিয়াছেন, কত শত রাজা ও রাজপুত্র কেবল মাত্র খেয়ালের বশবর্ত্তী ও কামনার দাস হইয়া সমস্ত সুখ সত্ত্বেও বর্ণনাতীত মনোদুঃখ ভোগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকের শারীরিক সুস্থতা, সাংসারিক সচ্ছলতা, প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা প্রভৃতি সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক লোক আপনার মনঃকল্পিত কতকগুলি কামনার বশবর্ত্তী হয়। তাহারা সেই অনর্থক অভিলাষগুলি সম্পন্ন করিতে গিয়া পাপ পথের পথিক হইয়া আপন মনের শান্তি ভঙ্গ করে। অধিকাংশ লোকে সমস্ত সুখ সত্ত্বেও কি জন্য সুখী হয় না, এ প্রস্তাবে তদ্বিষয়ে আর অধিক বাক্য বিন্যাসের প্রয়োজন নাই। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত লোকের মন সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত না হইবে, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা না ধরিবে, মনের কামনা ত্যাগ করিতে না পারিবে, তত দিন তাহাদিগের পদে পদে মনের শান্তি ভঙ্গ হইবার ও মানসিক তাপ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সংসারে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি স্থির ভক্তি রাখিয়া সকল অবস্থা স্থির ভাবে সহ্য

করিতে পারেন; সংসারের তরঙ্গে আকুল না হন; মনকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন; যে যে কার্য্য করিলে, শারীরিক অস্বস্থতা ও মানসিক গ্লানি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সেই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন; শরীর রক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন, তাহার সংযোগ হইলেই, পরিতুষ্ট থাকেন ও কামনার দাস হইয়া নানা পথের পথিক না হন; তিনিই এই সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে শান্তি সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

মনুষ্য বিবেচনার দোষে কষ্ট পায়।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সভ্য সংসারের অনেক মনুষ্য অলীক অভাব বৃদ্ধি দ্বারা মনের শান্তি সুখ ভঙ্গ করিয়া থাকে। সামান্য অবস্থার লোক যদি আপন আপন অবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে, সকল অবস্থাতেই শান্তির সম্ভাবনা আছে। মনুষ্য আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা এক বারও মনে ভাবে না, প্রবৃত্তি প্রবাহে পড়িয়া ভবিষ্যৎকে একেবারে ভুলিয়া যায়। প্রথমে বিলাস হইতেই অহঙ্কার উপস্থিত হয়, ও অহঙ্কারই মনুষ্যকে আপনার অবস্থা ভুলাইয়া দিয়া কুপথগামী করে।

পাঠকগণ, মনে করুন, কোনও নিঃস্ব ব্যক্তির কলিকাতার একটি কার্য্যালয়ে দশ টাকা বেতনের কার্য্য হইল। সে কার্য্যটিতে মাসিক দুই চারি টাকা উপরি আয়েরও সম্ভাবনা আছে; কিন্তু সকল মাসে সমান হইয়া উঠে না। উক্ত ব্যক্তির বাস একটি

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। সে স্থানে চারি পাঁচ জন পরিবার লইয়া সাত আট টাকা মাসিক ব্যয়ে এক প্রকার গুজরাণ চলিতে পারে। পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা পতির নিকট হইতে পূজার সময় যদি এক জোড়া দুই আনার চুড়ি, এক খানি দেড় টাকার শাটী ও এক আনার মাথাঘষা পায়, তবে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী বিবেচনা করিয়া পতি সেবায় নিযুক্ত হয়। অল্পে তাহাদিগের মনস্তুষ্টি হইবার কারণ কি? না, পল্লীগ্রামে ধনবান্ লোক প্রায় নাই। পূজার সময় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেই শাঁখা শাড়ী পরিয়া আমোদ আহ্লাদ করে, ও বহু দিনান্তে পতির আগমনই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হয়। এই সুখের সংসারে কেবল উক্ত 'চাকুরে বাবুর' শরীরে সভ্যতার বীজ প্রবেশ করিয়া সংহ অসুখের আবাস করিয়া তুলিল। 'বাবু' যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া দশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী পাইয়াছিল, ও প্রথম মাসেই একেবারে নগদ দশ টাকা হাতে পায়, তখন মনে মনে এরূপ অনুমান করিয়াছিল যে, ইহার উপর আর পাঁচটি টাকা বৃদ্ধি হইলেই, আমার যথেষ্ট হইবে। পাঁচ টাকায় এখানকার বাসা খরচ নির্ব্বাহ করিব, ও অবশিষ্ট দশটি করিয়া টাকা বাটিতে পাঠাইব; তাহা হইলেই, পরিবারেরা পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিবে, এবং আমারও এখানে বাসা খরচের কোনও কষ্ট হইবে না। দেশস্থ পাঁচ জনের সহিত একত্র থাকিব, পাঁচ পাঁচ পাঁচিশ টাকা হইলে, পাঁচ জনের সুন্দর রূপে বাসা খরচ চলিবেক। প্রথম দুই চারি মাস তাহাই হইল,—অর্থাৎ সেই ব্যক্তি দশ আনার থান পরিধান করিত, ছয় আনার মলমলের

দোছোট করিত, ছয় আনার একটি পিরাণে গাত্র আবরণ করিত, ও ছয় আনার চটী জুতা পাএ দিত। রাস্তায় কাদা হইলে, সেই জুতা কাগজে মুড়িয়া বগলে করিয়া আপিসে যাইত। বাসা খরচ সম্বন্ধে এক বেলা মাছের ঝোল ও ভাত হইত, আর এক বেলা ডাল, চচ্চড়ি ও তেঁতুলের অম্ল দিয়া আহার করিত। বিকালে আপিস হইতে আসিয়া ছোলা ভিজান ও বাতাসা জলযোগ হইত। বাসা খরচের সমস্ত সামগ্রীই নগদ ক্রয় করিত, দেশে বিদেশে কাহারও নিকট একটি পয়সাও ঋণ ছিল না। ক্রমে কলিকাতার সভ্যতা দৃষ্টে তাহার মনে মনে বিলাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আপিসের সহযোগীদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে মনে ভাবিল,—ইহারাও মাসে দশ পনর টাকা উপার্জ্জন করে, আমারও আয় তদনুরূপ; তবে ইহাদিগের পরিচ্ছদ কি প্রকারে এরূপ হয়? মনে এই রূপ কল্পনার উদয় হইবা মাত্রই সহযোগীদিগের সহিত দশ আনার থান পরিয়া বসিতে একটু একটু লজ্জার সঞ্চার হইতে লাগিল; কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এই যে, একটা সূত্র না পাইলে, হঠাৎ পূর্ব্বের চাল পরিত্যাগ করিতে লজ্জিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে উহাকে সহযোগীর মধ্যে দুই এক জন এই ভাবে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল,—'ব্রজ বাবু, তুমি ছয় আনার চটি জুতা পাএ দাও কেন? লাকচাঁদির বাড়ীর সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এক জোড়া জুতো কেন, ছ মাস খুব পোরতে পারে। এই দেখ, কাদার সময় চটি জুতো হাতে করে আনতে হয়; কিন্তু সে জুতো পাএ দিয়ে জল কাদা ভেঙ্গে চলে এস, কিছুতেই কিছু হবে না। তুমি কি ভাব মোটা কাপড় বেশী দিন টেঁকে? এই দেখ, আমি চার খানা কুঠীর ধুতি এই তিন

বৎসর করেচি, একটু দাম লেগেচে বটে; কিন্তু অনেক দিন ধরে ত পর্‌চি। কাপড় চোপড়গুলো একটু ভাল করা চাই হে, তা না হলে, সাহেব শুভরা মানে না, মজুর মনে করে।' এই সকল উত্তেজক বাক্যে ব্রজ বাবুর মন একটু নরম হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল,—'এঁরা যে কথা বল্‌চেন, সকলই সত্য।' ফিরে মাসের মাহিনা পাইয়া তিন টাকা দিয়া এক জোড়া জুতা কিনিয়া পাএ দিল, ভাল জুতা পাএ দেবার কত সুখ তাহা অনুভব করিল। তার ফিরে মাসে শাদা ধুতি ও চাপকান হইল, এবং আপিসে দুই এক পয়সার খাবার খাইতেও শিখিল। ক্রমে বর্ষা কাল উপস্থিত। যে দিন রাস্তায় বড় কাদা হয়, ব্রজ বাবু চাপকান ঝুলাইয়া ও ভাল জুতা পাএ দিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া যাওয়া অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বোধে এক আধ বেলা বক্‌রায় গাড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিল। শরীরকে যত আল্‌গা দাও, তত অলস হইয়া পড়ে। দু পাঁচ দিন গাড়ী চড়িয়া ব্রজ বাবু মনে ভাবিল,—'দূর হোগ্‌গে! বর্ষা দুটো মাস আর হেঁটে আপিস করা হয়ে উঠে না। এ দুটো মাস গাড়ীতেই যাওয়া যাবে, হেঁটে যাওয়াতে চাপ্‌কান নষ্ট হয়, আর জুতোর দফা একেবারে রফা হয়ে যায়। তিন চার টাকা দিয়ে জুতো কিনে কি কাদায় ফেলে নষ্ট কোর্কো? শ্রাবণ ভাদ্র এই দুটো মাসে আট টাকা গাড়ী ভাড়া যাবে, তা কি করা যায়? এ সব না কল্লেও মান সম্ভ্রম থাকে না।'

পূর্ব্বে ব্রজ বাবুকে সপ্তাহে তিন বেলা করিয়া রন্ধন করিতে হইত। এক্ষণে আপিস হইতে আসিয়া একটি ছোট রকমের সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করিতে বসে। সে রঙ্গের সময়

রান্না ঘরে প্রবেশ করিতে উহার কোনও ক্রমেই ইচ্ছা হয় না। দুই এক দিন সেতার বাজান শেষ করিয়া রাঁধিতে যাইত; কাজেই রাত্রি দুই প্রহরের কম আহারাদি হইত না। বাসার পাঁচ জন বক্রাদারের মধ্যে আর এক জন বাবুকেও ব্রজ বাবুর রোগে ধরিয়াছিল। দেখা দেখি, সেও একটি সেতার কিনিয়া আনিল। আপিস হইতে আসিয়া দুই জনে মুখোমুখী হইয়া সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিত। আহা! যে সেতারের মৃদু মধুর ধ্বনি শুনিয়া লোকের পুত্র শোক নিবারণ হয়, সেই সেতা-রের পিড়িং পিড়িং শব্দে ও মধ্যে মধ্যে তার চড়াওনের ঝন্ ঝন্ শব্দে বাসার আর তিন জন লোকে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। ব্রজ বাবু ও তাহার সহযোগী তিন চারিটার সময় আপিসে লুচি কচুরি উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইত, সুতরাং বাসায় আসিয়া আর বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইত না; এই জন্য সেতার বাজান তাহাদের মিষ্ট লাগিত। আর তিন জন লোক সমস্ত দিন আপিসে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বাসায় আসিয়া ছোলা ভিজে ও বাতাসা খাইয়া ক্ষুধার শান্তি না হওয়াতে কাজে কাজেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে রন্ধন শালায় প্রবেশ করিয়া মাছের ঝোল ও ভাত তৈয়ার করিত, ও সাত আটটার মধ্যে আহার করিয়া ক্ষুধানল শীতল করিত। তাহার পর, শয্যায় উপবেশন করিয়া দুই চারিটা মিষ্ট গল্প করিতে ভাল লাগিত। তাহার পর, পান তামাক খাইয়া নয়টা সাড়ে নয়টার মধ্যে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইত; কিন্তু যে দিন ব্রজ বাবুর অথবা তাহার সহযোগীর রন্ধনের পালা পড়িত, সে দিন অন্য তিন জনের আর কষ্টের সীমা থাকিত না। এই রূপে মাসাবধি কষ্ট সহ্য করিয়া এক দিন ঐ তিন জনের

মধ্যে এক জন স্পষ্টবক্তা ব্রজকে বলিলেন,—'দেখ ভাই ব্রজ, আমরা গরিবের ছেলে। আপিসে গাধার খাটুনি খেটে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে বাসায় আসি। ভাই দু খানা বাতাসা আর এক মুটো ছোলা খেয়ে ক্ষুধা ভাঙে না; কাজেই সকাল সকাল এক মুটো রেঁধে বেড়ে খেয়ে শুয়ে পড়ি। সুখে ঘুম টুকু হলেই আমরা ভাবি যে, পৃথিবীর সমস্ত আহ্লাদ আমোদ করা হলো; কিন্তু ভাই, তোমরা দুই ইয়ারে আমাদের বড় কষ্ট দিতে আরম্ভ করেচো। তোমাদের রাধ্‌বার পালার দিন রাত দশটা পর্য্যন্ত সেতার বাজাবে। তার পরে, রাত এক-টার সময় খেয়ে দেয়ে একটু শুতে যাব, তোমারা সে সময়েও দুই ইয়ারে মুখোমুখী কোরে টপ্পা ধোর্ব্বে; তা হলে ত ভাই, আর কাজ চলে না। আমরা যে অবস্থার লোক, সেই অবস্থায়ই থাকা উচিত। বিদেশে চাকুরী কর্ত্তে এসেচি, দু টাকা রোজ-গার করে বাড়ী নিয়ে যাব। যদি কিছু আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে হয়, তা হলে, সেই পূজোর ছুটীতে বাড়ী গিয়ে কোর্ব্বো। এখানে ও সব কল্লে, পাঁচ জন লোকে চেঙ্‌ড়া বল্‌বে। যাদের এঁটের কাপড় তুলে দু বেলা উনুনে কাট ঠেল্‌তে হবে, তার হাতে ভাই, সেতার কেন?'

ভদ্রের এই মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনিয়া ব্রজ বাবু তৎ কালে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। কারণ তৎ কালে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে সভ্যতার আলোক ও বিলাস একেবারে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বিশেষতঃ, সেই লোকটি তাহাকে পুনঃ পুনঃ 'গরিবের ছেলে' বলাতে যার পর নাই অপমান বোধ হইল। ব্রজ বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল,—'আপনি

এ সব না সইতে পারেন, আমরা গিয়ে স্বতন্ত্র বাসা কোচ্চি। সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে একটু আমোদ আহ্লাদ কর্ল্লো, তাতে হানি কি? আপনি এ রসের রসজ্ঞ নন; সেই জন্যেই আমাদের সঙ্গীত আলোচনায় আপনার বিরক্ত বোধ হয়। মহাশয়, সুখ সকল শরীরেই আছে। আপনি বুড় হয়ে আমোদ আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়েচেন বলে আমরাও কি দেব না কি? মহাশয়, সেতার কেবল বড় মানুষদের জন্যে হয় নি, এতে সবারই সমান অধিকার আছে; এ বিদ্যে যে সাধে, তারই হয়।' সেই লোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—'ভাই, তুমি সাধ, তাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই; কিন্তু একটু তফাতে গিয়ে সাধলে ভাল হয়। তোমাদের সাধার জ্বালায় আমরা যে রোজ রাত্রে ঘুমুতে পাবো না, তা হলে তো আর চোলবে না।' ব্রজ বাবু এই বার বৃদ্ধের শ্লেষ বাক্য শুনিয়া একেবারে প্রতিজ্ঞা করিল,—'আমরা কাল সকালেই স্বতন্ত্র বাসা কোরবো।'

রাত্রিতে দুই ইয়ারে চুপি চুপি এই পরামর্শ করিল যে, 'আমাদের এখন তো মাসে দশ টাকা কোরে বাসা খরচ হয়, আর আপিসেও তিন চার টাকার জলপান খাওয়া যায়, একুনে চৌদ্দ পনর টাকা দাঁড়াচ্চে; এই টাকাতেই একটা বামুন ও একটা চাকরাণী রেখে আমাদের অনায়াসে বাসা খরচ চোলতে পারে।' এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া পর দিন প্রাতে লালা বাবুর বাজারের উপর আড়াই টাকা মাসিক ভাড়ায় এক ঘর ভাড়া হইল। পরে সাবেক বাসা হইতে দুইটা আম কাঠের সিন্দুক, দুইটা জুগে মশারি, এক খানা ভাঙ্গা কেওড়া কাঠের তক্তা, এক খানা ছেঁড়া লেপ, দুইটা কাল বালিস, একটি পাতকুয়ার ঘটী,

দুইটি পিতলের গেলাস, দুইটি ভোট পাতর, একটা কেঠো হুঁকা, একটি চূণ মাখা পাণের বাটা, ও কতকগুলা হাঁড়ি, এবং দুইটা ঘেরা টোপ ঢাকা সেতার প্রভৃতি আসবাব নূতন বাসায় আসিয়া পোঁছিল। সে দিন নূতন বাসা গুছাইতে বেলা হইয়া পড়ায়, বন্ধুদ্বয় দই ও চিড়ার ফলার করিয়া আপিসে গমন করিল। বৈকালে বাসায় আসিয়া তিন টাকা মাসিক বেতন ও খাওয়া পরায় এক জন পাচক নিযুক্ত হইল, এবং একটি চাকরাণী ঠিকা মাহিনায় পাচকের সহকারী নিযুক্ত হইল। এই রূপে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বাবুরা মনের আনন্দে বারাণ্ডায় সেতার বাজাইতে বসিল। সেই সময় সম্মুখস্থ বারাণ্ডার উপর দুই তিন জন বেশ্যাও বেশ বিন্যাস করিয়া আপনাদিগের ভাঙ্গা চৌকির উপর উপবিষ্ট হইল।

ব্রজ বাবু ও তাহার বন্ধু শ্যামচাঁদ বাবু সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় যুবতী বেশ্যাদিগকে বসিতে দেখিয়া সেতারের তার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ চড়াইয়া লইল, এবং মস্তক নাড়িয়া বাজাইতে লাগিল। বেশ্যারা বাবুদের প্রতি মধ্যে মধ্যে কটাক্ষপাত করাতে, নব বাবুরা দৃষ্টিবাণে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আর দূরে দৃষ্টি চলে না দেখিয়া বাবুরা সেতার বাজানতে ক্ষান্ত হইয়া সকাল সকাল আহার করিতে গেল। সে দিন নূতন কর্ম্মচারীরা আপন আপন কর্ম্মে বিলক্ষণ তৎপর ছিল। পাচক আসিয়া বলিল,—'বাবু, সমস্ত আহার সামগ্রী প্রস্তুত।' পরিচারিকা তৎ শ্রবণে আহারের স্থান করিয়া দিল। বন্ধুদ্বয় মনের আনন্দে সেই ভোট পাতরে আহার করিল। আহারান্তে বারাণ্ডায় দাঁড়াইবা মাত্র পরিচারিকা হাতে জল ঢালিয়া দিল। বাবুরা

খড়িকা খাইতে না খাইতেই সে অমনি পাণের বাটা হইতে পাণ সাজিয়া রাখিল। বাবুরা আচমনান্তে বিছানায় উপবেশন করিল। পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ তামাকু সাজিয়া হাতে দিল। সেই রাত্রি হইতেই পরিচারিকা বন্ধুদ্বয়কে 'বড় বাবু' ও 'ছোট বাবু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সে রাত্রি এই প্রকারে অতিবাহিত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে 'ছোট বাবু ও বড় বাবু' নিদ্রা ভঙ্গে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরিচারিকা অতি প্রত্যুষেই আসিয়া হাজিরা দিয়াছে। সে এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া বাবুদের হস্তে দিয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দুই ইয়ারে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তামাকু খাইতেছে, ও এক এক বার বেশ্যাদের বারাণ্ডার দিকে চাহিতেছে; কিন্তু তাহাদিগের এক জনকেও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কিছু বিরক্ত হইতে লাগিল। যাহা হউক, এ দিকে বেলা হইল দেখিয়া উভয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিল। বাসায় অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল, পরিচারিকা আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। বাবুরা আহারান্তে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া খড়িকা খাইতেছে, এমন সময় বেশ্যারা দুই এক জন করিয়া দেখা দিল। তাহাদিগকে দেখিয়া বাবুরা অনেক হাঁচিলেন ও কাশিলেন। তৎ শ্রবণে দুই এক জন বেশ্যা তাহাদিগের প্রতি আড় নয়নে চাহিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল। ইহাতে বন্ধুদ্বয় আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিল; কিন্তু বেলা হইয়াছে, আর দাঁড়াইলে চলিবে না বলিয়া অগত্যা ইচ্ছার বিপরীতে তাড়াতাড়ি চাপ্‌কান ঝুলাইয়া আপিসে যাইতে বাধ্য হইল। ব্রজ বাবু ও শ্যাম বাবু এক স্থানে কর্ম্ম করিত না; এই

জন্য আপিসের ছয় ঘণ্টা কাল আর উভয়ের দেখা হইত না। সে দিন ব্রজ ও শ্যামের মনে সেই বেশ্যাদিগের মোহিনী মূর্ত্তি জাগরিত হইতে লাগিল। কাজ কর্ম্মে আর বড় মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না; কিন্তু সেই দিন ব্রজ কিঞ্চিৎ ' উপরি রোজগার ' করিল। টাকা কটা নগদ হাতে আসিতেই মনে করিল,—'কেঠো হুঁকো হাতে কোরে বারাণ্ডায় তামাক খেয়ে বেড়ান ভাল দেখায় না, মেয়ে মানুষগুলি মনে ভাববে কি? আজ যাবার সময় বড়বাজার থেকে একটা বাঁধা হুঁকো তয়ের কোরে নিয়ে যাওয়া যাবে।' ছুটীর পরে লালদিঘীর ধারে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। ব্রজ শ্যামকে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, শুনিয়া শ্যাম তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিল। দুই বন্ধুতে বড়বাজারে হুঁকা বৈঠক কিনিয়া লইয়া বাসায় আসিতেছে, এমন সময় সিঁদুরেপটীর রাস্তায় এক জন দুই খানা কেদারা বেচিতে যাইতেছিল। শ্যাম দর করিয়া সেই দুই খানা চৌকি দুই টাকায় কিনিল। এতদ্ভিন্ন শ্যাম পূর্ব্ব হইতে এক টাকায় দুইটা কাচের গেলাস কিনিয়া ছিল। এই সকল দ্রব্য সামগ্রী মুটের মাথায় দিয়া বাসায় আনিল। বারাণ্ডার দুই দিকে দুই খানা চৌকি পাতা হইল। পরিচারিকা দুই চারি পয়সার জল খাবার ঠোঙ্গায় করিয়া আনিয়া পরিশ্রান্ত বাবুদের হাতে দিল; পরে নূতন কাচের গেলাস করিয়া জল আনিল। বাবুরা খাবার খাওয়া শেষ হইলে, নূতন কাচের গেলাসে জল পান করিবার সময়ে আড় চক্ষে এক বার বারাণ্ডার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, আমাদের এই আধিপত্য বেশ্যারা দেখিতেছে কি না? তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ হইল।

দেখিতে পাইল, এক জন বেশ্যা তাহাদিগের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া চুল আঁচ্ড়াইতেছে। বাবুদের এত কষ্টে আস্বাব আনা সার্থক হইল! পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ নূতন বাধা হুঁকায় তামাকু আনিয়া দিল। তামাকু খাওয়ার পর, দুই জন মুখোমুখী হইয়া নূতন চৌকিতে বসিল, ও মধ্য স্থলে বৈঠকে বাঁধা হুঁকা রহিল। বন্ধুদ্বয় সেতারের আবরণ খুলিয়া গত বাজাইতে আরম্ভ করিল। এ দিকে বেশ্যারাও বেশ বিন্যাস করিয়া আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিল। ইহাতে বাবুদের সৌভাগ্য গর্ব্ব একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সেতার বাজাইতে বাজাইতে এক এক বার 'ওরে, তামাক দিয়ে যা!' বলিয়া হাঁক হাঁকিতেছে, আর বেশ্যাদিগের দিকে চাহিতেছে। উভয়েরই মনে মনে হইতেছে যে,—'আমরা যে উচ্চ দরের চাকরী করি, ইহাদিগের তা বিলক্ষণ বোধ হোয়েছে; কেননা, কাল অবধি ওরা আমাদের প্রতি ক্রমাগতই চেয়ে দেখ্চে। এ বিষয়ে আমাদের একটু ধৈর্য্য ধারণ কোত্তে হবে। ওরাই উপযাচক হোক। আমরা যদি আপনা হতে যাই, তা হলে, বেশী টাকা লাগ্বে, আর ওরা যদি যত্ন করে আমাদের নিয়ে যায়, তা হোলে, আমরা যা দেব, তাতেই রাজী হতে হবে।' বেশ্যাকটারও অবস্থা ভাল নহে, তাহাদেরও নিত্য উপার্জ্জনের উপর ভরসা, একটি পয়সাও সঞ্চিত নাই। সম্মুখে দুই জন 'বাবু' পাইয়া বাড়াবাড়ি হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে বামী নাম্নী এক জন বেশ্যা একটু অন্ধকার হইলে, বাবুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—'ওগো বাবুরা, আজ তোমাদের সেতারের গলা ভেঙে গেছে কেন?' ব্রজ অমনি সহর্ষে বলিল,—'আজ আমাদের সেতার

দই খেয়েছিল।' বামী বলিল,—'ছি বাবু!' তোমাদের সেতারের এমন দুধে গলা! দই খেলে বোসে যায়? ব্রজ বলিল,—'তুমি যে কাণে শুন্‌তে পাও না, তা আজ আমরা টের পেলুম।' বামী বলিল,—'তা না হয় অনুগ্রহ করে গরিবের ঘরে এসে এক দিন শুনিয়ে গেলে হয় না? যদি কাঙাল বলে অশ্রদ্ধা না করেন, না হলে, আজ আমার ঘরে আপনাদের সেতার বাজাবার নেমন্তন্ন রইল।' শ্যাম অপেক্ষা ব্রজ কিছু বেশী রসিক ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার এই উত্তর দিল,—'আমার কত্তে আমার বন্ধুটি সেতার বাজান্ ভাল!' বলিয়া শ্যামকে বলিল,—'ইয়ার কেমন হে, যাবে ত? বন্ধু, মেয়েমানুষের অপমান করা উচিত নয়। ইহা অপেক্ষা উপযাচক আর কাকে বলে? চল, আজ খাওয়া দাওয়া করে এদের হাঠ হদ্দ দেখে আসি। সুযোগ ঘটে রাত্রে থাকা যাবে; তা না হয়, খানিক আমোদ আহ্লাদ কোরে চলে আস্‌বো।' এই রূপ পরামর্শের পর আহারান্তে দুই বন্ধু একত্র হইয়া একটি সেতার লইয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইল। বাবুদিগকে সমাগত দেখিয়া বামী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রীতিমত অভ্যর্থনা করিল। সেই বাটীর তিন জন বেশ্যার মধ্যে এক জনের একটু সুরবোধ ছিল। সে বামীর ঘরে আসিয়া শ্যামকে একটি গত বাজাইতে অনুরোধ করিল। শ্যামের যৎসামান্য বাজান অভ্যাস ছিল। মনে মনে ভাবিল,—'এরা কি আর কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে? আমি যা বাজাব তাতেই আমাকে সেতারী বলে বোধ কোর্‌বে।' সেতারের ধ্বনি আরম্ভ হইল। বেশ্যাটি দুই চারি মিনিট বসিয়া হাস্য করিয়া উঠিয়া গেল। বামীর বাদ্য শুনিবার অভিপ্রায় নহে। সে যে অভিপ্রায়ে

বাবুদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই সুযোগ দেখিতে লাগিল; কিন্তু বাবুদের রিক্ত হস্ত। তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিল, যথা,—'বামচাঁদ বাবু, তোমাকে এক দিন আমাদের বাগানে নিয়ে যাব। কাল মালী বেটাকে বোলে দেব, তোমার বাড়ীতে একটা ডালি দিয়ে যাবে। আর ভাই, খেটে খেটে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোলো! সাহেব বেটা তিন শ টাকা মাইনে দিয়ে যেন মাথা কিনে রেখেচে! আমাদের তো আর ভাই, পেটের ভাতের জন্যে চাকরী করা নয়—সখ কোরে চাক্রি করা। তা এবার সাহেব বেটাকে বোলেচি, যদি পাঁচ শ টাকা কোরে মাইনে দিতে পারে, তবেই থাক্‌বো, তা নইলে, মাস দুই তিনের মধ্যেই চাক্‌রী ছেড়ে দেব। আমারই জমীদারিতে দেড় শ টাকা মাইনে দিয়ে একটা সাহেব রেখেছি। আপনার কাজ কর্ম্ম দেখ্‌লেই আর রক্ষা থাকে না।' এই রূপ নানা কথাবার্ত্তার পর ব্রজ বাবু বলিল,—'তবে ভাই, আজ আসি, ঢের রাত হয়েচে, হয় ত কাল আবার আস্‌চি।' বামীর তখনও বিশ্বাস ছিল যে, 'বাবুরা' যাবার সময় কিছু দিয়ে যাবে; কিন্তু তাহারা যখন রাস্তা পার হইয়া বাসায় প্রবেশ করিল, তখন বামী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল। তাহারা যাইবার পরে অপর এক জন বেশ্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বামচাঁদ দিদি, বাবুরা কি দিয়ে গেল?' বামী আপনার মান রক্ষা করিবার জন্য বলিল,—'আট টাকা দিয়ে গেছে।'

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে, বাবুরা খাইয়া দাইয়া পূর্ব্ব দিনের মত আপিস গেল। আসিবার সময় মেছোবাজার হইতে চার আনা দিয়া গোটা কতক বাতাপি লেবু, পাঁচ আনায় দুটি ছোট

ছোট কাতলা মাছের ছানা, দুই পয়সার ডাঁটা, তার এক পয়সার ঢেঁড়স কিনিয়া ঝুড়ি পূরিয়া 'বামাচাঁদের' বাটীতে একটা উড়ে মুটেকে বাগানের মালী সাজাইয়া পাঠাইয়া দিল। বাবুর বাগান থেকে ডালি আসা 'বামচাঁদের' ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই বলিয়া সেই ডালিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইল। সে মুটেকে চার পয়সা বক্সিস দিয়া বিদায় করিল। তাহার পর, আপন পরিচিত বেশ্যাদিগকে দুই চারিটা লেবু বণ্টন করিতে লাগিল; কিন্তু মাছের বখরা বাটীর বাহির হইল না; কারণ মাত্রায় অতি অল্প। এ দিকে যথা সময়ে ব্রজ বামীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন শ্যাম কিছু অসুস্থ ছিল, এই জন্য যাইতে পারিল না। ব্রজ বামীকে একলা পাইয়া সেই রাত্রে মাখামাখি আলাপ করিয়া ফেলিল। কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া পড়াতে সে রাত্রে আর বাসায় যাওয়া হইল না। ব্রজ ভোরের বেলায় উঠিয়া আসিবার সময় বামীর হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল,— 'আজ রাত্রে আসিয়া তোমার একটা মাইনের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিব।' প্রাতে বাসায় গিয়া ব্রজ শ্যামকে গত রাত্রের সমস্ত কথা বলিল। উভয়ে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বাঁধা হুঁকা হাতে করিয়া বারাণ্ডায় তামাকু খাইতে লাগিল। বামীও মাঝে মাঝে এক এক বার ঝাঁকি দর্শন দিয়া ও মৃদু মৃদু হাসিয়া ব্রজকে সুখের সাগরে ভাসাইতে লাগিল। তাহার পর, নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া উভয়ে আপিসে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ব্রজ বামীর বাটীতে গিয়া এই অবধারিত করিল যে, 'আমি রাত্রি দশটার পরে আসিব ও বার টাকা করিয়া মাহিনা দিব।' বামী তাহাতেই স্বীকৃত হইল। ব্রজর অপেক্ষা শ্যামের একটু লেখা পড়া

বোধ ছিল। যদিও সে মধ্যে মধ্যে ব্রজর সহিত বামীর বাটীতে যাইত; কিন্তু সে রসে রসজ্ঞ হইত না। ব্রজ মহাআমোদ আহ্লাদে বামীকে লইয়া দুই মাস কাটাইল। এই দুই মাসের মধ্যে বামীকে আট টাকা ও একটি ইলিশ মাছ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। পরে বামী গতিক দেখিয়া টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। ব্রজ আজ দেবো কাল দেবো করিয়া আরও পনর দিন কাটাইল। বামী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া বলিল,—'আমাকে আজ টাকা দিতেই হবে; তা না হলে, তোমার বাসায় দশ জনের সুমুখে তাগাদা কর্ব্বো। তোমার যত ক্ষমতা সব টের পেয়েচি।' ঐ সূত্রে ব্রজ বাবুতে ও বামীতে বিলক্ষণ মারামারী হইল। ব্রজবাবু রাগ করিয়া বাসায় চলিয়া গেলে, বামী আপনার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ব্রজকে গালি দিতে লাগিল।

এ দিকে ব্রজর যে ভিতরে ভিতরে প্রায় আড়াই শত টাকা দেনা হইয়া গিয়াছে, আমোদে সে কিছুই টের পায় নাই। বাবুর বাসার নীচে এক খানি মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল। সেই খান হইতে প্রত্যহ দুই ইয়ারের জলযোগের দ্রব্য লওয়া হইত। তাহার পর, বামীর বাটীতে অবিরত দুই আড়াই মাস কাল খাবার লওয়া হইয়াছে, তাহাকে যে টাকা দিতে হইবে, সে সময়ে তাহা এক বারও মনে হয় নাই। মিঠাইওয়ালার এত টাকা হইয়াছে, তাহা শ্যামও জানিত না। সে মাসে মাসে মাহিয়ানা পাইলেই বাসা খরচ সম্বন্ধে কড়ায় গণ্ডায় ব্রজকে বুঝাইয়া দিত। ব্রজ তাহার একটি পয়সা কাহাকেও না দিয়া অপব্যয় করিয়া ফেলিত। এতদ্ভিন্ন আপিসে দু টাকা পাঁচ টাকা করিয়া অনে-

কেরই নিকট ধার করিয়াছিল। বাজারে ফোড়েদের নিকট আলু, পটল, ফল, মূল, মেছুনীর নিকট মাছ, গোয়ালিনীর নিকট দুধ, এবং কাপড়ওয়ালার নিকট কাপড় এই সমস্তই তিন চারি মাস ধারে চলিয়াছে। ব্যাপক কাল বাটীতে এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই। সেথা স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা অগত্যা অন্য উপায় না দেখিয়া হাওলাত বরাত করিয়া গুজরাণ চালাইয়াছে। ব্রজ যে রাত্রে বামীর গালাগালি খাইল, সেই রাত্রি প্রভাতেই মিঠাই-ওয়ালা খাতা লইয়া বাবুর নিকট হিসাব শোধ করিতে আসিল। শ্যাম বাবু মিঠাইয়ের খাতায় ত্রিশ টাকা খরচ দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল। খাতা সম্বন্ধে মিঠাইওয়ালার সহিত ব্রজবাবুর বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময়ে গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল,—'আমার বার তের টাকা পাওনা হইয়াছে, আমাকে টাকা না দিলে, আর দুধ দিতে পারিব না।' ও দিকে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বামী সমস্তই শুনিল, এবং মনে নিশ্চয় অবধারিত করিল,—'এ বেটা জুয়াচোর, আমাকে আর এক পয়সাও দেবে না, তবে আর কেন—মনের খেদ মিটাইয়া গালাগালি দিয়ে লই না, ওর আর মুখ অপেক্ষা কি?' এই রূপ ভাবিয়া বামী আপনার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিল,—'ওগো দোকানি ঠাকুর, বাবুর নামে খরচ লিখে আমাকে এক টাকার জলখাবার দিয়ে যাও। বাবুর কাছে টাকার ভয় নেই, তিনি মায় খোরাকি তিন শ টাকা মাইনে পান। ওগো দোকানি ঠাকুর, বাবুর বাগানের ডালি টালি এক দিনও পাও নি? মরণ আর কি! যত জোচ্চোরের জায়গা কল্‌কেতায়। ওগো গয়লা দিদি, দোর চেপে বোসো, আজ রাত্রেই ঝ্যাংলা মাজুর গুটিয়ে

পালাবে। দুটো সেতার আছে, বেচ্‌লে দু টাকা পাঁচ টাকা হতে পারে।' এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মেছুনী রোজের মাছ দিতে উপস্থিত হইল। সে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—'ও মা! আমিও যে সাত টাকা পাব!' এই কথা বলিয়া মাছের চুব্‌ড়ি হাতে করিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িল। মিঠাইওয়ালা বলিল,—'রামচাঁদ, তোমাকেই এ টাকার কিনারা করে দিতে হবে। আমি বাবুর ঘর চিনি নে, দোর চিনি নে, কেবল তোমার খাতিরেই দিয়েচি।' এই কথা শুনিয়া বামী একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ চীৎকার করিয়া বিদ্রূপ করিতে ও গালি দিতে আরম্ভ করিল। একে প্রকাশ্য পথের উপর, তাহাতে বেশ্যার চীৎকার শুনিয়া অনেক লোক দাঁড়াইতে লাগিল; এই রূপে একটা হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া শ্যাম কিছু ক্ষণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভাবিল, কাহারও কথায় কোনও কথা কহিল না, কেবল আপনাকে অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল। বাবুর গুপ্তলীলা প্রকাশ হইয়া পড়াতে পাচক ও পরিচারিকা বিনীত বচনে শ্যাম বাবুকে বলিতে লাগিল,—'বাবু, আমাদের উপায় হবে কি? আমরা গরিব মানুষ।' তাহাদিগের কাতরোক্তি শুনিয়া শ্যামের কিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল, এবং উন্নত স্বরে ব্রজ বাবুকে বলিল,—'কি হে, এদেরও কি মাইনেগুলো মাসে মাসে ফেলে দাও নি?' ইহা শুনিয়া গোয়ালিনী ও মেছুনী বলিল,—'বাবু, আমরাও এক পয়সা পাই নি।' শুনিয়া শ্যাম বলিল,—'কেমন হে ব্রজ, আমি বাসা খরচ মাস মাস তোমাকে সব চুকিয়ে দিয়েছি? ব্রজ ঘাড় গুঁজিয়া স্বীকার

করিল। পরে শ্যাম বলিল,—'তবে আমি এদের কারু কাছে দেনদার নাই।' ব্রজ বলিল,—'না, এ সমস্ত দেনাই আমার।' শ্যাম বলিল,—'কেমন গো, তোমরা সকলে শুন্‌লে? আমি এখন এ বাসা থেকে অব্যাহতি পেতে পারি?' এই কথা বলিয়া শ্যাম আপনার চাদর লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শ্যাম বন্ধুর ব্যবহারে যার নাই দুঃখিত হইয়া সাবেক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ হঠাৎ শ্যামকে আগত দেখিয়া বলিলেন,—'কি হে, এখন তোমরা কোথায় থাক? এই দুই তিন মাসের মধ্যে কি এক বার দেখা কোত্তেও নেই? তোমাদের ভালর জন্যেই দুটো উপদেশের কথা বলেছিলেম; তার জন্য কি এত দূর কত্তে হয়!' ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্যাম একেবারে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল এবং কহিল,—'মহাশয়, আপনার উপদেশ না শুনিয়া যেমন এ বাসা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত ফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।' তাহার পরে শ্যাম ব্রজ বাবুর সমুদয় কাণ্ড ব্রাহ্মণের নিকট বর্ণনা করিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া উত্তম হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না, বরং ব্রজকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় আছে কি না, শ্যামকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যাম বলিল,—'মহাশয়, আমারা সামান্য লোক, মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করি, ইহাতে কি প্রকারে ব্রজর উপকার করিব?' আমার বোধ হয়, সে দুই তিন শত টাকা দেনা করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে টাকা ভিন্ন আর ব্রজকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। আজি কালির মধ্যে সমস্ত পাওনাদারেরা একেবারে ব্রজর উপর নালিশ করিবে। মিঠাইওয়ালা বলিয়া গেল

যে, সে একেবারে খাড়া শমন করিয়া ব্রজকে গ্রেপ্তার করিবে। পলায়ন ভিন্ন এক্ষণে তাহার আর অন্য উপায় নাই।'

এ দিকে ব্রজ পাওনাদারদিগকে নানা মতে স্তোক দিয়া বিদায় করিল। তাহার পর, ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া স্বদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। বাটীতে গিয়া দেখে, দুর্দ্দশার অবধি নাই। ঘর দুই খানির খড় উড়িয়া গিয়াছে, পরিবারদিগের পরিধেয় বস্ত্র নাই, আহারাদির কষ্টে ছেলেগুলির শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদারেরা তাগাদা করিয়া পরিবারদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কর্ত্তা আজ বাটী আসিবেন, কাল বাটী আসিবেন বলিয়া পরিবারেরা এত দিন তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পর, কর্ত্তা বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া সকল পাওনাদাররাই খাতা বগলে করিয়া আসিতে লাগিল। ব্রজর হাতে এক কড়াও নাই, কিসে নিস্তার লাভ করিবে।

ব্রজ যে দেশে বিদেশে এই রূপ অপমানিত হইতে লাগিল, এই অপমানিত হইবার বীজ কোথায়? তাহার অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করাই এই সমস্ত শান্তি ভঙ্গের মূল কারণ। সে যদি আপনার সাবেক চাল পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে, এই সামান্য উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারিত। বিলাস পরিপূরিত নগরে আসিয়া বাস করিতে হইলে, কেবল নিম্ন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, বিপদে পড়িয়া কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলেই মস্তক ঘুরিয়া যাইবে, বিলাস মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে, ও বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইয়া দিবে। বিলাস যদি এক বার অশিক্ষিত

মনকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, আর রক্ষা নাই। ব্রজ যদি তিন টাকার জুতা কিনিতে কাল বিলম্ব করিত, তাহা হইলে, তিন চারি মাসের মধ্যে তাহাকে এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইতে না। যদি বেশ্যাদিগের বারিকের নিকট না আসিয়া কোনও গৃহস্থ পল্লীতে বাস করিত, তাহা হইলে, তাহাকে বেশ্যার প্রলোভনে পড়িয়া বেশ্যা কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে হইত না। যদি বেশ্যার নিকট আপনাকে ধনবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষ না করিত, তাহা হইলে, বাঁধা হুঁকা, চৌকি ও প্রত্যহ ধৌত বস্ত্রে এবং মিঠাইওলার দোকানে উঠ্না লইবার প্রয়োজন হইত না। যদি সেতার হস্তে না করিত, তাহা হইলে, তাহাকে সাবেক বাসা পরিত্যাগ করিতে হইত না। কেবল সেতারের অনুরোধেই তাহার রন্ধন শালা ব্যাঘ্রের ন্যায় বোধ হইল, হিতেচ্ছু ব্রাহ্মণের সহিত কলহের কারণ হইল, বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সোপান হইল। সেই সেতার এবং প্রাণের প্রতিমা বামীকে ফেলিয়া যখন ব্রজ পলায়ন করিল, তখন ঐ দুই প্রিয় বস্তুকে এক বার মনে করিবারও অবসর হইল না। যখন সেতার ও বামী ব্রজ বাবুকে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছিল, তখন যদি তাহার কোনও বিচক্ষণ বন্ধু বামীর বাটীতে যাইতে নিষেধ করিতেন, সেতার বিক্রয় করিয়া বাটীতে খরচ পাঠাইতে বলিতেন, তাহা হইলে, কি ব্রজ তাহার বন্ধুর উপদেশ সেই মত্ততার সময় গ্রহণ করিত? কখনই করিত না। যখন ধন গেল, মান গেল, অপমানের এক শেষ হইল, তখন ব্রজ আপনা আপনি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। লোকে যে বিলাসী হইয়া আপন বুদ্ধিতে কষ্ট পায়, ও মনের শান্তি ভঙ্গ করে, ব্রজর আখ্যায়িকাই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

সংসার তরঙ্গ।

সংসার শব্দের প্রকৃতার্থ অদ্যাপি স্থির হয় নাই। ইহার আদি নাই অন্ত নাই। কেহ কেহ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া দিনপাত করাকে সংসার কহিয়া থাকেন। কেহ বা বিবাহের পরই সংসারী হইলেন, পূর্ব্বে সংসারী ছিলেন না, এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরা এই সংসার লইয়া কত কথারই আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, এ সংসারের সমস্তই মায়াময়, ইহাতে কিছুরই সার নাই। কেহ বা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাকে অমূলক স্বপ্নের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন আমরা স্বপ্নে কখনও বা সুখ কখনও বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, নিদ্রা ভঙ্গের পর সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হইলে, কখনও বা হাস্য করিয়া থাকি, কখনও বা ভয়ে বিহ্বল হই। স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করাও তেমনি একটি অলীক স্বপ্নের ন্যায়। মৃত্যুর পর কে কোথায় থাকিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। আমিই বা কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছি? কেনই বা এই সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি? সুখ ভোগ করারই বা ফল কি? দুঃখ ভোগেই বা কষ্ট কি? মরিতেই বা ভয় কি? অদ্যাপি ইহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই, কোনও কালে যে হইবে, তাহারও আশা করা যায় না। কেহ কেহ এই সংসারকে রূপকে বর্ণনা করিয়া সংসারবাসী জনগণকে ঘোরতর ভ্রম প্রমাদে নিপতিত করিয়াছেন। তাঁহারা এই সংসা-

রকে একটি প্রকাণ্ড নদীর স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই ভব নদী মকর কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর হিংস্র জল জন্তুতে পরিপূর্ণ। এই নদীতে সর্ব্ব ক্ষণ তরঙ্গ তুফান হইতেছে। এই নদীর অপর পারে সর্ব্ব সুখপ্রদ একটি পরম রমণীয় স্থান আছে, কোনও সুযোগে সেই স্থানে যাইতে পারিলে, শান্তি সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়; কিন্তু এই ভয়ানক নদী পার হইবার উপযুক্ত তরণী নাই এবং কাণ্ডারীও নাই। কেবল ভক্তিমান্ লোকেরাই ভগবানের পাদপদ্মকে তরণী করিয়া ভব-নদীর অপর পারে যাইতে পারে; এতদ্ভিন্ন ভব নদীর পারে যাইবার আর উপায়ান্তর নাই। এই রূপক বর্ণনার নানা অর্থ আছে। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি সেই ভাবেই আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া সংসারবাসী জনগণকে প্রকৃত ভাবে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শাস্ত্রকারেরা যে সংসারকে স্বপ্নের ন্যায় অমূলক ও ভয়ানক নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ সমস্তই কি অলীক কথা? না, ইহাতে কিছু মাত্র সার আছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগের সেই সকল রূপক বর্ণনা অতি চমৎকার এবং ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গত। এ সংসার মায়াময়, এ কথার প্রতিবাদ কে করিবে? মায়া যেমন আমাদিগকে একটা নিতান্ত অলীক পদার্থের উপর আকৃষ্ট করিয়া দেয়, এ সংসারও তদনুরূপ। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বিশ্বশাসক রাজার উপাখ্যানটি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

কোনও সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারত ভূমে বিশ্বশাসক নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি আপন

ভুজ বলে সমস্ত ভূপালগণকে অধীনে আনিয়া দীর্ঘ কাল এই ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার একটি পুত্র হয়। রাজা শেষ দশায় পুত্র-রত্ন পাইয়া সমস্ত রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং সর্ব্ব ক্ষণ রাজা ও রাজ্ঞী সেই পুত্রের লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলেন। দিনান্তে এক বার ঈশ্বরারাধনা করা দূরে থাকুক, নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করিতেও কোনও কোনও দিন বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পুত্রটি ক্রমে ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। পিতা মাতার অধিক যত্নে রাজকুমারের শরীরের লাবণ্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু রূপের সমতুল্য গুণ হয় নাই। রাজা সেই পুত্র লইয়া মনের আনন্দে কাল হরণ করিতেছেন, এমন সময় দৈব প্রতিকূল বশতঃ সর্পাঘাতে সেই পুত্র গতায়ু হইল। রাজা এবং রাজ্ঞী পুত্র শোকে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। রাজার এক জন বহুদর্শী বিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজ্যের কুশল কামনার জন্য এক দিন রাজ সমীপে গিয়া বলিলেন, মহারাজ, যমপীড়ন যজ্ঞ আরম্ভ করুন, তাহা হইলে, মৃত পুত্র পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যজ্ঞ সম্বন্ধে মন্ত্রীর সহিত রাজার অনেক কথাবার্ত্তা হইল, এ স্থলে সে সকল বিস্তারে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ, মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজা কয়েক জন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া শাস্ত্র সম্মত যমপীড়ন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণ যখন পর্য্যায় ক্রমে যমরাজকে লক্ষ্য করিয়া অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত ঢেঁকিতে পাড় দিতে লাগিলেন, তখন সেই আঘাত প্রেতপতি অসহ্য বোধ করিয়া চিত্রগুপ্তকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি

বিশ্বাসক রাজার যমপীড়ন যজ্ঞের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তৎ শ্রবণে যমরাজ অগত্যা অন্য উপায় না দেখিয়া কিঙ্করগণকে কহিলেন, রাজার মৃত পুত্র কোথায় আছে, সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর। যম কিঙ্করেরা একটি মৎস্যরঙ্গ পক্ষী যমের নিকট উপস্থিত করিল। তদ্দৃষ্টে ধর্ম্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওরে কিঙ্করগণ, তোরাও এই বিপদের সময় আমার সহিত পরিহাস করিবি? রাজপুত্রকে না আনিয়া এই পক্ষীকে এখানে উপস্থিত করিলি কেন? শুনিয়া পক্ষী কহিল, ধর্ম্মরাজ, আমিই সেই রাজপুত্র। রাজাকে উচিত শাস্তি দিবার জন্যই পুত্র রূপে তদীয় ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই রাজার নিকট চলুন, রাজার সম্মুখেই আমি আপন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিব। প্রেতপতি তাহাই করিলেন। তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন, কি জন্য অকারণ আমাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? এই আপনার পুত্র গ্রহণ করুন। পক্ষী সেই সময়ে রাজপুত্রের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, অহে অজ্ঞানান্ধ রাজন্, তুমি কাহার শোকে অধৈর্য্য হইয়া যমপীড়ন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ? আমি তোমার পুত্র নহি, পরম শত্রু। তোমার কি স্মরণ হয়, তুমি এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া বিপিন মধ্যস্থিত একটি সরোবর তীরে দাঁড়াইয়াছিলে? সেই সময়ে আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া বহু কষ্টে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া আহার করিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি শরসন্ধানে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিলে, মুখের গ্রাস খাইতে দিলে না? সেই আক্রোশে আমি তোমার ঔরসে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ

করিয়া বৈরনির্যাতন করিয়াছি। এই দেখ, আমিই সেই পক্ষী কি না? এই কথা বলিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ মৎস্যরঙ্গ পক্ষী হইয়া প্রেতপুরে উড়িয়া গেল।

তৎপরে যমরাজ নরপতিকে কহিলেন, হে মহাবাহু, পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া আপনি অকারণ পর পীড়নে রত হইয়াছেন। কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা? এ মায়াময় সংসারে সকলই অনিত্য। যত দিন মনুষ্যের মায়া ভ্রম দুর না হয়, তত দিন আমার পুত্র, আমার ধন, আমার রাজ্য, এই রূপে আমার আমার করিয়া পরমায়ু ক্ষয় করে; সে যে প্রতি দিন, প্রতি দণ্ডে ও প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইতেছে, ইহা এক বারও ভাবিয়া দেখে না। অতএব রাজন্, আমি আপনাকে সার কথা কহিতেছি এই যে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র শোকে কাতর হইয়া মনের শান্তি ভঙ্গ করিবেন না। মৃত্যুকাল প্রায় আগত বিবেচনা করিয়া তত্ত্ব জ্ঞানে মনোনিবেশ করুন। যদি এখনও আপনার চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে, আপনাকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রেতপুরে গিয়া দুর্ব্বিষহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দেখিলেন এবং শুনিলেন, কে আপনার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই রূপ সংসারের সমস্ত বিষয়ই জানিবেন। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা কাহাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন না; নৈসর্গিক কোনও বস্তুতে মায়া রাখেন না; এই জন্যই শোক দুঃখ তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। আপনি ভুজ বলে এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, আপনার রাজ্য লোভে এবং ধন লোভে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, বলদর্পক অনেক রাজার সর্ব্বস্ব

হরণ করিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মৃত্যুর পর এই প্রকাণ্ড রাজ্য কাহার হইবে ? এই জন্য বলিতেছি, আপনার অতুল বিভব মনের মানসে সৎকার্য্যে ও সৎপাত্রে দুই হস্তে বিতরণ করুন। যে সকল নরপতিকে রাজ্য-চ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার আপন আপন রাজ্যে স্থাপিত করুন। আপনার এক লোভ রিপু চরিতার্থের জন্য যে সকল সৈন্য সামন্ত সমরশায়ী হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দিন, তাহা হইলেই ইহ কাল ও পরকালে সর্ব্ব দোষ হইতে নিস্তার লাভ করিবেন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আপনিও যমপীড়ন যজ্ঞে ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করুন। এই কথা বলিয়া যমরাজ অন্তর্হিত হইলেন। রাজারও ভ্রমান্ধকার দূর হইয়া দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি এই সংসারকে নিতান্ত অসার জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে মনোনিবেশ করিলেন।

উপরি উক্ত উদাহরণে অনেক অলীক কথার উল্লেখ হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের যে কোনও অংশ সঙ্কলন করা হইয়া থাকে, প্রায়ই তাহা অস্বাভাবিক হয় ; কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক নিগূঢ় ভাব আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যমপীড়ন যজ্ঞের প্রভাবে যমরাজ স্বয়ং মৃত রাজপুত্র সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজপুত্রের মুক্তাত্মা মৎস্যরঙ্গ পক্ষী হইয়া রাজার পূর্ব্ব অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, এই সকল অলীক কথা এক্ষণকার সভ্য সংসারের সুবিদ্বান্ লোক কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না ; কিন্তু পুরা কালের পণ্ডিতগণ যখন এই সকল

উপন্যাস লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তখন এতৎ সম্বন্ধে অবশ্যই তাঁহাদিগের কোনও নিগূঢ় অভিপ্রায় থাকিবে।

সংসারের সমস্ত কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে, তাহার একটিরও বিশেষ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সংসারে অকাল মৃত্যু হয় কেন? কেহ বা বাল্য কালাবধি বহু কষ্টে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আজন্ম কাল তাঁহার দৈন্য দশা ঘুচিল না, চির দিন হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ধনীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমিতে হইল। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জন মূর্খতম একটি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেখিতে দেখিতে মহাধনবান্ হইয়া উঠিল। কেহ বা লক্ষ মুদ্রা মূল ধন লইয়া ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করিল; কিন্তু ব্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জন হওয়া দূরে থাকুক, যে সঞ্চিতার্থ লইয়া বাণিজ্য করিতে বসিয়াছিল, কার্য্য গতিকে সেই মূল ধন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গেল। কাহারও বা অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইল না। কেহ বা সামান্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল আপন ক্ষমতায় অতি অল্প কালের মধ্যে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইল। কেহ বা বিপুল ধন পাইয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিল না; অবশেষে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। সংসারে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার কারণ কি? এক্ষণকার তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরাও ইহার বিশেষ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকে এতৎ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দর্শাইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল যুক্তি সর্ব্বতোভাবে আমাদের মনঃপূত হয় না।

এতদ্দেশে শুভঙ্কর নামে এক জন গণিতশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত

জন্মিয়াছিলেন। অদ্যাপি পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নমস্কার করিয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্মাসুসূক্ষ্ম রূপে অঙ্ক মিলাইবার জন্য এক কড়া কড়িকে তিন ক্রান্তিতে, চারি কাকে, নব দন্তীতে, আশী তিলে ও বার শত আশী বহরে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। বার শত আশী বহর চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে, নব দন্তী কাহাকে বলে, তাহাও আমরা জানি না; তথাচ, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অঙ্ক কষিবার সময় ছাত্রগণ শুভঙ্করের সেই সকল প্রচলিত নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। সেই রূপ এতদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা সংসারের সমস্ত গোলযোগ সীমাংসা করিবার জন্য অদৃষ্ট, পরকাল ও পূর্ব্ব জন্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া যান। এক পিতার দুই পুত্র, এক জন নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল, এক জন কিছুই শিখিতে পারিল না কেন? এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, সেই সকল পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন,—

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।"

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ এ জন্মে এক পুত্র অতি অল্প কালেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিল; অন্য পুত্রের পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ছিল না বলিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। এক ব্যক্তি বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন, অথচ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া নানা সুখ ভোগ করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তি বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। এরূপ প্রশ্নে আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়েরা মীমাংসা করেন যে, পূর্ব্ব জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, সে এ জন্মে তাহার সেই রূপ

ফল ভোগ করিবে; স্বয়ং বিধাতাও সে ফল ভোগের অন্যথা করিতে পারিবেন না। যদি আমরা পূর্ব্ব জন্ম, পরকাল ও অদৃষ্টের ফলাফলের কথা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে, আমরা সংসারের সে সকল গোলযোগ সর্ব্ব ক্ষণ ঈক্ষণ করি, তাহা আপনা আপনিই মীমাংসা করিয়া লওয়া যায়; কিন্তু সকল সময়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের এরূপ মীমাংসা সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা যখন অদৃষ্ট মানিয়া অনেক বিষয়ের মীমাংসা করেন, তখন এক্ষণকার তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এরূপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, অদৃষ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, বিধাতাও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না; তবে যাগ যজ্ঞ দ্বারা আমাদিগের আপৎ শান্তি করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেব দেবীর পূজা করিয়া ধন যাজ্ঞা, যশ যাজ্ঞা এবং পুত্র যাজ্ঞা করাও বাতুলের কার্য্য। আমি পূর্ব্ব জন্মে যে রূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, ও আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, এ জন্মে সেই রূপ ফল ভোগ করিব, দেব দেবী দ্বারা তাহার কিছুরই অন্যথা হইবে না; তবে আমরা কোনও দৈব বিপাকে পড়িয়া স্বস্ত্যয়ন দ্বারা সেই আপৎ শান্তির চেষ্টা করি কেন? এ স্থলে পরকাল দেখাইলে চলিবে না,—অর্থাৎ এ জন্মে দেব দেবীর পূজা করিয়া ধন পুত্র কামনা করিয়া রাখ, পর জন্মে তাহার ফলভোগী হইবে। এ জন্মে হাইকোর্টে একটি তুমুল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার শুভ ফল কামনায় আমি দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে ব্রতী করিলাম, সে স্বস্ত্যয়নের ফল কি পর জন্মে পাইব? না, এ কথা পণ্ডিত মহাশয়েরা কখনই বলিতে পারিবেন না; যেহেতু, কোনও ধনবান্ উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত

হইলে, নানা স্থানের নানা দেবালয়ে স্বস্ত্যয়ন কার্য্য আরম্ভ হয়, সে স্বস্ত্যয়নের ফল তাঁহারা ইহ জন্মে পাইবার আশা করেন; যদি তাহার ফল পর জন্মে হয়, তাহা হইলে, রুগ্ন দশায় দেব দেবীর আরাধনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে কোনও কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলেন যে, পূর্ব্ব জন্মের ফলাফল ভোগ এই জন্মে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ আমরা সে ফলভোগে বঞ্চিত হই; এই জন্য সেই সকল গ্রহ শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়নাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ কথাও নিতান্ত অর্থ বিহীন। যখন পূর্ব্ব জন্মের ফলাফলের উপর স্বয়ং বিধাতারও হস্ত ক্ষেপের ক্ষমতা নাই, তখন গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ যদি আমরা সে ফলে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে, পর জন্মের সুখের জন্য এ জন্মে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ব্রত করিয়া রাখাও নিষ্প্রয়োজন। কারণ আমরা আগামী জন্মে কোন্ কুলে কোন্ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; তবেই পর জন্মে সুখ ভোগের প্রত্যাশায় এ জন্মের সমস্ত উপস্থিত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর ব্রতাদি করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। এ দেশের শাস্ত্রকারেরা যে সকল যুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও স্থলেই সুন্দর মীমাংসা হয় নাই।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ থাকাতেই আমরা এই সংসারকে অকুল পাথারের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকি। কাহার কথা শুনিব, কোন্ পথে চলিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কর্ণ বিহীন এক খানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিয়া সংসার সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতিছি। যদি উপযুক্ত কর্ণধার পাইতাম, তাহা হইলে, ভব-সাগরের অপর পরে গিয়া সুখময় স্থানের অধিকারী

হইতে পারিতাম; কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত কর্ণধার অভাবে সংসারের প্রায় কেহই সেই সুখময় স্থানের অধিকারী হইলেন না। যখন আমরা ভব-সাগরের ঘোর তরঙ্গ দেখিয়া উপযুক্ত কর্ণধারের অনুসন্ধান করি, তখন অনেকে আমাদিগের সেই ক্ষুদ্র তরির নাবিক হইতে অগ্রসর হন; কিন্তু কার্য্য কালে তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন।

ভব-সাগর পার হইবার পক্ষে শাস্ত্রকারেরা যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটিও কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহারা বলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মই এই ভয়ানক সাগর পার হইবার এক মাত্র সুদৃঢ় তরণী। সেই ভীতি-শূন্য তরণীতে আরোহণ করিয়া স্রোতস্বতীর অপর পারে যাইতে হয়। ভগবানের চরন যদি ভব-সাগরের এক মাত্র তরণী হইল, তাহা হইলে, সে তরণীতে ভক্তেরা কি প্রকারে আরোহন করিবেন, কোনও স্থলেই তাহার মীমাংসা করেন নাই।

এই সংসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের গোলযোগ একটি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহার সহিত সাগরের তুলনা, কিম্বা নিবিড় অরণ্যের তুলনা করিলে, এই মাত্র উপলব্ধি হয়, যেমন দৈব প্রতিকূল বশতঃ অনাবিষ্কৃত সাগরের মধ্যে কখনও কখনও দুই এক খানি অর্ণবযান গিয়া পড়িলে, পোতস্থ ব্যক্তিগণ দিক্ হারা এবং পথ হারা হইয়া সেই অকূল পাথারে ভাসিয়া বেড়ায়; সে সময়ে ঐ পোতস্থ ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আপনা আপনি যিনি অধিক বুদ্ধিমান্ ও বহুদর্শী বলিয়া শ্লাঘা করেন, তাঁহারই পরামর্শানুসারে নাবিকগণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু সেই অকূল সাগরের কূল কিনারা না পাইয়া নাবিকগণ সেই পরামর্শ দাতার

প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া অপর এক জনের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। হয়ত, প্রথম ব্যক্তির পরামর্শ অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তির পরামর্শ আরও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। তখন পরস্পর আর কেহই কাহারও কথা শুনে না, সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেই অকূল সাগরের মধ্যে এক কালে বিনষ্ট হয়; এ সংসারের ধর্ম্মশাস্ত্রও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত ভাব কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেবল অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া ইহ পরকাল সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরস্পর মত ভেদের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলে, এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত ভেদ ঘটাতে মনুজকুল অকারণ দুঃসহ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। সকলেরই ইচ্ছা ইহ কালে অতুল সুখ ভোগ করিয়া চরমে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিব। ইহ কালের সুখ ভোগের সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক সংস্রব আছে। মনুষ্যের অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ না হইলে, কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। আমি যাহা ইচ্ছা করি, ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা করিতে বারণ করিতেছে; আমি যাহা কখনও মনে ভাবি না, ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছে। যদি কেহ ইহ সংসারে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবার জন্য শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, ইহ জগতে আর তিনি কোনও কালেই সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না। কোনও শাস্ত্র উপদেশ দিতেছে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, তাহা হইলেই চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারিবে। তান্ত্রিক মতে শবসাধনের বিধি আছে, এবং বৈষ্ণবদিগের মতে ইহ কালের

সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক হরির চরণ সার করিলেই পরম ধার্ম্মিক হইতে পারা যায়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ব্রতাদি করাও সামান্য কষ্টকর নহে। তবেই শাস্ত্রানুসারে চলিতে গেলে, এ জন্মে আর সুখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে না। কোনও শাস্ত্রেই এরূপ আদেশ নাই যে, ইচ্ছামত ভোজন পান করিয়া আমোদ প্রমোদে কাল হরণ কর, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দশ সহস্র মুদ্রা ধর্ম্মার্থে রাখিয়া গেলেই চরমে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।

শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্ব জন্মে যে দিবস যে সময়ে যে রূপ কার্য্য করিয়াছ, এ জন্মে সেই দিবস সেই সময়ে সেই সকল কার্য্যের ফলাফল ভোগ করিবে। কর্ম্ম নিবন্ধন যে সকল জীব ইহ সংসারে গতায়াত করিতেছে, তাহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিবে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যাঁহারা শাপ ভ্রষ্ট কিম্বা দেব কার্য্য সাধনের জন্য এক বার মাত্র অবনীতে আবির্ভূত হন, তাঁহারা কি জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন? বসু অবতার ভীষ্ম বশিষ্ঠ মুনির শাপে কুরু কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য কিছুই ছিল না, তবে তিনি কি পাপে পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হইলেন না? কেনই বা শরশয্যাগত হইয়া দীর্ঘ কাল বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিলেন? যখন শাস্ত্রকারেরা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাপ ব্যতিরেকে জীবের কষ্ট ভোগ হইবে না, তবে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র কি পাপে চির কাল কষ্ট ভোগ করিলেন? এক সময়ে তিনি মহাপাপীর ন্যায় রাক্ষস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, প্রিয়তমা জানকীর বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের এরূপ

পাপের ভোগ কি জন্য হইল? তিনি ত ভোগাভোগের জন্য পূর্ব্ব জন্মে কোনও ফল সঞ্চয় করিয়া আইসেন নাই? যদি কেহ বলেন যে, মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ সকল-কেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; তবেই কর্ম্ম ফলের উপর কুগ্রহের আধিপত্য চলে। এরূপ হইলে, গ্রহগণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়; কেননা, যাহারা বিগুণ হইলে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবগণেরও দুর্দ্দশার অবধি থাকে না।

আবার কতকগুলি লোক সকল কথাতেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকেন। অদৃষ্ট শব্দের অর্থ কি? যাহার উপর আমাদি-গের দৃষ্টি চলে না,—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটনা। ভবিষ্যৎ ঘটনা যার পর নাই কৌতুকাবহ। বোধ কর, কয়েক জন নর নারী এক খানি ক্ষুদ্র তরণী যোগে নদী পার হইতেছে,মধ্য স্থলে নৌকা খানি জলমগ্ন হইল। আরোহীদিগের মধ্যে যে কয়েক জন সন্তরণে বিলক্ষণ পটু ছিল, তাহারাই আত্ম রক্ষা করিতে পারিল না; যে কিছু মাত্র সাঁতার জানিত না, সে সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে নিস্তার লাভ করিল। কোনও সময়ে একটি ভগ্ন গৃহের ভিতর দুই বন্ধু একত্র সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। তথায় গৃহস্বামীর একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক মার্জ্জার শাবক লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতে-ছিল; দৈবাৎ মার্জ্জার শাবক শিশুর হস্ত হইতে পলাইয়া সম্মু-খস্থ একটি টেবিলের নিম্নে প্রবেশ করিবা মাত্রই উপরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে দুই জনে মনোযোগপূর্ব্বক সতরঞ্চ খেলি-তেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; কিন্তু বালক টেবিলের নীচে বসিয়া থাকাতে তাহার গাত্রে কিছু মাত্র আঘাত লাগিল না। রাশীকৃত ইষ্টক ও কাষ্ঠের মধ্যে অক্ষত

শরীরে বসিয়া রহিল। ছাদ পড়িয়া মানুষ খুন হইল, এই সংবাদ চারি দিকে বিস্তার হইয়া পড়াতে নিকটস্থ ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোক ঘটনা স্থলে ছুটিয়া আসিয়া প্রাণপণে ইষ্টক ও কাষ্ঠ সরাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুটি ইষ্টক রাশির মধ্যে অক্ষত শরীরে উপবিষ্ট আছে। এরূপ ঘটনা ঘটে কেন, কে ইহার মীমাংসা করিতে পারে? এ কি পূর্ব্ব জন্মের ফল, না গ্রহ বৈগুণ্যের কারণ, অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলি, তাহা হইলে, অনেকে করুণাময়কে পক্ষপাতী বলিবে। যদি গ্রহ বৈগুণ্যের কারণ বলি, কিম্বা পূর্ব্ব জন্মের ফল বলিয়া ধরি, তাহা হইলে, কতক পরিমাণে মীমাংসা হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্ব বিধায় নহে। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ অবশ্য বলিবেন যে, যাহা-দিগের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই উপরি উক্ত দৈব বিপাকে মরিল, আর যাহার মৃত্যুর কাল বিলম্ব আছে, কতক-গুলি সুযোগ ঘটিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। ক্ষয় কালে অবশ্য মৃত্যু ঘটিবে, ইহা সৌপ্তিক পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিশিষ্ট বিধানে বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—দেখ, মহারাজ, সময় না হইলে, কেহ কাহাকেও সংহার করিতে পারে না। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসীয় তুমুল সংগ্রামে বিশেষ রূপে লিপ্ত থাকিয়াও প্রত্যহ অক্ষত শরীরে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তিত হইত; কিন্তু অদ্য ক্ষয় কাল উপস্থিত হওয়াতেই উহারা কাপুরুষ দ্রোণ পুত্রের হস্তে পশুবৎ নিহত হইল। ইহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যু কাল উপস্থিত না হইলে, কেহই কাহাকেও হনন

করিতে পারে না ; এই জন্য প্রাক্তনই বল, আর পূর্ব্ব জন্মের ফলাফলের ভোগই বল, কিম্বা ঈশ্বরের ইচ্ছাই বল, যে যাহা বলিয়া পরিতুষ্ট হয়, তাহাদিগের তাহাই বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, জলমগ্ন হইয়া ও ইষ্টক রাশির মধ্যে পতিত হইয়া যে কয়েক জন ব্যক্তি মৃত হইল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' এই কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা পূর্ব্ব জন্মের ফলাফল বা অদৃষ্ট বলিয়া মনকে পরিতুষ্ট করিতে যাই, তাহা হইলে, পূর্ব্ব কথিত ঘটনা দ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মীমাংসা হয় না ; কারণ ইতি পূর্ব্বে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যের ফল ইহ জন্মে ভোগ করিবার সময় কুগ্রহগণ কখনও বা স্বপক্ষ কখনও বা বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। স্বয়ং বিধাতা যে ফলের বাধ্য, গ্রহগণ তাহারও বিপরীত করিয়া দিতেছে। পূর্ব্ব জন্মের আবার কোনও কথাই আমরা ভাল রূপ বুঝিতে পারি না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই রূপ জীবাত্মা জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নুতন কলেবরে প্রবিষ্ট হয়। তবে এই রূপ আধারগত পাপ পুণ্যের ভাগী কে হইবে ? যদি বল, আত্মাই সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আত্মা যে ঈশ্বরের অংশ সে কথায় সর্ব্বতোভাবে দোষ পড়িয়া যায়।

মানব দেহ ধারণ করিয়া আমরা ভয়ানক বিপদে নিপতিত হইয়াছি। যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অনাবিষ্কৃত সাগর মধ্যগত অর্ণবযানের আরোহিগণ প্রথমতঃ যাঁহাকে দূরদর্শী বোধে তদীয় পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়াছিল, এবং তাঁহার আদেশ

মতই চলিয়া অকূল পাথারে কূল পাইবার জন্য পোত চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু দুই এক দিবস কার্য্য করিয়া দেখিল যে, যিনি অধ্যক্ষ তিনিও তাহাদিগের ন্যায় অনভিজ্ঞ। তখন তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। কেহ বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, কেহ কেহ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি উদ্যোগী পুরুষ যত্ন ও চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না; পোত চালনাও করিতে লাগিলেন, এবং অকূল কাণ্ডারী ঈশ্বরকেও ডাকিতে লাগিলেন।

এই সংসার তরঙ্গও মনুজকুলের পক্ষে সেই রূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র তরি অজ্ঞানতা রূপ অকূল পাথারে সর্ব্ব ক্ষণ ভাসিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অকূল পাথার। এই বিপদে পড়িয়া যদি শাস্ত্রকারদিগের উপদেশের কথা স্মরণ করি, তাহা হইলে, মনোমধ্যে আরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কেননা, সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওন সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে; কেহ বলিয়াছেন, বিপদে পড়িলে ঈশ্বরকে ডাকিও; কেহ বলিয়াছেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। বিপৎ কালে এই সকল মত ভেদের কথা স্মরণ হইলে, কাহার কথা বিশ্বাস করিব, স্থির করিয়া উঠিতে পারি না; সেই জন্য সকলের মত পরিত্যাগ করিয়া একটা স্বকল্পিত উপায় উদ্ভাবন করি। এই রূপে পর্য্যায় ক্রমে সংসারের প্রায় সমস্ত লোকই ধর্ম্ম উপদেষ্টৃগণের উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছামত পথে পরিভ্রমণ করিয়া

বেড়াইতেছে। যদি দৈব বশতঃ সেই স্বেচ্ছাচারিগণের মধ্যে কেহ কোনও সুযোগ প্রাপ্ত হন; এবং মনে মনে বিবেচনা করেন যে, আপন বুদ্ধি অনুসারেই অকূল সংসার সাগরে কূল প্রাপ্ত হইলাম। যদি শাস্ত্রকারদিগের কথা শুনিয়া দুর্গম পথের পথিক হইতাম, তাহা হইলে, এরূপ সুবিধা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত না। এক জন স্বেচ্ছাচারীকে কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভীক দেখিয়া আর দশ জনও সেই পথে অগ্রসর হইল। অবশেষে সকলেই দেখিতে পাইল যে, আমরা যাহাকে কূল বিবেচনা করিয়াছিলাম, ইহা প্রকৃত কূল নহে, একটি শ্বাপদ সঙ্কুল মায়াময় ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে থাকিলে আশু বিনষ্ট হইব, অতএব স্থানান্তরে প্রস্থান করাই যুক্তি সিদ্ধ। প্রাণী মাত্রেই সংসার সাগরে পড়িয়া অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুর্ব্বলকে সবলে বিনষ্ট করিতেছে। কেহ কোনও কালে যদি একটি নিরাপদ স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু বিবেচনার দোষে সেই নিরাপদ স্থানও বিপদ পূর্ণ বোধে আবার নূতন স্থানে গমনের চেষ্টা দেখে।

আমাদিগের এই সকল প্রলাপের প্রকৃতার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এই সংসার প্রকৃতই সাগরের তুল্য। পোতাধ্যক্ষ যেমন সমুদ্র পথে পোত চালনা করিবার সময় পদে পদে আপদ্ বিপদ্ ভোগ করিয়া থাকেন, আমাদিগের এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র তরণীর অধ্যক্ষও সেই রূপ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মধ্যে মধ্যে সংসার রূপ সাগরের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করেন। সমুদ্র পথে কি রূপে পোত চালনা করিতে হয়, প্রত্যেক পোতাধ্যক্ষগণ বাল্য কাল হইতে সদ্গুরুর নিকট বিশিষ্ট বিধানে

শিক্ষা করিয়াছেন, আবার দুই এক বার সমুদ্র পথে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদর্শিতাও লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক জলযানে দিগদর্শন যন্ত্র রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে মানচিত্র ঝুলিতেছে। পোতাধ্যক্ষ সমূহ সতর্কতার সহিত কর্ণ ধারণ করিয়া সহযোগিগণকে প্রকৃত পথে পোত চালনের আদেশ করিতেছেন; তথাচ, কখনও বা কর্ণধারের অনভিজ্ঞতা, কখনও বা তাঁহার অনবধানতা, এবং কখনও বা দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ কত শত জলযান জলমগ্ন হইতেছে। অকূল পাথারের মধ্যে থাকিয়া অনেক সময়ে অনেক জাহাজ আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। আবার কখনও বা গাঢ় কুজ্ঝটিকায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইলে, দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরে দৃষ্টি না চলাতে, চড়ায় ঠেকিয়া বা জলমগ্ন শৈলে আঘাত লাগিয়া অনেক জলযান বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই প্রকার আমাদিগের এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র তরণী অনুক্ষণ ভব-সাগরে ভাসমান রহিয়াছে। মন ইহার বিচক্ষণ কাণ্ডারী, জ্ঞানই এ তরণীর দিগদর্শন যন্ত্র, পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবীই ইহার মানচিত্র, ও অমূল্য দুই চক্ষুই দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এরূপ আয়োজন সত্ত্বেও আমাদিগের দেহ-তরি বিপথগামী হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যদি মন বিশেষ সাবধানতার সহিত দেহ-তরি চালনা করে, তাহা হইলে, কখনই ভব-সাগরের আবর্ত্তনে পড়িয়া 'গেল! গেল!' শব্দ করিয়া উঠিতে হয় না। যেমন সিন্ধু সলিল গত অর্ণবযান গাঢ় কুজ্ঝটিকায় পড়িলে, কর্ণধার কর্ত্তৃক বিপথে চালিত হয়, আমাদিগের দেহ-তরির পক্ষে দারা, পুত্র প্রভৃতি পরিবারও সেই রূপ কুজ্ঝটিকা; কেবল তাহাদিগেরই জন্য দেহ-তরি পদে পদে বিপথগামী হয়।

দৈব বিড়ম্বনার উপর কোনও কথাই চলে না। দূর দৃষ্টি কি অদৃষ্ট এই দুইটির উপর কাহারও হস্ত বিস্তার করিবার ক্ষমতা নাই। বিপদ্ দূরস্থ রহিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে নিকটস্থ হই-তেছে, আমরা তাহা অবগত হইবার কিছু মাত্র ক্ষমতা রাখি না; এই জন্য ভাবী বিপদ্ যাহাতে না ঘটে, তৎ পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি। বিবেচনা করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের প্রধানতম রাজ প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা লর্ড মেও বাহাদুর পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যখন কলিকাতা হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই যে, আণ্ডামান দ্বীপ হইতে আর তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হইবে না। দূর দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি চলে না বলিয়াই তিনি আনন্দ মনে আণ্ডামানে গমন করিয়া-ছিলেন। যে দিন বৈকালে সিন্ধু জলে সূর্য্যাস্তের শোভা দর্শন মানসে পর্ব্বতারোহণ করেন, তখন দূর দৃষ্টি নিকটস্থ হইয়াছে, এবং অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহার সমুদয় আয়োজন হইয়া রহি-য়াছে, সে সময়েও তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই অবগত নহেন। দুরাত্মা শেয়ার আলি শস্ত্রপাণি হইয়া পর্ব্বতের নিম্নে উপবিষ্ট আছে, লর্ড বাহাদুর সূর্য্য অস্তের শোভা দেখিয়া স্বগণ সহিত হাসিতে হাসিতে নিম্নে আসিতেছেন, সেই সময় দুরন্ত যবন এক আঘাতেই তাঁহার জীবনান্ত করিল। লর্ড বাহাদুর পোর্ট-ব্লেয়ারে আসিয়াছেন বলিয়া ক্ষণ কাল পূর্ব্বে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ আনন্দ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল; কিন্তু চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতেই সেই পোর্টব্লেয়ারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। দেখুন, দৈবের কি ভয়ানক কার্য্য! অদৃষ্টের কি অভাবনীয় ফল! দূর দৃষ্টি কি রূপ নিকটস্থ হইয়াছিল। যিনি ভারতবর্ষের প্রধান-

তম শাসনকর্ত্তা, যাঁহার একটি কথায় সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়, যাঁহার আজ্ঞায় শত শত কামানের শব্দে ভারতের হৃৎকম্প হয়, যাঁহার পার্শ্বে তাঁহার সহোদর শস্ত্রপাণি হইয়া আসিতেছিলেন, এবং দূরদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ সভাসদ্গণ যাঁহার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছিল, এরূপ ব্যক্তিকে কি না এক জন বন্দী অনায়াসে নিহত করিয়া ফেলিল! কেহই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না! অতএব দৈব প্রতিকূল হইলে, কেহই আমাদিগের রক্ষা কর্ত্তা নাই। ভবিষ্যতে যাহা আছে, শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও কেহই তাহা জানিতে পারিবেন না।

এই সকল দৈব ঘটনার কর্ত্তা কে? ঈশ্বর, এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করেন, এবং তিনিই আমাদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি স্বহস্তে কোনও কার্য্যই করেন না। তাঁহার ধনের ভাণ্ডার নাই যে, ধন প্রার্থীদিগকে ধন দান করিবেন, তাঁহার সৈন্য সামন্ত নাই যে, প্রিয়পাত্রের পক্ষ হইয়া শত্রু দলন করিবেন, তিনি স্বয়ং কোনও কালেই অস্ত্র ধারণ করেন না যে, একটি সামান্য জীবের প্রাণ হনন করিবেন। যদিও তাঁহার ধন নাই, অস্ত্র নাই. এবং পৃষ্ঠ পুরুষ কেহই নাই; তথাচ, তাঁহার নিয়মেই এই সংসারের সমস্ত কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে। তিনি যাহা করিতেছেন, তাহার উপর দোষারোপ করা নিভান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি জীবের শিবের জন্য সংসারের সমস্ত কার্য্য একপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার একটির প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ

করিতে গেলে, একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। তিনি পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার দয়া সকলের প্রতি সম ভাগে বিভক্ত। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের কার্য্য সম্বন্ধে তার্কিকেরা চির কালই ঘোর বাগ্বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ, এক্ষণকার বিবিধ বিজ্ঞান বিশারদ আধুনিক নাস্তিকের দল প্রতি কথাতেই ঐশ্বরিক কার্য্যের উপর দোষ দর্শাইয়া থাকেন। কেহ বলেন, যদিও ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে, কোনও ক্রমেই তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারিব না; যে হেতু, তাঁহার ঘোর নিষ্ঠুরতার বিষয় পদে পদে আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হইতেছে। সন্তান প্রসবের কালে প্রসূতি যে রূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা বর্ণনাতীত। ঈশ্বর যদি দয়াময় হইতেন, তাহা হইলে, অনায়াসে সন্তান প্রসবের একটি সুসাধ্য উপায় অবধারিত করিয়া দিলে, তাঁহার দয়াময় নামের গৌরব রক্ষা হইত। সময়ে সময়ে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, ভূমিকম্পে ও ভয়ানক ঝটিকা প্রভৃতিতে অসংখ্য জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়। সেই সকল দৈব বিড়ম্বনায় কত শত লোক বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত হইয়া থাকে। এক এক সময়ে মহামারীতে বা দুর্ভিক্ষে এক একটি বহু জনাকীর্ণ দেশ একেবারে প্রাণীশূন্য হইয়া পড়ে। স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রসূতি ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিয়া আপন ক্ষুধানল শীতল করিয়াছে। আহার সামগ্রীর অপ্রতুলকেই দুর্ভিক্ষ কহিয়া থাকে। যদি ঈশ্বর দয়াবান্ ও সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতেন, তাহা হইলে, আহারাভাবে দীর্ঘ কাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কখনই অসংখ্য মহাপ্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইত না। তিনি যখন এই বিশ্ব রাজ্যের প্রাণিপুঞ্জকে উচিত

মত আহার দানে অক্ষম, তখন তাঁহাকে সর্ব্ব শক্তিমান্ কেমন করিয়া বলিব ? বর্ত্তমান কালের নাস্তিকের দল ঈশ্বরের প্রতি এই রূপ দোষারোপ করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহুসংখ্য শিক্ষিত যুবকও বিষম ভ্রমে নিপতিত হইতেছেন।

নাস্তিকদিগের প্রশ্নগুলির যথা সাধ্য উত্তর প্রদানের অগ্রে আমরা এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ভাব সম্বন্ধীয় দুই একটি উদ্ভট গল্পের সার সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং কোনও কার্য্য করেন না, অন্য ব্যক্তি দ্বারা অনেক সময়ে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কালের একটি গল্প এই স্থলে সন্নিবেশিত করা গেল ;—

পুরা কালে কোনও গ্রামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল। বহু পরিবারের অন্ন বস্ত্র দানে ব্রাহ্মণ একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে সেই দরিদ্র বিপ্র সপরিবারে অনশনে থাকিতেন। ব্রাহ্মণ এক দিন মনে মনে ভাবিলেন, শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যে, সমস্ত দেবগণের মধ্যে মহাদেবকেই অতি অল্প প্রয়াসে পরিতুষ্ট করিতে পারা যায়। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট বলিয়াই লোকে তাঁহাকে 'আশুতোষ' কহিয়া থাকে ; অতএব গৃহে বসিয়া এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা একান্ত মনে কিঁছু দিন শিবের আরাধনা করিব। দেখিব, পশুপতি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করেন কি না। এই রূপ চিন্তার পর, ব্রাহ্মণ এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মনে ও এক ধ্যানে দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগি-

লেন। দিবস ত্রয় সেই ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ মাত্র জলও গলাধঃকরণ করিলেন না, কেবল দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া মহাদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তিন দিবস অনশনে শিবারাধনা করাতে পার্ব্বতীনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, উমার সহিত উমাকান্ত সেই বিপিন মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। হর পার্ব্বতী এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, দেবি, আমি ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব ; কিন্তু অদ্য নহে, কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সম্মুখস্থ শিবের মন্দিরে ব্রাহ্মণ দশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। মহাদেব যে সময়ে পার্ব্বতীকে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জন ধূর্ত্ত বণিক ঐ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া ফল চয়ন করিতেছিল। সে মহাদেবের সমস্ত কথা শুনিতে পাইল। হর পার্ব্বতী অন্তর্ধ্যান হইলে পর, সে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিল, এবং ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি কেন বনে বসিয়া অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতেছ ? এখনকার কালে কি আর দেবতারা জাগিয়া আছেন ? তুমি আমার প্রতিবেশী, অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে ভ্রমে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ ! আমার বাড়ীতে আইস, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব ; ইহাতে আমার পুণ্য হইবে, নামও হইবে। সহস্র মুদ্রার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বণিকের সমভিব্যাহারে তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং হাজার টাকার তোড়া আনিয়া গৃহিণীর হস্তে দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

পর দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বণিক বিপিন মধ্য স্থিত শিবালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। বণিক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে দেব দেব মহাদেব! দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। তোমার কথা কখনও অন্যথা হইবার নহে; অতএব তোমার ভক্তকে শীঘ্র শীঘ্র টাকাগুলি দিয়া বিদায় কর, দাসের সহিত পরিহাস করা প্রভুর উচিত কার্য্য নহে। বণিক পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। অবশেষে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সজোরে দ্বার দেশে একটি পদাঘাত করাতে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; কিন্তু বণিকের পদাঘাতে কবাটের এক খানি প্রস্তর ফলক ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার দক্ষিণ পদের উরু দেশ পর্য্যন্ত কবাটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। বণিক এক প্রহর কাল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই ভগ্ন কবাট হইতে আপন চরণ বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সমস্ত রজনী সেই মন্দিরের দ্বারে পতিত রহিল। প্রত্যূষে তাহার পুত্রগণ পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইল। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও বণিক কোথায় আছে, তাহার কিছুই সংবাদ পাইল না। দিবা দুই প্রহরের সময় এক জন কাঠুরিয়া আসিয়া বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সংবাদ দিল যে, আপনার পিতা বনের ভিতর শিবালয়ের দ্বারে পতিত রহিয়াছেন, জীবিত কি মৃত তাহা বলিতে পারি না। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই বণিক পুত্র ভ্রাতৃগণের সহিত শিবালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু দক্ষিণ চরণের উরু দেশ পর্য্যন্ত কবাটে আবদ্ধ রহিয়াছে।

তাহারা কয়েক সহোদরে মিলিত হইয়া পিতার উদ্ধার সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে মন্দিরের অভ্যন্তরে এই দৈব বাণী হইল যে, ওরে অর্থ পিশাচের পুত্রগণ! তোরা শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও তোদের পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিবি না। তোদের পিতা প্রতারণা দ্বারা ব্রহ্মস্ব হরণ করিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহারই ফল-ভোগ করিতেছে। যদি তোদের পিতাকে রক্ষা করিতে চাহিস্, তাহা হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আর নয় সহস্র মুদ্রা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে পঁহুছিয়া দে; নতুবা এই অবস্থাতেই ইহার মৃত্যু হইবে। তোদের পিতা চির কাল প্রবঞ্চনা দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার এক কপর্দ্দকও সৎ-কার্য্যে ব্যয় করে নাই। অন্য কি কথা, আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার-গণকেও ভাল করিয়া অন্ন বস্ত্র দেয় নাই। পাপের ধন কোনও কালে স্থায়ী হইবার নহে। বিশেষতঃ, কৃপণের ধনে অগ্নি চোর রাজা এবং প্রতারকগণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যাহারা সৎ কার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত ধনের পরিমিতাচারে সার্থকতা সম্পাদন করে,তাহারাই ধন ভোগের যথার্থ পাত্র। যাহাদিগের ধনের নিতান্ত প্রয়োজন আছে, দেবতারা তোদের পিতার ভাণ্ডার হইতে সেই সকল লোকের অভাব মোচন করাইবেন, কল্য তোদের পিতা আপনা হইতেই তাহার সূত্রপাত করিয়াছে। যদি তোরা আর নয় সহস্র মুদ্রা ঐ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পিতাকে উদ্ধার করিতে বিলম্ব করিস্, তাহা হইলে, অদ্য রজনীতেই দস্যু কর্ত্তৃক তোদের সমস্ত ধন লুণ্ঠিত হইবে। দেবতাদিগের গৃহে সঞ্চিত ধন নাই, তাঁহারা প্রকারান্তরে এক জনের ধন অপর এক জনকে

দেওয়াইয়া থাকেন। এই ভবের আভ্যন্তরিক কৌশল বুঝিয়া উ্া কাহারও সাধ্য নহে, কোনও কালে কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। এই সকল দৈববাণী শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা ঐ ব্রাহ্মণকে নয় সহস্র মুদ্রা দিয়া পিতার উদ্ধার সাধন করিল।

যেমন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বহুসংখ্য লোক একেবারে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়; কি জন্য এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, কেনই বা ঈশ্বর অকালে বহুসংখ্য মহাপ্রাণীকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়া এক কালে বিনষ্ট করেন, তাহার গূঢ় ভাব অবগত হইতে না পারিয়া নাস্তিকেরা যেমন ঈশ্বরকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বলিয়া অগ্রাহ্য করে, সেই রূপ উপরি উক্ত গল্পটিতে দেব দেব মহাদেব ঐ কৃপণ বণিকের নিকট মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হইয়াছিলেন।

সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় সম্যক্ বুঝিতে পারা মনুষ্যের সাধ্য নহে। দৈব বিড়ম্বনায় অসংখ্য প্রাণিহত্যা দেখিয়া নাস্তিকেরা করুণাময় ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে সাহসী হইয়াছে; এ কি তাহাদিগের কম স্পর্দ্ধার কথা! তাহারা কি এক বারও ভাবিয়া দেখে না যে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতেও ঈশ্বরের মহিমা দেদীপ্যমান রহিয়াছে? তাহারা কি জানে না যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ? কখনও কখনও সেই তরল ধাতুতে ভয়ানক তরঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহার কিয়দংশ বহির্গত না হইলে, সে তরঙ্গের কোনও ক্রমেই সমতা হয় না; এই জন্য করুণাময় পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেই তরল পদার্থ নির্গত হইবার জন্য এক একটি পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, আগ্নেয় গিরি বলিয়া আমরা সেই সকল পথের নামকরণ করিয়াছি। যদি নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া পৃথিবীর

অভ্যন্তরস্থ তরল ধাতু, ভস্ম ও ধূমরাশি নির্গত না হইয়া সময়ে সময়ে এক একটি নূতন স্থান ভেদ করিয়া ঐ সকল অনিষ্টকর পদার্থ নির্গত হইত, তাহা হইলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের দোষ ধরিতাম। তিনি যখন এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, এবং অগ্ন্যুৎপাতের দুই তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে সঙ্কেত দ্বারা অগ্ন্যুৎপাত নিকটস্থ বলিয়া জানাইয়া থাকেন; তথাচ, যাহারা কেবল আলস্য পরবশ হইয়া আগ্নেয় গিরির চতুষ্পার্শ্ব হইতে পলায়ন না করে, তাহার জন্য ঈশ্বরকে দোষী করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। যে কোনও প্রকার দৈব বিড়ম্বনা ঘটুক না কেন, অকস্মাৎ সেই মহানিষ্টকর ব্যাপার কখনই উপস্থিত হয় না। তিনি কি ঝটিকা, কি জলপ্লাবন, কি দুর্ভিক্ষ ঘটিবার পূর্ব্বে আভাষ দ্বারা প্রাণী মাত্রকেই সাবধান হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেও যাহাদিগের চৈতন্য না হয়, দৈব বিপাকে তাহারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সন্তান প্রসব সম্বন্ধে নাস্তিকেরা যে কথা উত্থাপন করে, তাহাও নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। প্রসূতিকে প্রসব বেদনায় কিয়ৎ ক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয় সত্য; কিন্তু নব প্রসূত সন্তানের মুখ দেখিলে, সে কষ্ট একেবারে দূর হইয়া যায়। যে দ্রব্য বহু কষ্টে অর্জ্জিত, আমরা তাহারই প্রতি বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিয়া থাকি, অনায়াস লভ্য দ্রব্যের প্রতি সমধিক আদর করি না। বহু কষ্টে জননী সন্তানের মুখাবলোকন করিতে পান বলিয়া আপন প্রাণ অপেক্ষাও অপত্যকে অধিক মমতা করিয়া থাকেন, উহা অনায়াস লভ্য হইলে, বোধ হয়, তত দুর করিতেন না। আবার দেখিতে

পাওয়া যাইতেছে, প্রসব কালের যন্ত্রণা সমস্ত প্রাণীর এক রূপ নহে। যাহারা এক কালে অধিক শাবক বা ডিম্ব প্রসব করে, প্রসব সময়ে তাহাদিগের অতি সামান্যই যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সর্ব্বদা দেখা যায়, রাজহংসীরা চারি দিকে নৃত্য করিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে আহারান্বেষণ করিতে করিতে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। যদি মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে প্রসব কালে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলে, আহার করিতে করিতে কখনই ডিম্ব প্রসব করিতে পারিত না। তবেই প্রসব সময়ের যন্ত্রণার হ্রাস করিয়া দিতে সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি আছে। মানব জাতি সম্বন্ধে যখন তাহা করেন নাই, তখন অবশ্যই ইহাতে ঈশ্বরের কোনও গূঢ় অভিপ্রায় আছে, তাহা আমরা হয় ত বিশিষ্ট বিধানে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

মহামারী ও দুর্ভিক্ষে বহু প্রাণিনাশ সম্বন্ধে আমরা আরও একটি কথা বলিব। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশিষ্ট বিধানে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক শরীর বিনষ্ট হইলেও জীবাত্মা বিনষ্ট হয় না। উপস্থিত দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য প্রাণিহত্যা হইল সত্য, কিন্তু করুণাময় ঈশ্বর যদি তাহাদিগকে অন্য কোনও সুখময় স্থানে লইয়া যাইবার জন্য এই সুলভ উপায়ে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সে কথা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, এক্ষণকার বহুদর্শী পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই ভারত ভূমি পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের আহার যোগাইতে সক্ষম, ইহার অধিক প্রজা বৃদ্ধি হইলেই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। গত লোক সংখ্যার তালিকায় স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ কোটি নর নারী অধিক জন্মিয়াছে। যদিও বৎসর বৎসর বহু-

সংখ্য নর নারী মহামারীতে বিনষ্ট হইতেছে, তথাচ, প্রজা সংখ্যা উন্নত ভিন্ন অবনত হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য প্রাণিনাশ প্রয়োজন বলিয়া ধরিতে হয়। যে সকল স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহে অধিক পরিমাণে প্রাণিনাশের সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থানে Natural check-এ প্রাণী নাশ না হইলে, সংসারের ঘোর বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। যেটি দৈব কর্তৃক ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই Positive check কহা যায়। যে সকল বিষয় সংসারের কল্যাণের জন্য আমরা আপনা আপনি করিয়া থাকি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই Preventive check কহিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ অতি অল্প বয়সেই প্রায় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। যাহাদিগের অপত্য প্রতিপালনের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কায় ক্লেশে তাহারও একটি দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অন্যান্য ভূভাগ অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে প্রজা বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে ; এই জন্যই পূর্ব্বাপেক্ষা এ দেশে দুর্ভিক্ষের আধিক্য হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

মানব জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে Preventive check দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মৎস্য জাতিরা ডিম্ব প্রসব করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনারাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দৈবাৎ স্রোতের মুখে দুই এক বার ডিম্ব ভাসিয়া যায় বলিয়া কি পরিমাণে মৎস্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যদি মৎস্য জাতির ডিম্ব ভক্ষণ স্বভাব সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে, সলিলে তাহাদিগের স্থান হওয়া ভার হইয়া উঠিত।

এতদ্ভিন্ন বিড়ালী, ব্যাঘ্রী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীরাও অনেক সময়ে আপন আপন শাবক ভক্ষণ করিয়া ফেলে। বানরী পুং বানর প্রসব করিলেই বানরেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলে; এই জন্য দুই শত বা তিন শত বানরীর মধ্যে একটি বা দুইটির অধিক বানর দৃষ্ট হয় না। যদি শৈশবাবস্থায় পুং বানরগুলি এই রূপে বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, বানরের সংখ্যা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইত ও তদ্দ্বারা সংসারের কত দূর অনিষ্ট ঘটিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সংসার তরঙ্গ আমাদিগের মূল প্রস্তাব। কথার প্রসঙ্গে নাস্তিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে দোষারোপ করণের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিপ্লব সংসারের একটি সামান্য তরঙ্গ নহে। সময়ে সময়ে এই তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া এক একটি সুসভ্য দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে। অদ্যাপি কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপ ঝটিকার প্রবল বেগে ভব-সাগরে ভয়ানক তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। কেবল এক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি-বৃন্দেরই সে তরঙ্গে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না। তাঁহারা বিশ্বাস রূপ সুদৃঢ় উপকূলের উপর দাঁড়াইয়া স্থির চিত্তে এই ভব-সাগরের লহরী লীলা দর্শন করেন। যেমন পরিদৃশ্যমান্ সিন্ধু সলিল কি জন্য লবণাক্ত হইয়াছে, বা উপকূল হইতে দৃষ্টি করিলে, কি জন্য সাগরের অগাধ জলরাশি নীল বর্ণ দেখায়, ইহার বিশিষ্ট কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারিত করিতে পারেন নাই; সেই রূপ এই ভব-সাগরের তরঙ্গ লহরী দেখিয়া তাহারা কি জন্য বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে না পারিয়াই মূঢ়েরা ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের উপর অকারণ দোষারোপ করিয়া থাকে।

যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, তাহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কোনও নিগূঢ় ভাব আছে; কিম্বা যাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই, ঈশ্বর সে সকল বিষয় বুঝিতে আমাদিগকে ক্ষমতা দেন নাই। দীর্ঘ কাল পূর্ব্বে স্বভাব আমাদিগের উপর একাধিপত্য করিত, তাহার গতি রোধ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইত না, এক্ষণে সুমার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে স্বভাবকে কিঙ্করের ন্যায় খাটাইয়া লইতেছি। এই জন্য অনুমান করিতে পারা যায় যে, সে সকল বিষয় এক্ষণে আমাদিগের নিতান্ত বুদ্ধির অগম্য হইয়া রহিয়াছে, কাল প্রভাবে হয় ত, সেই সকল বিষয় আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। অতএব ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দের উচিত এই যে, তাঁহারা যেন স্থির ভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল পরিদর্শন করেন; কেননা, কোনও বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া নিষ্ফল বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। যখন আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, ও মৃত্যুর পর কোথায় গমন করিব, তাহাই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক কার্য্য প্রণালীর গূঢ় ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা কি অনধিকার চর্চ্চা নহে?

প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ সিন্ধু সলিল যখন স্থির ভাবে থাকে, তখন সলিলস্থ অর্ণবযানারোহিগণের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। সে সময় কেহ বা আহার করিতেছেন, কেহ বা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, কেহ বা পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এবং কেহ বা সুশ্রাব্য যন্ত্র বাজাইয়া সংগীত দ্বারা শ্রোতৃগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। সাগরের শান্ত ভাব দেখিয়া সকলের হৃদয়ে শান্তি দেবী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তখন

কেহ এক বার মনেও ভাবিতেছেন না যে, এই সাগর আবার এক সময়ে ভীষণ ভাব ধারণ করিবে, সে সময় ইহার ভয়ানক তরঙ্গ লহরী দেখিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রতিক্ষণ অনুমান হইতে থাকিবে যে, এই বার বুঝি অগাধ জল রাশির মধ্যে পোত নিমগ্ন হইল, আর উঠিবে না, আর রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই ; অন্তিম সময়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার-গণের কি আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। বহু কষ্টে যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহার অতল জলে ডুবিল। এক্ষণে যদি করুণাময় ঈশ্বর কৃপা দৃষ্টি করেন, তবেই রক্ষা ; নতুবা নিস্তার লাভের আর উপায়ান্তর নাই। হে করুণাময় ! হে বিপদ ভঞ্জন ! আমাদিগকে রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! মুহুর্মুহুঃ এই রূপ চীৎকার ধ্বনি উঠিতে থাকিবে। নাবিকগণ আপনা লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, কেহই কাহারও সাহায্য করিতে আসিবে না। ভব-সাগরের অন্তর্গত মনুষ্যের দেহ রূপ ক্ষুদ্র তরণীও তদনুরূপ। যখন ইহ সংসারে শান্তি বিরাজমান থাকেন,—অর্থাৎ মনুষ্যের ধন থাকে, জন থাকে, পূর্ণ যৌবন থাকে, ও শরীর সুস্থ থাকে, সে সময় মানব জাতি এই সংসারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া দিন যামিনী মনের আনন্দে শান্তি সলিলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় ; এক বার মনেও ভাবে না যে, এই সংসার সাগর কোন্ সময় কুবাতাসে ঘোর আন্দোলিত হইয়া উঠিবে, তখন ইহার ভীষণ তরঙ্গ তুফান দেখিয়া এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র তরির কাণ্ডারী একে-বারে কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বসিবে, তরণী ভয়ানক আবর্ত্তনে পড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে ; তখন পূর্ব্বে যে সকল সুখ ভোগ করি-য়াছিলাম, তাহার কিছুই স্মরণ হইবে না, এই সংসারের চতুর্দ্দিকে

কেবল বিভীষিকা দর্শন হইবে। কি হইল! কি করিলাম! কেন এত দিন আমোদে উন্মত্ত হইয়া প্রকৃত কার্য্য বিস্মরণ হইয়াছিলাম! ভব-সাগরের যে এ রূপ তরঙ্গ তুফান আছে, পূর্ব্বে তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, চির কালই সম ভাবে যাইবে। এক্ষণে দেখিলাম যে, মনুষ্যের সুখ নলিনী দলস্থিত বারিবিম্বের ন্যায় সর্ব্ব ক্ষণ টল টল করিতেছে।

এই সংসার সাগর কামরূপী। এক এক সময় এই সাগর নানা ভাব ধারণ করে,—কাহারও পক্ষে শান্ত, কাহারও পক্ষে অশান্ত। যখন এক জন এই সাগরে পড়িয়া 'প্রাণ যায়!' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই এই সাগরের অন্য এক দিকে আনন্দ কোলাহলের গগনভেদী ধ্বনিতে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। এই সাগরের উপকূলে দাঁড়াইয়া কেহ বা বিনা আয়াসে দুই হস্তে রাশি রাশি মূল্যবান্ রত্ন সংগ্রহ করিতেছে, কেহ বা তরঙ্গ লহরী যুক্ত সিন্ধু জলের তলস্পর্শ করিয়াও একটি কপর্দ্দকও উদ্ধৃত করিতে পারিতেছে না। তবেই সংসার সকলের পক্ষে সমান নহে। যাহার এক দিন অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, পুত্র কলত্র ছিল, দুরদৃষ্ট বশতঃ সে সমস্ত হারাইয়া নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে পূর্ব্বে দীন দরিদ্র ছিল, এক্ষণে সে ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য যে হাসিতেছে, কল্য তাহাকেই আবার ক্রন্দন করিতে দেখা যাইবে। এক দিন যে নগর ধনে জনে পরিপূর্ণ ছিল, এক দিনের দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ সেই নগর অদ্য প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কল্য যে সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে সংগীত করিয়াছিল, অদ্য সে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যাবলুণ্ঠিত হইতেছে। কিছু

কাল পূর্ব্বে যে সকল স্থান মরুভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে সেই সকল স্থানেই বহু জনাকীর্ণ নগর ও উপনগর হইয়াছে। পূর্ব্বের শ্মশান ভূমি এক্ষণে কুসুমোদ্যান হইয়াছে, আবার রাজ-প্রাসাদ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তবেই এই সংসার যার পর নাই পরিবর্ত্তনশীল; ইহা কখন কি ভাব ধারণ করিবে, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। এই জন্যই পণ্ডিতেরা এই পরি-বর্ত্তনশীল সংসারকে কখনও বা প্রচণ্ড তরঙ্গমালা সঙ্কুল সাগরের সহিত, কখনও বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার সহিত উপমা দিয়া, এবং কখনও বা একেবারে সমস্তই অলীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞান প্রভাবে এই সংসার সাগরের তরঙ্গ তুফানে বিচলিত না হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে হাস্য করেন, তাঁহারাই ধন্য; নতুবা অজ্ঞানের পক্ষে এই জগৎ কখনও কুসুম শয্যা, কখনও বা অগ্নি-কুণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

আত্মতত্ত্ব।

যে রাজ্যের রাজা আপন রাজ্য খণ্ডের সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বিলাস ভোগ করেন, তাঁহার রাজ্য অচির কাল মধ্যেই শত্রু হস্ত গত হয়। যে গৃহস্বামী প্রত্যহ আপন সংসারের তত্ত্বানুসন্ধান না লন, তাঁহার পরিবারের মধ্যে নানা দোষ ও সংসারে মহাবিশৃঙ্খল ঘটিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে অসুখী করে। যে কৃষক স্বকীয় ভূমি খণ্ডের বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হইয়া বীজ বপন করে, তাহার সে ভূমিতে কোনও কালেই সুন্দর শস্য উৎপন্ন হয় না। যে গৃহে কালসর্প বাস করে, সেই গৃহের অধিকারী উক্ত সর্পের বিনাশ সাধন না করিয়া যদি

অকুতোভয়ে সসর্প গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বা পরিবারস্থ অপর কাহাকে অবশ্যই সর্পাঘাতে মরিতে হয়। যদি কেহ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আলোক না লইয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে, সে যে গৃহাভ্যন্তরস্থ কোনও কঠিন দ্রব্যের প্রতিঘাতে ধরাতলশায়ী হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই রূপ যিনি এই ভৌতিক দেহ রাজ্যের সমস্ত তত্ত্ব, ও বাহ্য জগতের সহিত ইহার সমস্ত সম্বন্ধ অবগত হইবার প্রয়াস না পাইয়া অজ্ঞানান্ধকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন, তাঁহার দেহ রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খল ঘটে, ও তিনি মোহাদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পদে পদে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের এই দেহ রাজ্যে আত্মাই সর্ব্বেশ্বর। যদিও তিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহেন, তথাপি, স্বভাবের রীতি অনুসারে তাঁহাকে দেহবাসী হইয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হয়। দেহ যে প্রকারে বিনষ্ট হউক না কেন, আত্মা অক্ষত ভাবে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন; আত্মার কোনও কালেই বিনাশ নাই। সে যাহা হউক, সকল মনুষ্যেরই এক মনে ও এক ধ্যানে সর্ব্বাগ্রে আপনাকে চিনিয়া তৎপরে সংসারের অপরাপর বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং সমস্ত জগতের সহিত একটি মাত্র মনুষ্যের কত দূর সংস্রব আছে, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা জানা উচিত। আত্মজ্ঞানহীন লোকেরা কবন্ধের ন্যায় এই সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এই জন্য প্রতিক্ষণ তাহাদিগের বিপদ্ ও দুঃখ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আলোক ব্যতীত অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন পদে পদে নানা

বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই রূপ আত্মজ্ঞান বিহীন হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গেলে, কোনও অবস্থাতেই মানবের ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকে না। নিকৃষ্ট প্রাণিগণের আত্মজ্ঞান নাই, এজন্য তাহারা পদে পদে বিপদে পতিত হয়। পক্ষীর মধ্যে কাক ও চতুষ্পদ পশুর মধ্যে শৃগাল অত্যন্ত ধুর্ত্ত হইলেও, মনুষ্যের নিকট সর্ব্বদা প্রতারিত হইয়া থাকে। সেই রূপ আত্মতত্ত্ব বিহীন, অথচ সাংসারিক কার্য্যে বিলক্ষণ চতুর ব্যক্তিরা বহু কাল ধূর্ত্ততা দ্বারা শত শত লোককে প্রতারণা করিয়া অবশেষে আপনারাই স্বকীয় জালে নিপতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহাদিগের আত্মজ্ঞান আছে, অথচ, তাদৃশ সাংসারিক চতুরতা নাই, তাঁহারা সেই আত্মজ্ঞান প্রভাবে শত সহস্র ধূর্ত্তের নিকট বিনা আয়াসে আত্ম রক্ষা করিতে পারেন। বিনা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কেহই আপনা আপনি ভাল হইতে পারেন না। যিনি আপনাকে আপনি ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, আপনার দোষ গুণের সমালোচনা আপনা আপনি করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার তরঙ্গে প্রভূত পরিমাণে সুখ শান্তির অধিকারী হন।

আমরা যে সর্ব্বদা 'আমি আমি' করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছি, আমার বাটী, আমার সংসার, আমার পুত্র কলত্র, ও আমার ঐশ্বর্য্য ভাবিয়া মনোমধ্যে ইহারই সর্ব্বদা আন্দোলন করিতেছি; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ইহাদিগের কেহই আমার নহে। অন্য কি কথা, আমার দেহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও আমার বশবর্ত্তী নহে, তাহারা স্বভাব সম্ভূত হইয়া স্বভাবেরই কার্য্য করিতেছে। যাহার যে কার্য্য স্বভাব কর্ত্তৃক নির্নীত হইয়াছে, সে তাহাই করিবে। আমার আদেশে চক্ষু কথা কহিবে না, কণ

দর্শন করিবে না, ও হস্তদ্বয় শরীর বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবে না। যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া আমি 'দেহী' শব্দে বাচ্য হইয়াছি, তাহারাই যখন আমার নহে, ও আমি যে কে, তাহারই যখন স্থিরতা নাই, তখন আর কাহাকে আমি 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিব ? স্ত্রী পুত্র কি আমার ? এবং আমিই কি তাহাদের ? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? শাস্ত্রানুসারে যে স্ত্রী আমার অর্দ্ধাঙ্গের অধিকারিণী হইয়াছেন, যাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি এই সংসার ক্ষেত্রে না করিতেছি এমত কার্য্যই নাই, যিনি পুত্রবতী হইলে, আমার যথা সর্ব্বস্বের অধিকারিণী হন, তিনিই কি আমার ? কাল আগত হইলে, তিনি কি আমার জন্যে লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন ? না, মুহূর্ত্ত কালের জন্যও না। আমি যত কেন যত্ন করি না, আমার সহধর্ম্মিণী কিছুতেই আমার বাধ্য হইতে পারিবেন না, ইচ্ছা সত্বেও তিনি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবেন না, তাঁহাকে কালের বাধ্য হইয়া চলিতে হইবেই হইবে। আত্মীয়, বান্ধব, পুত্র,কন্যা প্রভৃতি সকলেই সেই কালের আজ্ঞাবহ, আমি স্বয়ংও তদীয় অবাধ্য হইতে পারিব না। সে যখন ডাকিবে, তখনই তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইবে, আর সাংসারিক কোনও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইব না। বহু কষ্টে যে বিষয় বিভব করিয়াছি, তাহা সমস্তই পড়িয়া থাকিবে, তাহার এক কপর্দ্দকও সঙ্গে যাইবে না। আমি কোথা হইতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণেই বা কোথায় যাইতেছি, এবং যদিও কোনও স্থান থাকে, সেই স্থানে গিয়াই বা আমার কি অবস্থা ঘটিবে, এ কাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির হইল না।

ভবে দেখিয়া শুনিয়া এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এক দিবস এই জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু কবে যে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার দিন স্থির নাই।

এ জগতের সহিত পর জগতের অনেক সাদৃশ্য আছে। শাস্ত্রকারেরা অনুমান দ্বারা সেই গুলি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ, পৌরাণিক মতে পৃথিবীর সহিত স্বর্গ রাজ্যের সমস্ত বিষয়েরই বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গে রাজা আছেন, তাঁহার হয় হস্তী ও সৈন্য সামন্ত আছে, তাঁহার প্রমোদ কানন ও বিলাসিনীগণ আছে, তিনি কখনও কখনও শত্রু কর্ত্তৃক রাজচ্যুত হন, আবার যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া আপন রাজ্য উদ্ধার করেন, যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া মানবের ন্যায় তাঁহাকে কখনও কখনও শোক দুঃখে অভিভূত হইতে হয়, স্বর্গের রাজা স্বর্গবাসী প্রজাপুঞ্জের সদসৎ কার্য্যের বিচার করিয়া থাকেন, এবং উচিত বিধানে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন। ইহ জগতেও সেই রূপ দেখিতেছি, এই জগতের রাজাও পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক নরহত্যা করে, তাহা হইলে, রাজা কিম্বা রাজপ্রতিনিধি বিচার করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিয়া থাকেন, এবং কোন্ দিন বধ্য ভূমিতে তাহার প্রাণান্ত হইবে, তাহা অবধারিত করিয়া দেন। কিন্তু আমাদিগের যে কবে প্রাণান্ত হইবে, তাহার দিন অবধারিত নাই; সেই জন্য সকলে মৃত্যুর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া চিরজীবীর ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এটি সৃষ্টিকর্ত্তার একটি চমৎকার কৌশল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু অজ্ঞান লোকেরাই তাঁহার সেই কৌশলে ভুলিয়াছে, তত্ত্বদর্শী লোককে তিনি ভুলা-

ইতে পারেন নাই। তত্ত্বদর্শী লোকেরা সংসারকে নিতান্ত মায়াময় জ্ঞান করিয়া প্রতিক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। জ্ঞানবলে তাঁহারা জীবন ও মৃত্যুকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা শরীরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যেমন সমুদ্র জলের ঘোর আবর্ত্তনে বুদ্‌বুদ্ সৃষ্ট হইলে, সেই গুলি কিয়ৎক্ষণ জলে ভাসিয়া আবার জলেই লয় প্রাপ্ত হয়, আমাদিগের এই নর দেহও সেই রূপ। ভূতগণ সর্ব্বদা সংসার আবর্ত্তনে ঘুরিতেছে, সেই আবর্ত্তন হইতে জল বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রাণী সকল সমুৎপন্ন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ এই সংসার ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিয়া আবার সেই ভূতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহাদিগের এই রূপ জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া প্রতিক্ষণ চরম ভাবিয়া থাকেন, মোহে মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই লিপ্ত হন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধনই বল, কিম্বা স্ত্রী পুত্র পরিবারই বল, ইহা কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নহে, কেবল মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার 'আমারা আমার' করিতেছি। জ্ঞানীরা জ্ঞান অস্ত্রে সেই মা াজাল ছিন্ন করিয়া এই সংসারের কিছুতেই লিপ্ত হন না,—অর্থাৎ 'আমার' বলিয়া ধরেন না। আমরা প্রতিক্ষণ দেখিতেছি, যে, সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,—আজ এক ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চ পদারূঢ় হইল, তাহার সম্পদের সীমা রহিল না, ধনগর্ব্বে সংসারের লোককে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল, ধনের অহঙ্কারে মৃত্যু একেবারে ভুলিয়া গেল; কিছু দিন পরে, আবার সেই ব্যক্তিই অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিল। কিছু কাল পূর্ব্বে যে স্থানে নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল

স্থানে শস্যক্ষেত্র হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল মহাবীরের বীরদর্পে ধরিত্রীর হৃৎকম্প হইয়াছিল, যাঁহারা সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য নির্দ্দয় হৃদয়ে অসংখ্য মহাপ্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুরাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা মাত্র তাঁহাদিগের নাম রক্ষা করিতেছে।

এই সংসারে ভূত সমষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, তাহারা স্বভাবের আবর্ত্তনে অবিরত ঘুরিতেছে। সেই ভূত সমষ্টির একত্র সংযোগের নাম জন্ম, এবং বিয়োগের নাম মৃত্যু। পাঠকগণ, অনেকেই কাগজ প্রস্তুত করণের যন্ত্র দেখিয়া থাকিবেন। সেই যন্ত্রের প্রথম প্রক্রিয়ার স্থানে একটি প্রকাণ্ড চৌকা আছে, সেই চৌকাটি নানাবিধ উপকরণে পরিপূর্ণ। জল ও অগ্নির শক্তিতে তৎসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া যন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। নানা প্রক্রিয়ার পর তাহা হইতে এক খণ্ড কাগজ নির্গত হইয়া থাকে। সেই কাগজ খণ্ড মনুষ্যের হস্ত গত হইলে, কার্য্য গতিকে তাহার নানা অবস্থা ঘটে; নির্দ্দিষ্ট কালের পর তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সে সময় কেহ বা দগ্ধ করিয়া ফেলে, কেহ বা খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তৎকালে আমরা ভাবিয়া থাকি যে, দাহন দ্বারা কাগজ খণ্ড বিনষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু তাহার একটি পরমাণুও নষ্ট হইল না। পূর্ব্বে যে ভূত সমষ্টি হইতে সেই কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল, দগ্ধ করিবার সময়ে সেই ভূত সমষ্টি আপন আপন অংশ আকর্ষণ করিয়া লইল। আমাদিগের এই ভৌতিক দেহ সমুৎপন্ন হইবার প্রক্রিয়াও সেই কাগজ প্রস্তুত করণ যন্ত্রের সমতুল্য। আমরা যে সকল সামগ্রী আহার করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে ভূত সমষ্টি আশ্রয় করিয়া আছে। আহার সামগ্রী

উদরস্থ হইল, পাক যন্ত্রে পরিপাকের পর শরীর রক্ষার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা নানা স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কতক রক্ত হয়, কতক মাংস হয়, কতক অস্থি হয়, অবশেষে অসারাংশ মলরূপে নির্গত হইয়া যায়। রক্ত হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়, সেই বীর্য্য শোণিত সংযোগে একটি বুদ্‌বুদাকার ধারণ করে। তাহার পর, জননীর আহারের সাহায্যে সেই বুদ্‌বুদাকারের ক্রমে ক্রমে অবয়ব গঠিত হইতে থাকে,—অর্থাৎ আহারীয় দ্রব্যের সার ভাগ শরীরস্থ যন্ত্রের নানা প্রক্রিয়া দ্বারা সেই উদরস্থ জীবের রক্ত মাংস ও অস্থি প্রভৃতির পুষ্টি সাধন করিতে থাকে। শোণিত শুক্রের সংযোগ অবধি জীব শরীরের সম্পূর্ণ অবয়ব গঠন পর্য্যন্ত জননীর এক জঠর যন্ত্রে যে কত প্রকার প্রক্রিয়া হইতে থাকে, তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। জীবের জঠরে জীবের সৃষ্টির ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট জীব সমূহের মধ্যে আমিও একটি জীব। আমি কি জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, না হইলেই বা সংসারের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইত, এ পর্য্যন্ত তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে, আমা দ্বারা আর কতকগুলি মহাপ্রাণীর কিছু না কিছু সাহায্যের জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের কীটানুকীটের দ্বারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধিত হইতেছে, তখন আমার উৎপত্তিরও অবশ্য কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহাতে সংশয় নাই।

এক্ষণে আমি কে? তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই দেহ কি আমার ? না, 'আমি' শব্দের অন্য কোনও অর্থ আছে ? এই ভৌতিক দেহে যদি আমার আমিত্ব থাকিত, তাহা হইলে, এ শরীর কখনই স্বভাবের বশীভূত হইয়া চলিত না। যখন এই শরীরকে আমি 'আমার' বলিয়া গর্ব্ব করি, হয় ত, তৎক্ষণাৎ আমার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে পারে। আমি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, অদ্য নদী তীরে সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে যাইব ; কিন্তু বাটী হইতে বহির্গত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়াতে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। শরীরের এক অঙ্গে পীড়া উপস্থিত হইল বলিয়া অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল ; সুতরাং অভীষ্ট সমীরণ সেবনে আর বহির্গত হইতে পারিলাম না। এক জন ভৃত্যের উপর আমার যত দূর আধিপত্য চলে,তাহার শতাংশের একাংশও আপন শরীরের উপর চলে না। শরীর প্রকৃতির বশীভূত হইয়া যাহা করিবে, আমাকে তাহারই অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। তবেই শরীরের উপর আমার 'আমিত্ব' নাই। তবে আমি কে ? এই সম্বন্ধে মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করা গেল ;—

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শঙ্করাচার্য্য এক জন ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে যখনই যে প্রশ্ন করিতেন, তিনি দ্বি ভাবে তাহার উত্তর দিতেন। এক দিন এক জন পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— মহাত্মন্, আপনি কে, তাহা কি স্থির করিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, 'স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপো মহাত্মা।' পণ্ডিতবর পুনরায় বলিলেন, সে কি রূপ ? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, যেমন

বহুসংখ্য সরাব স্থিত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বহু-সংখ্য সূর্য্য পরিদৃশ্যমান্ হন, আমিও সেই রূপ ঈশ্বরাত্মার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। যেমন কুম্ভকারেরা মৃত্তিকার সরাব প্রস্তুত করিয়া থাকে, স্বভাব আমার এই শরীরটিও সেই রূপ পঞ্চ ভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর আত্মা রূপে এই দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। যেমন জল পরিপূরিত সরাবগুলি একটি যষ্টি দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্টি গোচর হয় না, এবং সরাবের উপর যে আঘাত পড়ে, তাহা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই রূপ এই নশ্বর শরীর যখন বিনষ্ট হয়, তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্যাংশও ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। মনুষ্য শরীর ধ্বংস দ্বারা আত্মার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তিনি যে রূপ সেই রূপেই থাকেন।

অবিনশ্বর আত্মাই বা কে? এ রূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে,—শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সংশয় শূন্য বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই আত্মা বলা যায়। সেই আত্মা সামান্য বুদ্ধির অগোচর, অথচ সর্ব্বত্র বিরাজমান। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে, অথচ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, কেবল ত্বক্ দ্বারা অনুভব করিতে পারি, সেই রূপ আত্মার অস্তিত্ব কেবল তত্ত্বদর্শী মহাত্মা লোকেরা মনে ধারণা করিতে পারেন; এতদ্ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আর উপায়ান্তর নাই। যদি কোনও তার্কিক লোক বলেন যে, আমি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না; তাহা হইলে, প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। আত্মার অস্তিত্ব

যিনি স্বয়ং না বুঝেন, তাঁহার সে বিষয় প্রতীতি করান কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব উভয়ই সহজে কাহারও বোধগম্য হয় না। ঈশ্বর কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান কোন্ কালে কাহার হইয়াছে? তর্ক দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় কখনই হইতে পারে না। বিশ্বাস ব্যতিরেকে সেই বিশ্বপতিকে প্রাপ্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই। এই জগতের সৃষ্টি কৌশল আলোচনা করিয়া যাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের অবশ্যই এক জন সৃষ্টি কর্ত্তা আছেন,—তিনি অনাদি,অনন্ত, সর্ব্ব ব্যাপী, তুলনা রহিত, পবিত্র চৈতন্য স্বরূপ, এবং তিনিই আত্মা রূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন,—তিনিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, এবং তাহা হইলেই তাঁহার আপনা আপনি আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হইবে। তখন তিনি জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, এই সংসারের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সেই পরমাত্মার অংশ মাত্র। আমরা নিরন্তর মায়া মোহে বিমোহিত হইয়া নানা রূপ কল্পনা করিতেছি, নানা পথের পথিক হইতেছি। যে সকল বস্তু আমার নহে, সেই সকল বস্তুই 'আমার আমার' করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছি; কিন্তু আত্মার আমি, ও আত্মা আমার, ইহা ভিন্ন আমি কাহারও নহি, এবং আমারও কেহ নহে।

জগৎ আত্মাময়, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, মন নির্ম্মল হয়, এবং কিছুই অপবিত্র বলিয়া বোধ হয় না। আত্ম পর বিবেচনাই মনোমালিন্যের ও শান্তি ভঙ্গের একটি প্রধান কারণ। যাঁহাদিগের সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ গুণের প্রভাবে

ইহ সংসারে কাহাকেও পর দেখেন না। আপন সন্তানের প্রতি যে রূপ স্নেহ করেন, একটি নিকৃষ্ট প্রাণী, যাহাকে স্পর্শ করিলে, পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে পাপ স্পর্শ হয়, তাহাকেও সেই রূপ স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুক্কুর পঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে আত্মোদ্ধার করিবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। তদ্দৃষ্টে দয়ার্দ্র চিত্ত শঙ্করাচার্য্য সেই গভীর পঙ্ক পূরিত দুর্গন্ধময় স্থানে গিয়া কুক্কুরটিকে ক্রোড়ে লইয়া শুষ্ক ভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং তথা হইতে স্কন্ধে তুলিয়া একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলাশয়ে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ তনয়কে এরূপ নিকৃষ্ট পশুর সেবা করিতে দেখিয়া ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, ওহে অবোধ ব্রাহ্মণ! তুমি কি করিতেছ? যে কুক্কুর স্পর্শ করিলে, ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হয়, তুমি সেই কুক্কুরের গাত্রের কম্প ধৌত করিতেছ? তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই। তৎশ্রবণে শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া বলিলেন, "তত্ত্বজ্ঞানপথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থ পূর্ণ বাক্যটি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই ব্রাহ্মণ ত সামান্য ব্যক্তি নহে; এই সামান্য একটি কথায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সারাংশ সঙ্কলন করিল। ব্রাহ্মণ নীর হইতে তীরে উঠিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কে, আমাকে পরিচয় দাও। শঙ্করাচার্য্য কহি-

লেন, আমি কুক্কুরের ন্যায় ঈশ্বরের একটি সৃষ্ট জীব। আমি কুক্কুর স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি এই মাত্র যে ভৎ র্সনা করিলেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, ও যে তত্ত্বপথের পথিক হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোনও বিধিও নাই, এবং কোনও নিষেধও নাই। শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অজ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে কোনও কাথাইর্লিপিবদ্ধ হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ, আমাদিগের এই শরীর ভূত সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট, ইহা আপনি অবশ্য স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ" বোধ হয় এ মহাবাক্যেরও অবমাননা করেন না; তবে কুক্কুর স্পর্শে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হইবে কেন? আপনাকে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ,পড়িয়া শুনিয়া কি তোমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে? ভূদেব ব্রাহ্মণ শরীরে ও ঘৃণিত পশু কুক্কুর দেহে কি প্রভেদ, তাহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, মহাশয়, পড়িয়া শুনিয়া যত দুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে কুক্কুরের সহিত আমার কি প্রভেদ এরূপ কথা কিছুই পাই নাই; এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, "যত্র জীব স্তত্র শিবরূপেণ নারায়ণঃ", এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমিও নারায়ণ, আপনিও নারায়ণ, এবং এই কুক্কুরও নারায়ণ। মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কুক্কুর পঙ্কে পড়িয়া প্রায় গতাসু হইয়াছিল, বহু যত্নে আমি ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। এই দয়া কার্য্য দ্বারা পুণ্যের না হইয়া কুক্কুর স্পর্শজনিত আমাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,

নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করাতে ধর্ম্ম আছে, এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার করি; তাহা বলিয়া কি কুক্কুরকে অস্পর্শীয় পশু বলিয়া স্বীকার করিব না? কুক্কুরের সেবা শুশ্রূষা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম আছে, তৎসমুদয় অগ্রে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট জাতিরাই কুক্কুরের সেবা করিবে, ব্রাহ্মণের পবিত্র হস্ত দেব সেবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব হে বিপ্র তনয়! তুমি কুক্কুরের প্রাণ রক্ষা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, কুক্কুর স্পর্শজনিত পাপ তাহা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া জানিও। অতএব ঐ ঘৃণিত পশুকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে গঙ্গা স্নান করিয়া আইস, এবং ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ স্মরণ কর; নচেৎ সন্ধ্যা বন্দনাতে তোমার কোনও অধিকার থাকিবেক না, তোমার এক্ষণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, এক কুক্কুর স্পর্শেই আমার ব্রাহ্মণত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে আমি চণ্ডাল হইয়াছি। এক্ষণে সুরধুনী সলিলে এই পাপ দেহ ধৌত করিলে, পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইব। সুরধুনীর পবিত্র সলিল যখন চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিতে পারেন, তখন অদ্য আমি শতাধিক চণ্ডাল সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইব, এবং আমার সহিত তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ করিয়া আনিব। স্নানে যাইবার সময় এই কুক্কুরকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, গঙ্গাজলে ধৌত করিলে, ইহারও কুক্কুরত্ব থাকিবে না।

শঙ্করাচার্য্যের এই তর্কপূর্ণ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি উন্নত স্বরে বলিলেন, রে অবোধ বালক! তুই আমার সহিত কি সাহসে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্?

তুই কি জানিস্ না যে, জন্ম জনিত অপকৃষ্টতা গঙ্গা জলে ধৌত হইতে পারে না ? শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে জন্ম জনিত উৎকৃষ্টতাও কুক্কুর স্পর্শে নষ্ট হইতে পারে না। আমি যখন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন কুক্কুর স্পর্শে সে ব্রাহ্মণত্বের হানি হইবে কেন ? অনুমানে বোধ হইতেছে, আপনি এক জন পৌরাণিক। পৌরাণিকদিগের অযৌক্তিক অসংলগ্ন কথাতেই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ভাল, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি জন্ম জনিত দোষের কিছুতেই ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে, অষ্টাদশ পুরাণকর্ত্তা বেদব্যাস ধীবর কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইলেন ? মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবীর্য্যে সমুদ্ভূত হইয়াও কি জন্য মাতৃ জনিত দোষে দূষিত হইয়া রহিলেন ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, বেদব্যাস সাক্ষাৎ নারায়ণ, তিনি বেদার্থ প্রচার করিবার জন্যই অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহার জন্ম বিষয় লইয়া তর্ক করিলে, আমরা পাপ পঙ্কে নিপতিত হইব। তুমি নিতান্ত বালক, শাস্ত্রের ভাবার্থ কিছুই বুঝ না ; এই জন্য অনর্থক তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি জন্য ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়াছিলেন ? স্বয়ং নারায়ণ সংসারের উপকার সাধন জন্য যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, সে সকল বিষয় লইয়া তর্ক করায় কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার কার্য্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বেদব্যাস যে সামান্য মনুষ্য নহেন, অষ্টাদশ পুরাণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, পুরাণ লইয়া অনর্থক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই ; কারণ পুরাণই কাল প্রভাবে সকল অনিষ্টের

মূল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বহুদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইতি পূর্ব্বে অস্বীকার করেন নাই যে,আপনি পুরাণ ব্যবসায়ী; সুতরাং পুরাণে আপনার বিলক্ষণ বোধাধিকার আছে,তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পুরাণ যুক্তি ও মুক্তি পথের কন্টক,তাহা লইয়া আমার তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,'তুমি আমার সহিত অত্যন্ত ধৃষ্টতা করিতে আরম্ভ করিতেছ। পুরাণ মুক্তি পথের কন্টক কিসে হইল? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই কুক্কুরের এমন নীচ জন্ম কেন হইয়াছে? ব্রাহ্মণ সদর্পে বলিলেন, পূর্ব্ব জন্মে কঠোর পাপ করিয়াছিল, তাহাতেই এই জন্মে কুক্কুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে। তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক পুণ্য করিয়াছিলে, তাহারই ফলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন,মহাশয়, কি পাপে কুক্কুর জন্ম হয়? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাহারা দেব দ্রব্য অপহরণ করিয়া খায়, ব্রাহ্মণ সেবার অগ্রে ভোজন করে, তাহারাই কুক্কুর হইয়া জন্ম গ্রহন করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু আদিতে কি ঈশ্বর উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি করেন নাই? যদি তাহা করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, প্রথমে পাপ ব্যতিরেকে কি জন্য কুক্কুরের সৃষ্টি হইল? বিষ্ঠাভোজী কীটানুকীটেরও আদি কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। পাপ ব্যতিরেকে এই সকল নিকৃষ্ট প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া কি আপনার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়? ব্রাহ্মণ বলিলেন,আদিতে সকল প্রাণীই পবিত্র ছিল,কেবল কালের

প্রভাবে প্রাণিপুঞ্জের পুণ্যের ধ্বংস হইয়া পাপের বৃদ্ধি হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, আপনার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি বিস্তারে বুঝাইয়া দিন যে, আদি কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে পাপ পুণ্যের কথা উল্লেখ আছে কি না? ভিন্ন ভিন্ন যুগে পাপ পুণ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ আছে কি না? ব্রাহ্মণ বলিলেন, যুগ ভেদে, কাল ভেদে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। সত্য যুগে ধর্ম্মাধর্ম্মের যে রূপ নিয়ম ছিল, পাপের যে রূপ দণ্ড বিধান ছিল, ত্রেতায় তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; দ্বাপরে তদপেক্ষা ন্যূন হয়, কিন্তু কলিতে সত্য যুগের নিয়ম আর কিছুই নাই; কারণ, এক্ষণকার লোকের অল্প আয়ু ও অল্প ভোগ। সুতরাং, সত্য ও ত্রেতার ধর্ম্মানুষ্ঠান কলিযুগের লোক কি প্রকারে করিবে? এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা পৃথক্ পৃথক্ যুগের পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, তবে কি সমুদয় শাস্ত্রই মনুষ্য প্রণীত? শাস্ত্রকারেরা কি লোকের অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন? কেননা, আমার জ্ঞানগুরু বলিয়াছেন যে, সত্যের কোনও কালে পরিবর্ত্তন নাই, সত্য অনন্ত কাল সত্যই থাকিবে। যাহা কাল্পনিক, তাহা দেশ ভেদে, কাল ভেদে অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সেই সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আত্মাময় ঈশ্বর আদিতে যে রূপ ছিলেন, অন্ত কালেও সেই রূপ থাকিবেন, কোনও কালেই তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই। এই কথাই সত্য, এবং এই সত্য কথা লইয়া যাঁহারা সেই আত্মাময় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই যথার্থ ঈশ্বর পরা-

য়ণ সাধু ব্যক্তি। এই সহজ কথায় বিশ্বাস করিলে, সহজেই আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। তাহা না করিয়া কাল্পনিক ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠে মনকে বিব্রত করিয়া চির কাল ভ্রমপথে পরিভ্রমণ করা কি জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য কার্য্য? মহাশয়, পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঈশ্বর এক, আত্মাময়, ও সর্ব্ব ভূতের আশ্রয় স্থল। এই পরি-দৃশ্যমান্ জগতের তাঁহা হইতেই উৎপত্তি, এবং তাঁহাতেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নিষ্কাম হইয়া তাঁহার উপাসনা করাই প্রকৃত উপাসনা। সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বলির প্রয়োজন নাই। নির্জ্জনে একাসনে বসিয়া একমনে তাঁহাকে ধ্যান করিলে, আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মার উপাসনা কি, অজ্ঞ জনেরা তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই আড়ম্বর যুক্ত ধর্ম্মে স্বতঃই তাহাদের আস্থা হইয়া থাকে। অজ্ঞদিগকে আয়ত্তে রাখিবার জন্যই চতুর আর্য্য শাস্ত্রকারেরা আড়ম্বর যুক্ত ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং, সনাতন সত্য ধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে। মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, স্থির চিত্তে নির্জ্জনে বসিয়া সেই নিত্য ও সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে কয় জন লোকের ক্ষমতা আছে? যাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল, তাহারা কি একাসনে মুহূর্ত্ত কাল নির্জ্জনে অবস্থান করিতে পারে? কিন্তু আড়ম্বর যুক্ত ধর্ম্ম অজ্ঞ লোকের এত দূর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে যে, দেব দেবীর সম্মুখে অজ, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি বলিদান দিবার সময় তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত হইয়া যায়। রাজ-পথে হরি সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইলে, নৃত্য গীতে এত দূর উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, স্বেদজলে শরীর আর্দ্র হইয়া গেলেও, তাহারা

তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। উক্ত রূপ ধর্ম্মে রাগ, দ্বেষ, ও দম্ভ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র এই কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক ; উহা কর্ম্ম ফল দেখাইয়া অজ্ঞ লোককে নির্ব্বাণ মুক্তির পথ হইতে দূরস্থ করিয়া রাখিয়াছে ; তাহারা ভোগ বাসনায় না করিতে পারে, এরূপ কার্য্যই নাই। পুরা কালে অশ্বমেধাদি যজ্ঞে যুদ্ধ বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণান্ত হইত। প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ শত অশ্বমেধ করিয়া ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ করিতে কেহই ক্রুটি করেন নাই ; কিন্তু কস্মিন্ কালে কাহারও অদৃষ্টে ইন্দ্রত্ব সুখ ভোগ হয় নাই। নরপতিগণ দুরাশার দাস হইয়া অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। এক জনের ইন্দ্রত্ব লাভের নিমিত্ত অকারন অসংখ্য লোক কালের কবল শায়ী হইত। এই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধি নাই,তথাপি,স্বর্গভোগ কামনায় রাজগণ রাজসিক বিধানে শত শত ছাগ মেষ মহিষ প্রভৃতি দেব দেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া থাকেন। " অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ " এই মহাবাক্য কল্পিত স্বর্গলাভের জন্য সাধারণ লোকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কর্ম্ম করিয়া ফলভোগী হইব, এই দুরাশার দাস হইয়া এক্ষণকার লোক বাহ্য আড়ম্বরের সহিত কর্ম্ম করিবার মানসে উৎকট পাপ দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এক কর্ম্মই আমাদিগকে অনন্ত কাল সংসার আবর্ত্তনে ফেলিয়া রাখে। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। দুষ্ককর্ম্মই হউক বা সৎকর্ম্মই হউক, এক

বার মাত্র করিলে, কোটিকল্প তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। তন্ত্রে উক্ত আছে,—

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্॥"

যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে একটি মাত্র বৎস থাকিলে, সে তাহার নিজ মাতাকে জানিয়া লয়,—সেই রূপ কর্ম্মের ফলাফল দেহ হইতে দেহান্তরে গিয়া থাকে,—অর্থাৎ দেহীর পুনর্জ্জন্ম কোথা হইয়াছে, কর্ম্মফল বৎসের ন্যায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারে। ধন ব্যয়ে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কর্ম্মকাণ্ড করিয়াও মুক্তি হয় না। যত দিন জীবাত্মার ও পরমাত্মায় এক জ্ঞান না হইবে, তত দিন জীবের নির্ব্বাণ মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। কেবল এক ভোগাভিলাষের জন্যই মানবগণ কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকে। যদিও বেদে কর্ম্মকাণ্ডের কথার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহার রীতি পদ্ধতি স্বতন্ত্র। স্মৃতি শাস্ত্র বেত্তারা সেই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মানবের স্বর্গলাভের এত সুলভ উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অতি সামান্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, লোকের আর নরক যন্ত্রণার ভয় থাকে না। যেমন, লোকে এক বার মাত্র শিবরাত্রির ব্রত করিলে, মৃত্যুর পর শিবলোকে, ও অনন্ত ব্রতের ফলে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে, এবং যোগে গঙ্গাস্নান করিলে, কোটিকল্প স্বর্গভোগ করিবে; শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রলোভন আছে। স্মৃতি শাস্ত্রে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে কেবল ভোগের কথাই লিখিত হইয়াছে, নির্ব্বাণ মুক্তির সবিশেষ উক্তি নাই। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে, ভোগাভিলাষের জন্যই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়, কর্ম্ম

হইতে ক্রোধাদির উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে অভিমান, অভিমান হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, সেই অজ্ঞান ; এরূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করা সহজ ব্যাপার নহে।

বেদেও কর্ম্মকাণ্ডের কথার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু পৌরাণিকেরা শুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখাইয়া সাধারণ লোককে ভ্রমে নিপতিত করিয়াছেন। কর্ম্ম করিতে গেলেই, আপনা আপনি ঘোর আড়ম্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনও আধুনিক পুরাণে লিখিত আছে যে, কলিতে দুর্গোৎসব করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সেই জন্য কলিতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সত্ত্ব গুণান্বিত ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক ভাবে পূজায় ব্রতী হইলে, সাত্ত্বিক বিধানানুযায়ী পূজার সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন না ; সুতরাং দেবী পূজার অঙ্গহীনতা জন্য কৃতীকে দুষ্কৃতির ভাগী হইতে হয়। রাজসিক বিধানের পূজায় অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, ক্রোধ এবং দম্ভ মূর্ত্তিমান্ হইয়া দাঁড়ায়। তামসিক বিধানে কেবল বাহ্য আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছু নাই। তবেই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কলির অশ্বমেধ দুর্গোৎসব করিতে গিয়া উপাসকগণকে পদে পদে অধর্ম্মের ভাগী হইতে হয় কি না ? দুর্গা দেবীর ত্রিবিধ উপাসকেরাই এই বচনে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির কামনা করিয়া থাকেন যথা,—

"রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

উপরি উক্ত প্রার্থনায় "মুক্তিং দেহি" এরূপ কথা নাই।

কেনই বা থাকিবে ? যাহারা ভোগাভিলাষের প্রার্থী, তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তির প্রার্থনা করিবে কেন ? ভোগাভিলাষী হইয়া ইহ জগতে অবস্থান করিতে গেলে, আমরা কোনও অবস্থাতেই নির্ভয়ে ও শান্তির সহিত কাল হরণ করিতে পারি না। কারণ, ভোগে রোগ ভয় আছে, কুলে চ্যুতি ভয় হইয়া থাকে, বিত্তে চির কাল রাজাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, মানে দৈন্য ভয় আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে ; এতদ্ভিন্ন, বলে রিপু ভয়, রূপে নারী ভয়, শাস্ত্রে বাদী ভয়, গুণে খল ভয়, এবং শরীর ধারণে যম ভয় চির কালই আছে। কেবল আত্মতত্ত্বে মনো-নিবেশ করিলে, কোনও কালে কোনও ভয় থাকে না, যে স্থানে ভয় নাই, সেই স্থানেই শান্তি ও আনন্দ।

পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আত্ম-তত্ত্বদর্শী লোকেরাই একেবারে ভয়শূন্য হইয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের রাজ ভয় নাই, দস্যুভয় নাই, জাতি ভয় নাই। অন্য কি কথা, তত্ত্বদর্শী লোকেরা মরিতেও ভয় করেন না ; কেবল সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে কাল হরণ করেন। যাঁহারা এই সংসারকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহারা এই কুক্কুরকে কি বলিয়া অপবিত্র জ্ঞান করিবেন ? যাহার মন অপবিত্র, সেই এই সংসারে নানা অপবিত্র বস্তু দর্শন করেন। যাঁহার মন নির্ম্মল হইয়াছে, তিনি জগতের কোনও বস্তুই অপ-বিত্র জ্ঞান করেন না। মহাশয়, আপনার বয়স অধিক হই-য়াছে, মৃত্যুর অধিক কাল বিলম্ব নাই, এক্ষণেও আপনার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আপনি কি জানেন না যে, মহাপ্রলয় কালে এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বরে লয় পাইবে ? সে সময় কি তিনি

অপবিত্র বস্তুগুলি আপনাতে লয় পাইতে দিবেন না? বাছিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করিবেন? মহাশয়, যত দিন না আপনার অহংতত্ত্ব উদয় হইয়াছে, তত দিন আপনি তত্ত্বদর্শী লোকের কার্য্য দেখিয়া বিরক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সবিনয়ে কহিলেন, বাপু, তুমি কে, আমাকে যথার্থ পরিচয় দাও। তোমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সামান্য ব্যক্তি নহ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে প্রকৃত পরিচয় দেওয়াতে, ব্রাহ্মণ সেই দিন অবধি তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

পৃথিবীর চতুঃখণ্ডের মধ্যে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমির পুরা কালের পণ্ডিতগণ বিবেক ও বৈরাগ্যের উপর যত দূর সম্মান প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের লোক কর্ত্তৃক এরূপ হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ইউরোপ খণ্ডে বর্ত্তমান কালে বিবেক ও বৈরাগ্যের কথা এক দিনের জন্যও কোনও সমাজে উত্থাপিত হয় না। ভারতবর্ষে বিবেক ও বৈরাগ্যের নাম আছে, গ্রন্থ আছে, এবং অনেক আদর্শ-উপদেষ্টাও আছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেক ও বৈরাগ্য লোকের মনে উদিত হওয়া সুকঠিন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপ শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, আমরা শান্তি সুখের অধিকারী হইতে পারি। প্রথমতঃ, নীতি

শাস্ত্রের আশ্রয় লইলাম; কিন্তু তাহাতে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। বাল্যকালাবধি আমরা অনেক নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিলাম, ও নীতিজ্ঞ লোকের মুখে অনেক নীতি কথা শুনিলাম; কিন্তু তাহাতে ত আমাদিগের চিত্ত শুদ্ধি হইল না, হৃদয়ে শান্তি আসিয়া আশ্রয় করিল না। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মে রত হই, তাহা হইলেই, কি মন নির্ম্মল হইবে, চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হইবে? তাহাই বা কি রূপে সম্ভব বলিয়া ধরি। প্রথমতঃ, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম পালন অতিশয় আয়াসসাধ্য। ধর্ম্ম কর্ম্মের আয়োজন করিতেও লোকদিগকে যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সকল স্থানেই উপাসনা ভেদে এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সহিত চির কালই বাগ্বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, কোনও কোনও সময়ে এক সম্প্রদায় অস্ত্র ধারণ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্ম লইয়া সমরেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তবেই ধর্ম্মের জন্য যদি অস্ত্রধারী হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে, সে ধর্ম্মে বৈরাগ্য ও শান্তি কোথায় পাইব? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রেও শান্তি নাই। তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্ণকুটীরে বাস করিলে, বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তি আমার হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান হইবে? তাহারই বা সম্ভাবনা কই? পুরাণাদি পাঠ করিয়া দেখা গিয়াছে, মহর্ষিগণ চির কাল পবিত্র তপোবনে বাস করিয়াছেন, অনেক সময়ে হরীতকী, আমলকী ও গলিত পত্র ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করিয়াছেন, শীতে জল মধ্যে ও গ্রীষ্মে চারি দিকে অনল জ্বালিয়া তপশ্চরণ করিয়াছেন; এক কথায় বলিতে

গেলে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; তথাপি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অপ্সরাগণের চাতুরীজালে পড়িয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, কেহ বা সামান্য কারণে ক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া এক এক জন সদাশয় ও শরণাগত প্রতিপালক রাজার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আবার, দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ঋষি অন্য এক ঋষির সহিত শত্রুতা করিয়া তাঁহার পুত্র কলত্রাদির প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার ন্যায় কোপন স্বভাব ঋষি পুরাণাদি শাস্ত্রে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি ব্রহ্মতেজে ও তপোবলে লঘু পাপে লোককে গুরু দণ্ড দিতেন। পরাশর অনূঢ়া ধীবর কন্যাকে হরণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যদি অরণ্যে বাস, গলিত পত্র ভোজন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াও সংসারত্যাগী ঋষিদিগের এই রূপ বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলে, আমাদিগের কি ফল হইবে? যাহার শরীরে ক্রোধ আছে, কাম আছে, এবং হিংসা দ্বেষ আছে, তাহার মনে কি প্রকারে শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে? যাহার ক্ষমাগুণ নাই, তাহাকে বিবেকী কি প্রকারে বলিব? যাঁহারা মধ্যে মধ্যে রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া নরপতিগণের পূজা গ্রহণ করিতেন, তথায় কিঞ্চিন্মাত্র সেবার ত্রুটি হইলে, শাপ দিয়া আসিতেন, তাঁহাদিগের আবার বৈরাগ্য কোথায়? তবেই বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া অরণ্যে বাস করিলেও সর্ব্বতোভাবে শান্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। তবে কোথায় শান্তির দেখা পাইব? কি প্রণালীতে অর্চ্চনা করিলে, শান্তিদেবী আমার প্রতি প্রসন্না হইবেন? এই সংসারে কোনও কালে কেহই কি

শান্তি লাভ করিতে পান নাই? তবে তর্কের দাস হইয়া আমাদেরই কি সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে? যে সকল স্থানে অনুক্ষণ শান্তিদেবী বিরাজিত হইতেছেন, আমি মনোমধ্যে নিরর্থক তর্ক করিয়া কি সেই সকল স্থানের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতেছি না? নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে, যিনি যে রূপ বাসনা করেন, তাঁহার তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

যদিও গৃহ পরিত্যাগের বিরুদ্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম, তথাপি, মহানুভব ব্যক্তিবৃন্দের কথা একেবারে অলীক ও যুক্তি বিহীন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা চির কাল এক ভাবে বলিয়া আসিতেছেন যে, অরণ্যবাসী মুনি ঋষিরাই যে শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, গৃহীর পক্ষে কোনও কালেই তাহা ঘটিয়া উঠিবার নহে। এই সার কথার উপরেও অনেকে এরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, এক শান্তিসুখের জন্য সকলের সংসার ত্যাগ করা ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে; সকলেরই সংসারে বিরাগ হইলে, সংসার চলিবে কেন? এরূপ তর্কের উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, সংসার চলুক আর নাই চলুক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এত কাল যে চলিল, তাহাতেই বা সাধারণের কি উপকার হইয়াছে? সাধারণ কথায় যাহাকে সাংসারিক সুখ বলিয়া থাকে, সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিবার নহে। তবে জন কতক লোকের সুখের জন্য জগৎ শুদ্ধ লোক কষ্ট ভোগ করিবে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, দিল্লীশ্বর শাহ জাহানের ময়ূরাসন নির্ম্মাণ কালে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবার জন্য প্রায় সমস্ত ভারতবাসীকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়া-

ছিলেন। তবে কতিপয় রাজা ও প্রধান লোকের জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিবে কেন? যাহাদিগের সুখের সম্ভাবনা আছে, তাহারাই সংসার করুক। যাঁহাদিগের পক্ষে এ সংসার হিংস্রজন্তু পূর্ণ ভয়ানক অরণ্য তুল্য, তাঁহারা যে স্থানে শান্তিদেবী বিরাজমান আছেন, সেই স্থানে গিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করিবেন। যেখানে অনায়াসলভ্য ফল মূলে উদর পূর্ণ করিতে পাইবেন, সেই খানেই যাইবেন। যেখানে ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, অহঙ্কার নাই, দম্ভ নাই, আত্মগরিমা নাই, এবং পীড়ন নাই, সেই সুখময় ও শান্তিপ্রদ স্থানে গিয়াই জীবনের অবশিষ্ট কাল এক ঈশ্বরচিন্তায় অতি-বাহিত করিবেন।

যাহার ধন নাই ও প্রভুত্ব নাই, এ সংসার তাহার পক্ষে বিষ-ময় তড়াগ, প্রজ্বলিত অনলকুণ্ড ও কালসর্পের বিবর; এ ভয়া-নক স্থান তাহার পক্ষে আশু পরিত্যজ্য। যদি কেহ বলেন, অরণ্যের কষ্ট সংসারীরা সহজে সহ্য করিতে পারে না; এ কথা নিতান্ত অন্যায় ও অমূলক। ইহা সত্য যে, শয্যার অভাবে অরণ্য বাসীকে তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হয়, উপাধানের অভাবে বাহুর উপর মস্তক রাখিতে হয়, উপাদেয় বস্তুর অভাবে বনফল ও গলিত পত্র ভক্ষণ করিতে হয়, জলপাত্রের অভাবে অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিতে হয়, এবং গৃহের অভাবে গিরিগুহায় ও তরু-কোটরে বাস করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ধনহীন গৃহস্থেরা সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ত এই সকল কষ্ট ভোগ করে। উত্তম শয্যার অপ্রতুলে তাহারা তৃণশয্যায় (মাদুর বা কুশাসনে) শয়ন করে, উত্তম বস্ত্রের অপ্রতুলে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র

পরিধান করে, উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যথা কালে শাক সংযোগে কদন্ন ভোজন করে, উত্তম জলপাত্রের অভাবে মৃণ্ময়পাত্র ব্যবহার করে, আবার তাহাদের বাসগৃহ দেখিলে, তাহা অপেক্ষা গিরিগুহা শত অংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। নির্ধনের পক্ষে গৃহ অপেক্ষা বনের সমস্ত বিষয় অনায়াসলভ্য; কিন্তু গৃহে থাকিলে, সেই কদন্ন, তৃণশয্যা, ও ভগ্ন কুটীর প্রভৃতিও আয়োজন করিয়া লইতে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের সংসার অপেক্ষা অরণ্যে বাস যখন অধিক শান্তিপ্রদ, তখন এ সংসার তাহাদিগের পক্ষে আশু পরিত্যাগ করাই যুক্তি।

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, দারিদ্র্য অবস্থাপন্ন হইলেও একেবারে হতাশ হওয়া ও গৃহ ত্যাগ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। ধৈর্য্যের সহিত সাংসারিক কষ্ট সহ্য কর, এবং অধ্যবসায়ের সহিত আপনার উন্নতিকল্পে যত্নশীল হও, তাহা হইলে, সহস্র দরিদ্রের মধ্যে অন্ততঃ দশ জনেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ প্রশ্নের আর এক পক্ষীয় লোক এই প্রত্যুত্তর দেন যে, আমরা দরিদ্রের সন্তান বটি, কিন্তু বাল্যকালাবধি সমূহ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বিশেষ রূপে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছি; তথাপি, এ পর্য্যন্ত সমাজে আদরণীয় হইতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না? কতকগুলি পক্ষপাতী লোকে আমাদিগকে মস্তক উন্নত করিতে দিতেছে না। তাহারা মুর্খ ধনীদিগের যথেষ্ট পূজা করে, কিন্তু আমাদিগের দুঃখে দুঃখও প্রকাশ করে না; যে হেতু, আমরা সহায় ও সম্পদ্ বিহীন। যখন সম্পদ্ই সংসারের এক মাত্র পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন সম্পদ্ ও সহায় বিহীন লোকের কোনও কালেই উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

সংসার আমাদিগের দিকে চাহিল না, আমরা সংসারের দিকে চাহিব কেন? সংসারে থাকিয়া সামান্য অর্থের জন্য নীচাশয় ধনীদিগের স্তুতি পাঠ করিয়া বেড়াইব কেন? আমরা সংসারের সমস্ত সম্পদ্ ও সহায় বিহীন লোক লইয়া অন্যত্র বাস করিব। ধনীরা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনারাই প্রস্তুত করিয়া লউক। ধনীর আধিপত্য ধনীরাই দেখুক, আমরা স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে আত্মা ও মন সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, তথাপি, এ পাপ সংসারে থাকিব না।

পাঠকগণ, এরূপ ভাবিবেন না যে, জগৎ শুদ্ধ লোক সংসারে অশ্রদ্ধা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিবে। কাহার সাধ্য এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করে! কখনও কখনও দুই চারি জনের মনে সংসার বৈরাগ্য উদয় হয় সত্য, কিন্তু সে মনের ভাব অতি অল্প কালেই লোপ পাইয়া থাকে। যখন সংসারে বিলক্ষণ অপ্রতুল হইয়া পড়ে, উত্তমর্ণগণ তাড়না করিতে আরম্ভ করে, গৃহিণীর বাক্যবাণে শরীর জর্জ্জরীভূত হয়, সেই সময় এক এক বার মনোমধ্যে ক্ষণপ্রভার ন্যায় সংসার ত্যাগের কল্পনা উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই অপ্রতুল কিছু মাত্র হ্রাস পাইলেই, আর পূর্ব্বের ভাব স্মরণ হয় না। এক মায়াই হইয়াছে আমাদিগের চরণের দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সংসার ত্যাগ করা কি সামান্য জ্ঞানের কার্য্য? পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন রাজা তাঁহাদিগের বিপুল বিভব ও বিস্তীর্ণ রাজ্য সত্ত্বেও সংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই যথার্থ বিবেকী, এবং তাঁহা-

রাই বৈরাগ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া গিয়াছেন। যাহাদিগের বান্ধব নাই, বিভব নাই, এক কথায় সংসারে কিছু মাত্র সুখ নাই, তাহারাও যদি কখনও হয়, এই এক আশার উপর নির্ভর করিয়া দুঃসহ দুর্দ্দশা ভোগ করে, তথাপি, এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিতে চাহে না। আশার কি চমৎকার শক্তি! আশা কল্পতরু হইয়া নির্ধনকে ধন দিতেছে, পুত্রহীনকে পুত্র দিতেছে, চির রোগীকে সুস্থ করিতেছে, এবং চিরবিরহী দম্পতীর একত্র সম্মিলনে তাহাদিগের দুর্ব্বিষহ বিরহ বেদনা এক কালে দূর করিয়া দিতেছে। যিনি এই আশাকে মানবের মনে আবির্ভূত করাইয়াছেন, তিনিই ধন্য। যদি এই আশা ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকের মনে না থাকিত, তাহা হইলে, অক্লেশে বহুসংখ্য লোক এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যে নিবিড় অরণ্যে বাস করিত, তাহাতে আর সংশয় নাই।

যত ক্ষণ লোকে স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিবে, তত ক্ষণ কেহই শান্তি ভোগ করিতে পাইবে না। এক স্বার্থ হইয়াছে আমাদিগের মনঃপ্রাণ আকুল করিবার প্রধান হেতু। যেমন বিষ্ণু দশ অবতার রূপে সংসারের লোককে বিমোহিত করিয়াছিলেন, ও ভগবতী দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া মহাযোগী মহাদেবের মন আকুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রূপ এক স্বার্থই এই সংসারে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোহান্ধ ব্যক্তিবৃন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। যদি স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে, অনেকাংশে মোহান্ধকার দূর হইবে, বৈরাগ্য আসিয়া আপনা আপনি মনোমন্দিরে উদিত হইবে, এবং চিত্ত স্থির ভাব ধারণ করিবে। কেবল এক স্বার্থ লইয়াই সংসারে অনুক্ষণ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইতেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ

কেন ? স্বার্থের জন্য ; জ্ঞাতি বিরোধ ও ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত হয় কেন ? স্বার্থের জন্য ; বিদেশ বাসে মহাকষ্ট ভোগ করিতে হয় কেন ? কেবল এক স্বার্থের জন্য ; লোকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্ব হরণ করিতে উদ্যত হয় কেন ? পরপীড়ক হয় কেন ? পরদার হরণ করে কেন ? স্বার্থ ভিন্ন ইহার আর কিছুই কারণ নাই। সেই স্বার্থ একেবারে পরিত্যাগ কর, অনেকাংশে মন শান্ত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নীতি শিক্ষায় মনের শান্তি হইবে না, কাল্পনিক ধর্ম্ম কর্ম্মে মনের শান্তি হইবে না, নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও শান্তির দর্শন পাইবে না, অরণ্য বাসেও একেবারে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইবে না। সুযোগ পাইলেই মন মত্ত হইবে, মনের দোষে দীর্ঘ কালের জপ তপ এক দিনে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া একেবারে শান্তি ভোগ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া ধরিতে হয়। তবে কি শান্তি ভোগের উপায় নাই ? আছে, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করা সামান্য লোকের কার্য্য নহে। অগ্রে আপনার মনকে পরীক্ষা কর, মনকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত কর, তাহার পর শান্তি ভোগের আশা করিও। মনুষ্যের মন দিল্লীর দুর্বৃত্ত বাদশাহদিগের অপেক্ষাও অশাসিত, মত্ত মাতঙ্গ অপেক্ষাও দুরন্ত। এই ভয়ানক মনকে যদি কায়মনোযত্নে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলেই বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তির দর্শন পাইবে।

ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার, এবং ভোগবাসনার নিবৃত্তি না হইলে, এই সংসারকে কখনই মায়াময় ও অসার জ্ঞান হয় না। শাক্য সিংহের মনে প্রথমতঃ এই রূপ চিন্তা উপস্থিত

হয়, আমি পিতৃ রাজ্যের অধীশ্বর হইব, আমার ভাণ্ডার ধন রত্নে পরিপূর্ণ হইবে, সহস্র সহস্র লোকের উপর আমি একাধিপত্য করিব, প্রজাপুঞ্জ আমাকে ধার্ম্মিক ও প্রজা বৎসল ভূপাল বলিয়া অনুরাগ করিবে, তথাপি, আমার মনে শান্তির উদয় হইবে না। এক্ষণে এই সকল সুখ সম্ভোগ নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে। যদিও আমি রাজা হইব, সংসারে প্রভুত্ব লাভ করিব, আমার ভাণ্ডারে ধনের অপ্রতুল হইবে না, যখন যাহা অভিলাষ করিব, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে; কিন্তু আমি ইহা এক বার ভাবিতেছি না যে, আমাকে এক দিন মৃত্যু মুখে পতিত হইতেই হইবে। রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু এই চারটির হস্ত হইতে আমি কখনই নিস্তার লাভ করিতে পারিব না। কেবল আমি পারিব না এরূপ নহে, মানব মাত্রেই পারিবে না; ঐ চারিটি বিষয় ক্ষুদ্র ভদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা, উচ্চ নীচ এবং ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান; কাহারও প্রতি অনুকূল এবং কাহারও প্রতি প্রতিকূল নহে। যদি সংসারের নিয়ম এই রূপ হইল, তখন আমাতে ও এক জন পর্ণশালা নিবাসী ভিক্ষুকে প্রভেদ কি? তাহার যদি শরীর সুস্থ হয়, আর আমি রাজ্যেশ্বর হইয়াও যদি আমার শরীর রুগ্ন হয়, তাহা হইলে, আমার অবস্থা তাহার 'অবস্থা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিকৃষ্ট বলিয়া ধরিব। যখনে ইহ সংসারে জরা, মৃত্যু, রোগ, ও শোক হইতে কাহারও নিস্তার নাই, তখন আবার রাজা প্রজায় প্রভেদ কি? রাজা বলিয়া আমি যে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করি, কল্য শোকে উত্তপ্ত হইলে, সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ বিষবৎ বোধ হইবে। এই শরীর জরা জীর্ণ হইলে, এই অখণ্ড

ভূমণ্ডলের একাধিপত্য পাইলেও সাংসারিক সুখ ভোগের কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকিবে না। শরীরের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়িবে, মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান অস্থান বোধ থাকিবে না, উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিলেও তাহা পরিপাক পাইবে না, শ্লেষ্মাতে শরীর আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, এবং জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যাইবে। আমার এই শরীর জরায় জীর্ণ হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই; কিন্তু ভোগাভিলাষ সম ভাবে থাকিবে; বিষয় বাসনা কিছু মাত্র তৃপ্ত হইবে না। নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি, অতি অল্প কালের মধ্যেই এই জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে; তথাপি, রাজ ভাণ্ডারের বিপুলার্থের কিয়দংশও সজ্জনের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতে পারিতেছি না। যদিও দিন দিন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কিন্তু আমি অজর ও অমরের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমার কি কিছু মাত্র বিবেচনা শক্তি নাই? কাহার জন্য আমি ধন সঞ্চয় করিতেছি? কাহার জন্য আমি এই বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা চরম কাল ও পরোপকার বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি? আর না, আর না। পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধুরা মোহ পাশে বন্ধন করিয়া আমাকে বিলক্ষণ খাটাইয়া লইতেছেন। এক্ষণে আমি এই মোহ পাশ ছিন্ন করিলাম, রাজ্যধন তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া চলিলাম।

শাক্য সিংহের মনে এই রূপ চিন্তার উদয় হওয়াতেই তিনি মোহপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বাল্য কালে নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই মনঃক্ষেত্রে বিবেক ও বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনি যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে বৈরাগ্য ধর্ম্ম যাজন

করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু শাক্য সিংহের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। রাজ্য ভোগের পর কঠোরতা অবলম্বন করা সহজ ব্যাপার নহে।

যে দুই জন মহাত্মার কথা উপরে বর্ণিত হইল, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগেরই মনে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে গৃহত্যাগে অনেক কপটতা দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যেরূপ ভণ্ড যোগী ও সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, পৃথিবীর আর কোনও বিভাগে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কোনও রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, গৃহত্যাগীর আধিক্যই ভারতবর্ষের অবনতির একটি প্রধানতম কারণ। পূর্ব্ব কালের ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা চরম বিবেচনা না করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মের বিলক্ষণ পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গৃহস্থের দ্বার হইতে যদি অতিথি বিমুখ হয়, তাহা হইলে, গৃহস্থের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডের ফল লোপ হইয়া চরমে অধোগতি হইবে; এই জন্যই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা যে কোনও প্রকারে হউক অতিথির বাসনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হন। শাস্ত্রকারেরা ভিক্ষাজীবী লোকের পক্ষে এই রূপ নানা অনুকূল নিয়ম করিয়াছেন বলিয়াই, অধুনা ভারতবর্ষে এতাধিক কপট বৈরাগী ও ভিক্ষুকের আধিক্য হইয়া উঠিয়াছে। কপটীদিগের দৌরাত্ম্য এত দুর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, গৃহস্থগণ আর শাস্ত্রীয় নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অনন্ত স্বর্গ লাভের সোপান বলিয়া অবধারিত ছিল; কাল প্রভাবে সেই ধর্ম্ম অলসদিগের জীবন ধারণের একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বিষয় বাসনায় অগ্নি দিয়া

বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল মাত্র উদরের জন্য তাঁহারা যদি গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই রূপ অতিথিকে বিমুখ করিলে, গৃহস্থগণের পাতক আছে; কারণ, উদাসীনগণের সাহায্যার্থে শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে নানাবিধ বিধি দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল বিধি অনুসারে চলিতে গেলে, এক্ষণে গৃহস্থ লোক-কেই বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভিক্ষাজীবী লোকের ভিক্ষার সময় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে সেই ভিক্ষার কালাকাল নাই। রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময়েও ভিক্ষুকগণ 'দেহি দেহি' রবে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। শাস্ত্রকারেরা যে অভিপ্রায়ে ভিক্ষা দানের পোষকতা করিয়া গিয়াছিলেন, কাল প্রভাবে তাহা বিপরীত হইয়া উঠিতেছে। এই সময়ে ভিক্ষা একটি ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা সঞ্চয় না করিয়া কেবল উদরের জন্য ভিক্ষা করে, তাহারাই যথার্থ ভিক্ষা প্রাপ্ত হইবার পাত্র; কিন্তু সেরূপ ভিক্ষুক অতি বিরল। দ্বাদশ জন গৃহস্থের গৃহে দ্বাদশ মুষ্টি ভিক্ষা করিলেই এক জন লোকের পর্য্যাপ্ত ভোজনোপযোগী তণ্ডুল সংগৃহীত হইতে পারে, শাস্ত্রকারেরাও তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোনও স্থানে লিখিত আছে যে, ভিক্ষুকেরা এক দিনের পর্য্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে, ইহার অধিক সঞ্চয় করিলেই তাহাদিগকে গৃহস্থের মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়; সুতরাং, তাহারা রাজকর দিতে বাধ্য হইবে।

আমাদিগের শাস্ত্রের অভিপ্রায় কোনও ক্রমেই মন্দ বলিতে পারি না; কেবল কাল মাহাত্ম্যে লোভের আধিক্য হইয়া

উঠাতে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বিনষ্ট হইয়া গেল। অতিথি বিমুখ করিও না,—এই শাস্ত্রোপদেশ কয় জন গৃহস্থ প্রতিপালন করিতে পারেন? গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, ধনীরাও সর্ব্বতোভাবে এক্ষণকার যাচকের যাচ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন না। গৃহস্থ শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দিবেন, যাচক হাস্য বদনে তাহাই গ্রহণ করিবে, শাস্ত্রের এই অভিপ্রায়; কিন্তু এক্ষণকার যাচকগণ সে প্রকৃতির লোক নহে, ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া দিলেও তাহারা পরিতুষ্ট হয় না। যাঁহারা অধিক আগ্রহ সহকারে ভিক্ষা দেন, যাচকেরা তাঁহাদিগকেই অধিক পরিমাণে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে।

পুরা কালের দাতাগণ দান করিবার পাত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাইতেন না। কোনও পুরাণে উল্লেখ আছে, এক রাজা গঙ্গাতীরে শত মণ স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই স্বর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পতি পত্নীতে জল গ্রহণ করিবেন, মনস্থ করেন। কিন্তু সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধ দণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজা ও রাজ্ঞী এক জনও যাচক প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং, সে দিন তাঁহারা অনশনে রহিলেন। পর দিন নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আমরা অনশনে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিতেছি, যাচক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া আমাদিগের দান গ্রহণ করুন। আমাদিগের উৎসর্গীকৃত স্বর্ণ যাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে আরও যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজকীয় ঘোষণা শুনিয়া এক জন উন্নতমনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি সপরিবারে সমূহ অন্ন কষ্ট পাইতেছি, রাজার দান গ্রহণ করিলে, এক্ষণে তৎসমুদয় কষ্ট দূর হইয়া যায়। কিন্তু কি করি, ব্রাহ্মণের

পক্ষে তণ্ডুল দান গ্রহণই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ হইয়া স্বর্ণ দান গ্রহণ করিলে, শরীরে ব্রহ্মণ্যদেব থাকেন না; অতএব, ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করিতে পারিব না। যাচকের অভাবে অনশনে রাজা রাজ্ঞীর সে দিনও প্রায় অতিবাহিত হয়, এমন সময় এক জন সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া নৃপ দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহারাজ, আমিই দান গ্রহণ করিব। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, সেই জন্য পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই ব্রাহ্মণকেই সমস্ত স্বর্ণ দান করিলেন। তদবধি সেই ব্রাহ্মণের বংশাবলী 'অগ্রদানী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ইহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বাগ্রে ক্ষত্রিয় রাজার স্বর্ণ দান গ্রহণ করিয়াছিল।

পূর্ব্ব কালে গৃহীতার অপ্রতুল ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভিক্ষুকের সংখ্যা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দান করিয়া কুলান করা সহজ নহে। নিষ্কাম হইয়া সৎপাত্রে দান করা এক্ষণকার কালে প্রায় ঘটে না। যদি কেহ দান যজ্ঞে ব্রতী হন, তাহা হইলে, তিনি আত্মীয়গণের এবং মন্ত্রী ও অধ্যক্ষগণের অনুরোধে অপাত্রেই দান করিতে বাধ্য হন। বিশেষতঃ, এক্ষণকার লোকের কেবল এক নাম কেনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই জন্য প্রকৃত বৈরাগ্যাশ্রমী লোকেরা যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানে তাঁহারা সহজে হস্ত বিস্তার করিতে চাহেন না; কারণ, তথায় তাঁহাদের যশোধ্বনি করিবার লোক নাই।

বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তি লইয়াই আমাদের প্রস্তাব; কিন্তু বাধ্য হইয়া সেই সূত্রে অনেক কথার উল্লেখ করিতে হইল। এক্ষণে প্রকৃত বৈরাগ্য ও প্রকৃত শান্তি সংসারে আছে কি না,

তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোনও এক প্রকৃত সংসার-তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী সুকবি লিখিয়াছেন,—

"শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথায় শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল !"

আমাদের মতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, উপরি উক্ত কথাই যথার্থ বলিয়া ধরিতে হয়, কারণ, সংসারে সম্পূর্ণ শান্তি নাই। প্রকৃত শান্তি সুখ ভোগ মানব দেহ ধারণ করিয়া অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। যাহাদিগের মন নির্ম্মল হয় নাই, ও সম্পূর্ণ বশে আসে নাই, তাহাদিগের বৈরাগ্য শ্মশান-বৈরাগ্যের সমতুল্য। যেমন শ্মশানে শব দাহ করিবার সময় শবের সমভিব্যাহারী লোকের মন একেবারে উদাস হইয়া যায়, তৎ কালে মনে হয় যে, আমারও এই দেহ এক দিন চিতানলে দগ্ধ হইবে। এই ব্যক্তি কল্য এই সময়ে আমাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিল, রজনীর মধ্যে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া কাল কবলে কবলিত হইল, আর কিয়ৎ ক্ষণ পরে ইহার শরীরের চিহ্নও থাকিবে না—এই শরীরের আমরা স্পর্দ্ধা করি। এই শরীর পোষণের জন্য আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করি! যে ব্যক্তিকে দাহ করিতেছি, সে বহু কষ্টে বিপুলার্থ সঞ্চয় করিয়াছিল; কিন্তু গমন কালে এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লইয়া গেল না। এই সংসারের উপর আবার মায়া মমতা কি? এই রূপ চিন্তা শববাহীর মনে কত ক্ষণ থাকে? যত ক্ষণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত না হয়। বাটীতে আসিয়া সে যদি দেখিতে পায় যে, তাহার একটি শিশু পুত্র ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছে, তখন শ্মশানে তাহার মনোমধ্যে যে বৈরাগ্যের

আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কোথায় উড়িয়া যায়, অমনি দ্রুত পদে শিশুর নিকটে গিয়া তাহার গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে আরম্ভ করে। ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন মাত্রেই মায়া মোহ আসিয়া সেই শ্মশান-বৈরাগীর পূর্ব্বের সমস্ত ভাব ভুলাইয়া দেয়। সেই ব্যক্তি আরক্ত নয়নে দাস দাসীকে বলিতে থাকে,—তোরা কি করিতেছিলি? আমার পুত্রের প্রতি এত অনাদর! কল্যই তোদিগকে দূর করিয়া দিব। এই রূপ শ্মশান-বৈরাগ্য সময়ে সময়ে অনেকের মনে উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ আত্মীয় পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের মৃত্যু জনিত শোক অসহ্য বোধে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন। সে সময় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু উদর সমভিব্যাহারে চলিল, সেই উদরের জন্য যাচ্ঞা করিতে হইবেই হইবে। যাচ্ঞার সহিত মনের লঘুতা আসিয়া উপস্থিত হয়, লঘুতার পশ্চাতেই অতিলোভ আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। লোভের বশবর্ত্তী ক্রোধ, যেখানে ক্রোধ আসিল, সেখানে মনের শান্তি ভঙ্গের আর কিছুরই অভাব রহিল না। কেবল এক ক্রোধেই শান্তি ভঙ্গ হয় এরূপ নহে, ভয় এবং বিষাদেও শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন যে, বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আমি কখনই যাচ্ঞা করিব না, বনের অনায়াস লভ্য ফল মূলে উদর পূর্ণ করিব, সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরারাধনায় চিত্ত সংযোগ করিয়া রাখিব, অন্য চিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। এ কথা সত্য; কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফল মূলাহারী ও গিরিগুহাবাসী যোগীরাও যখন দীর্ঘ কাল বনমধ্যে ঈশ্বরারাধনায় রত থাকিয়াও সময়ে সময়ে একটি সামান্য প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া মনের শান্তি

ভঙ্গ করিয়াছেন, তখন অন্য আর এক জন যে ফল মূলে উদর পূর্ণ করিয়া চির কাল শান্তিসুখ সম্ভোগ করিবেন, ইহারই বা স্থিরতা কি।

সর্ব্বতোভাবে এক মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কোনও অবস্থাতেই শান্তি সুখের প্রত্যাশা নাই। মনই সমস্ত রিপুর ইষ্টদেব,—সমুদয় মনোবৃত্তি মনের আজ্ঞাবহ। যে ব্যক্তি সর্ব্ব বিধায় সংসার তরঙ্গ সহ্য করিতে পারেন, সুখ দুঃখ সমান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, স্তুতি ও তিরস্কার সমান বলিয়া ধরেন, বহু মূল্য হীরক খণ্ডকে সামান্য অঙ্গারের ন্যায় জ্ঞান করেন, সমস্ত সাংসারিক সুখ দুঃখকে নিতান্ত অলীক বলিয়া ধরেন, এবং কোনও বিষয়েই অন্তরের সহিত লিপ্ত না হন, সেই ব্যক্তির পক্ষেই বনবাস ও গৃহস্থাশ্রম উভয়ই সমান বলিয়া ধরিতে হয়। বাহিরে বৈরাগ্যের ভাণ দেখাইলে, কিছুই হইবে না। যদি মনকে প্রকৃত প্রস্তাবে বৈরাগী করিতে পার, তাহা হইলে, গৃহে বসিয়াও শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইবে; নতুবা, সংসার আবর্ত্তনে পড়িয়া সম অংশে সুখ দুঃখের ভাগী হও,—বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তির কথা উল্লেখ করিও না।

সাংসারিকের পক্ষে শান্তি ভোগ সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, নিম্নে তাহা বিস্তারে বর্ণনা করিতেছি;—প্রথমতঃ, সংসার তরঙ্গ,—যাঁহার মন সর্ব্ব বিধায়ে এই সংসার তরঙ্গ সহ্য করিতে পারেন, বিবেক ও শান্তির কথা তাঁহারই উত্থাপন করা উচিত। সংসার তরঙ্গ কাহাকে বলে? সত্যই কিছু সংসার একটি সমুদ্রের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড জলাশয় নহে, সত্যই কিছু তাহাতে তরঙ্গ লহরী উঠিতেছে না; তথাপি, চিন্তাশীল

লোকেরা এই সংসারকে সাগরের সহিত তুলনা করেন। যেমন সমুদ্র গর্ভের স্থানে স্থানে অতলস্পর্শ, সমূহ চেষ্টা করিলেও কেহ তাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন না, সেই রূপ ভব-সাগরেরও কোনও কোনও স্থান অত্যন্ত গভীর, কোনও কালেই তাহার তত্ত্ব নির্ণয় হইবে না। সাগরের জলরাশি যেমন কখনও কখনও স্থির ভাব ধারণ করে, সেই সময় জলযানস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। বিপদের আশঙ্কা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকে রত হয়। এমন সময় হঠাৎ প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে, সাগরের অসীম জলরাশি একেবারে ভীষণ ভাব ধারণ করে। তখন তাহার ভয়ঙ্কর তরঙ্গ দেখিয়া জলযানস্থিত লোকের শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সেই রূপ এই সংসার সাগরস্থিত মনুষ্যগণ যখন ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে, আমাদিগের ধন অপর্য্যাপ্ত, পরমায়ু অনন্ত, শরীর অক্ষয়; যত কেন অত্যাচার করি না, কিছুতেই আমাদিগের এই বলিষ্ঠ শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন কাল কুটিলভাব ধারণ করে, তখন এক দিকে ধন নাশ, অন্য দিকে পুত্রকলত্রাদির অকালমৃত্যু, শরীরে রোগ ও জ্ঞাতিগণের প্রাদুর্ভাব এক কালে ঘটিয়া উঠায়, যে ব্যক্তি কিছু কাল পূর্ব্বে সংসারকে পরম সুখের স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই অমৃতময়ী পৃথিবীকে বিষময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমুদ্র মন্থনে যেমন সর্ব্বাগ্রে সুধা-ভাণ্ড উঠিয়াছিল, তাহার পর অতিরেক মন্থনে হলাহল ও অগ্নি সমুত্থিত হইয়া সুরাসুরগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে কেবল যোগীর অগ্রগণ্য মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া

সকলের ভয় ভঞ্জন করিয়াছিলেন, সংসার সিন্ধুও তদনুরূপ। যৌবন কালে বিদ্যাবলের উপর নির্ভর করিয়া প্রথমতঃ প্রায় সকলেই শান্ত ও শিষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে সংসার সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে অবশ্যই পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ যে যে-রূপ পাত্র, সে সেই রূপ রত্ন লাভ করিতে থাকে। ক্রমে ধন হইতে অহঙ্কার ও অতিলোভ উপস্থিত হইয়া পড়ে, সেই সময় অনেকে বিবেক বিহীন হইয়া 'আরও মন্থন কর! আরও মন্থন কর! এক্ষণে যাহা পাইলে, ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পাওয়া যাইবে'—এই রূপ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু অতি-রেক মন্থনে যেমন সাগরে হলাহল উঠিয়াছিল, সংসার সাগরেও সেই রূপ অমৃতের বিনিময়ে গরল উঠিয়া পড়ে। কখনও বা শোক জনিত, কখনও বা নৈরাশ্য বশতঃ, কখনও ধনক্ষয় জন্য, কখনও বা রুগ্ন শরীর হেতু, কখনও বা শত্রুভয়ে এই সুখপূর্ণ সংসারকে দুঃসহ দুঃখময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। দেবদেব মহাদেবের ন্যায় যিনি সেই তীব্র কালকূট কণ্ঠস্থ করিয়াও স্থির থা-কিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী; নতুবা, সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া কেহ বা আত্মনাশ করে, কেহ বা একেবারে ভগ্নোৎ-সাহ হইয়া যায়, কাহারও বা উন্মাদ দশা ঘটে, এবং কেহ কেহ বা বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব, কিসে সুস্থ হইব, এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন লোকেরা কি করিয়া প্রকৃত শান্তিসুখের অধিকারী হইবে? যখন সংসার সিন্ধু মন্থনে সুধাভাণ্ড পাওয়া গিয়াছিল, তখন যদি তাহারা মনে মনে ভাবিয়া রাখিত যে, অদ্য যে হস্তে সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিতেছি, কল্য হয় ত আবার সেই

হস্তেই বিষপাত্র গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব, প্রথমাবধিই অমৃত ও গরলকে সমতুল্য ভাবিয়া রাখি, তাহা হইলে, আর চরমে কষ্ট পাইতে হইবে না। যিনি সংসারের তরঙ্গ দেখিয়া মন বিচলিত না করেন, ও সংসারের শান্তি দেখিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত না হন, তিনিই সকল অবস্থাতে সম ভাবে কাল যাপন করিতে পারেন।

এই সংসারে সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। অগ্নি আর জল এ দুইটি আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, এবং জলের স্নিগ্ধকারিণী শক্তি আছে। এই দুইটি পদার্থই সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কাব্যকারেরা অগ্নিকে দুঃখের সহিত ও জলকে সুখের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন; কিন্তু সে দুইটি মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হয় এই মাত্র। আমি কি সুখের নাম দুঃখ ও দুঃখের নাম সুখ রাখিতে পারি? না, এক্ষণে তাহা আর পারি না, পূর্ব্বকার সময় হইলে পারিতাম; কেননা, সুখ এবং দুঃখের একেবারে অধিকার নির্ণয় হইয়া গিয়াছে। যে সকল বিষয়কে সংসারের লোক সুখ বলে, তাহাকে আর দুঃখ বলিবার যো নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুখ দুঃখ দৃশ্যমান্ পদার্থ নহে। যেমন মনকে আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, কিন্তু মন আমাদিগের শরীরে অবস্থান করিতেছে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি; সুখ দুঃখও সেই রূপ আনুমানিক পদার্থ। যেমন মনের কতকগুলি গুণ আছে, সেই রূপ সুখ দুঃখেরও কতকগুলি অধিকার নির্ণয় আছে। এক্ষণে সেই সকল বিষয়ের হেতুবাদ করিবার প্রয়োজন হইতেছে।

মনের অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ার নাম সুখ, এত-

ভিন্ন সুখের আর সাধারণ নামকরণ কিছুই হইতে পারে না; আর মনের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ারই নাম দুঃখ। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোকের অবস্থা ভেদে, সময় ভেদে, মনের অভিলাষ স্বতন্ত্র হয়, তখন একের সুখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে সকলের দুঃখ ইহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? আমি যাহাকে পরম সুখ বলিয়া জ্ঞান করি, অন্য এক জন হয় ত সেই সুখকে দুঃখের একশেষ বলিয়া গণ্য করিতে পারে। বোধ কর, এক জন সুরাপায়ী কোনও ধনবান্ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইল যে, অদ্য তুমি আমার উদ্যানে সন্ধ্যার পর আসিয়া সুরা সেবন করিবে। এরূপ নিমন্ত্রণ পাইয়া উক্ত সুরাপায়ীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। সে ভাবিল, কয়েক দিন হইতে মনে যাহা অভিলাষ হইয়াছিল, অদ্য তাহা পূর্ণ হইল। অন্য দিকে সেই ধনী আর একটি নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বলপূর্ব্বক আপন উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন যে, যদি তুমি হাস্য বদনে আমাদিগের সহিত সুরা সেবনে যোগ না দাও, তাহা হইলে, তোমার কষ্টের অবধি থাকিবে না; এই কারণে হয় ত তোমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এক বিষয়ে এক জনের সুখ ও অন্য জনের দুঃখ উপস্থিত কি জন্য হইল? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিব, তথাপি, ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া সুরা পান করিতে পারিব না। সুরাপায়ী ভাবিতেছে যে, যদি প্রত্যহ এই রূপ সুযোগ হয়, তাহা হইলে, আমার কোনও কষ্টই থাকে না। যাহা হউক, অদ্য আমার পক্ষে সুপ্রভাত, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে সকল লোক বহু কষ্টে কেবল এক সাংসারিক সুখের জন্য দেশ বিদেশে ধন উপার্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে,

তাহাদের সর্ব্বদা এই চিন্তা প্রবল হয় যে, যদি কিছু ধন সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা হইলেই মনের সমস্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, মনের সাধ মিটাইয়া সুখ ভোগ করিব। অন্য এক জন বিনা আয়াসে বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়া দেখিল যে, সংসারে সুখের লেশ মাত্র নাই, এই জন্য সে সংসারের উপস্থিত সুখকে সুখ বলিয়াই ধরিল না, এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় রত হইল। কোনও ব্যক্তি হিন্দুর অখাদ্য ভোজনে পরম পরিতোষ লাভ করে, এবং তাহার মন প্রত্যহ সেই সকল হিন্দু-শাস্ত্র নিষিদ্ধ সামগ্রী আহার করিতে অভিলাষ করে, অন্য এক জন সেই সকল খাদ্য সামগ্রীর নাম শুনিলেই হৃৎকার তুলিয়া থাকে। উন্নত মনের সুখ উন্নত ও অবনত মনের সুখ অবনত। কেহ যদি এক খানি ভগ্ন পর্ণকুটীর নূতন তৃণে আচ্ছাদন করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না; কেহ বা দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করার পর দেখিতে পাইল যে, তাহা অপেক্ষা তাহার এক জ্ঞাতি উৎকৃষ্ট বাটী প্রস্তুত করিয়াছে, তখন তাহার নিজ বাটীতে বস-বাস করিয়া আর সুখ বোধ হইল না, তদপেক্ষা তাহার সেই জ্ঞাতিকেই সুখী বোধ করিতে লাগিল। কোনও ব্যক্তি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, মধ্য বয়সে একটি গুণবতী সুন্দরী কামি-নীর পাণি গ্রহণ করিয়া মনে মনে যার পর নাই সুখী হইলেন; পক্ষান্তরে, আবার বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বরগণ আপন আপন অন্তঃপুরে বহুসংখ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ললনাগণকে একত্র সমবেত করিয়া রাখিয়াও এক দিনের জন্য সুখী হইলেন না। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন শত শত সুরূপা কামিনীর পাণি গ্রহণ করিয়াও এক

চিতোরেশ্বরী পদ্মিনীর জন্য মনোমধ্যে কিছু মাত্র সুখানুভব করিতে পারেন নাই; ভবেই সুখ দুঃখ সকলের পক্ষে সমান নহে। যাহার যেরূপ মন, যেরূপ রুচি, ও যেরূপ স্বভাব সে সেই মত বিষয়েই সুখানুভব করে। যখন সুখ দুঃখের স্থিরতা হইল না, তখন সকল অবস্থাতেই মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, আর কোনও বিষয়েই অসুখী হইতে হয় না। যাঁহারা অট্টালিকার বিনিময়ে পর্ণকুটীরে বাস করেন, উপাদেয় খাদ্যের বিনিময়ে ফল মূল ভক্ষণ করেন, বহু মূল্য পরিচ্ছদের বিনিময়ে বল্কল পরিধান করিয়া সমান তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহাদিগের মনেই শান্তি থাকিতে পারে; নতুবা, শান্তির স্থান আর কোথাও নাই। যদি শান্তিদেবী কোথাও থাকেন, তাহা হইলে, পর্ণকুটীরেই আছেন, রাজপ্রাসাদে নাই। মন যেখানে অবনত, সেই খানেই শান্তি বিরাজমান। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে, পদে পদে মনের শান্তিভঙ্গ হইবে: এই জন্য, সুখ দুঃখ সম ভাবে ভোগ করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে, শান্তি সুখ অনুভব করিতে পাইবে।

তিরস্কার ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করা সামান্য মনুষ্যের কার্য্য নহে; পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে স্তুতি ও তিরস্কারই সর্ব্বনাশের পথ হইয়া উঠিয়াছে। তিরস্কারের সামান্য অর্থ দোষের সমালোচনা। যদি কেহ নিতান্ত আপনার ভাবিয়া আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে, আমার বিরক্তির ইয়ত্তা থাকে না। যদিও সেই তিরস্কারকারী আমাকে একটিও অযথা কথা বলিলেন না, আমার যে সকল দোষ আছে, তিনি তাহারই উল্লেখ

করিলেন, তথাপি, আমার তাহা সহ্য হইল না। আমি অন্যায় কার্য্য করিব, সর্ব্বদা পাপপথে বিচরণ করিব; কিন্তু লোকে আমাকে সদাচারী বলিয়া স্তুতি করুক অধিকাংশ লোকের এই রূপ মনোগত অভিলাষ। আমি সুরা পান করি, অকার্য্য করি; কিন্তু কোনও চাটুকার আসিয়া যদি আমাকে এই বলিয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করে,—মহাশয়, আপনার ন্যায় দেব তুল্য ব্যক্তি এক্ষণকার কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না; আপনার পুণ্যেই সংসার চলিতেছে। এক্ষণকার সুরাপায়ী ও অসচ্চরিত্র লোক-গুলার পাপেই সংসার ছার খার হইয়া যাইতেছে। আপনার ন্যায় জন কতক পুণ্যাত্মা লোক এই ধরাধামে না থাকিলে, এত দিন পৃথিবী রসাতলগত হইত। উক্ত চাটুকার প্রকারান্তরে আমাকে বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিল, ও স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই নিন্দা করিল; কিন্তু আমি ধনগর্ব্বে তাহার সেই কথাগুলি আপনার পক্ষে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আমার মনে হয় ত, তৎ কালে এই রূপ ভাবের আবির্ভাব হইল যে, আমার দোষের কথা এ ব্যক্তি কিছুই অবগত নহে; সুতরাং, আমি স্তাব-কের উপর যথোচিত সন্তুষ্ট হইলাম।

এক্ষণকার ধনাঢ্য লোকের চরিত্রের সহিত দেব চরিত্রের কিছু মাত্র প্রভেদ দেখি না: কারণ, পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি যখন যে দেবতার স্তব করিয়াছেন, তখন তিনিই তাঁহাকে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও সর্ব্ব দেবের পূজ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। দেবতাদিগের বর প্রদানও এক্ষণকার ধনাঢ্য লোকের সমতুল্য। তাঁহারা চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া পরম শত্রুর প্রতিও প্রসন্ন হইয়া-ছেন। দেখ, ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্রের বনিতাপহারী রক্ষঃ-

কুলপতি দশানন সম্মুখ সংগ্রামে এক প্রকার পরাস্ত হইয়া যখন তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি সেই পরম শত্রু দশাননের স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন হইয়া সীতা উদ্ধারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। এক্ষণকার ধনিগণ যেমন চাটুকারদিগের প্রতি ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে তুষ্ট হইয়া থাকেন, তৎ কালের দেবতারাও তদনুরূপ ছিলেন। রাবণের স্তুতিতে রামচন্দ্র ধনু ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, বরং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তথাপি, এরূপ ভক্তের প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিব না। এমন সময়ে দশানন দুষ্টা সরস্বতী কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া কর্কশ স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, অরে ভণ্ড তপস্বি! আমি আমার ইষ্টদেবের স্তব করিলাম, আর তুই ভাবিলি ভয় পাইয়া দশানন আমাকে স্তব করিল? এ কি তোর সামান্য ভ্রম! এই দেখ্, এখনই তোর শিরশ্ছেদন করিয়া ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণের শোক বিস্মৃত হই। এই কয়েকটি কর্কশ কথা শ্রবণ মাত্রেই রামচন্দ্রের ক্রোধ শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ধারণ করিয়া পূর্ব্বে যাহাকে পরম ভক্ত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতি অস্ত্র প্রয়োগে তৎপর হইলেন। রামচন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবতারাও সময়ে সময়ে স্তাবকের প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পর, আবার সেই সকল ভক্তের বিনাশ জন্য যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু আমাদিগের যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব সে প্রকৃতির দেবতা ছিলেন না। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে আশুতোষ বলিয়া থাকেন। কথিত আছে, মহাদেব প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া স্ত্রী পুত্র

পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। যখন তিনি সর্ব্ব শরীরে ভস্ম লেপন, সর্প দ্বারা জটা বন্ধন, ভিক্ষার ঝুলি ও শিঙ্গা ডমরু লইয়া বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেন, তখন অজ্ঞান বালকেরা তাঁহার প্রতি কিরূপ দৌরাত্ম্য করিত, নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

"কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ,
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।
কেহ বলে জটা হতে বার কর জল,
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও,
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া,
ছাই মাটি কেহ দেয় গায় ফেলাইয়া।"

মহাদেব বালকগণের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হাস্য বদনে অন্য পথে গমন করিতেন। যে মহাদেবের ভুজবলে কত বার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা পাইয়াছিল, সমুদ্র মন্থন কালে যে মহাদেব কালকূট কণ্ঠস্থ করিয়া দেব দেবীগণের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন, যে মহাদেব সক্রোধে ত্রিশূল ধারণ করিলে, ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিত সেই মহাদেব ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতেন, স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতেন, মণি মাণিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অস্থি মালায় কণ্ঠ বিভূষিত করিতেন, বস্ত্রের বিনিময়ে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিতেন, এবং নিন্দা ও স্তুতি সমান জ্ঞান করিতেন। অতএব, দেবদেব মহাদেব এবং বাল-বৈরাগী শুকদেবের ন্যায় যাঁহারা স্তুতি ও তিরস্কার সমান জ্ঞান

করিতে পারিবেন, ইহ সংসারে থাকিয়াও তাঁহাদিগের মনে অনেক পরিমাণে শান্তি থাকিতে পারে।

এই সম্বন্ধে আমরা গুটি কতক পুরা কালের মনুষ্যের কথা উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিতেছি। পণ্ডিত চূড়ামণি সক্রেটিস্ স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন,—আমাকে নিন্দা করিলে, সে নিন্দায় অকারণ ব্যথিত হইব কেন? যদি সে আমার যথার্থ দোষ উল্লেখ করে, তাহা হইলে, তাহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করা উচিত; কেননা, আমাদিগের পিতা মাতা ও গুরু জনেরাই দোষের উল্লেখ করিয়া ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। আর আমি যে দোষে দোষী নহি, নিন্দুকেরা যদি আমার প্রতি সেই সকল দোষারোপ করে, তাহা হইলে, সে সকল ব্যক্তিকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া হাস্য করা উচিত। এই মর্ম্মে শান্তিশতকেও একটি চমৎকার কবিতা আছে, তাহার ভাবার্থ এই;—"যদি কেহ আমার নিন্দা করিয়া পরিতোষ লাভ করে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি; বরং অযত্ন সম্ভূত অনুগ্রহ ভাজন হইলাম। দেখ, লোকে বহু দুঃখে যে ধন উপার্জ্জন করে, তাহা বিতরণ করিয়া অন্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে; আমি যদি তাহা অক্লেশে ও বিনা অর্থ ব্যয়ে পাই, তাহা হইলে, আপনাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিব।" আর এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন,—যাঁহারা নিন্দুকের কথায় কর্ণপাত করেন না, ও চাটুকারের সহিত একাসনে বসেন না, তাঁহারাই শান্তিসুখ লাভ করিবার যোগ্য পাত্র। স্তুতি ও নিন্দা এই দুইটি সমাজের কণ্টক স্বরূপ। সংসারে যে সমুদয় অনিষ্ট ঘটিতেছে, তৎ সমুদায়ের ভিত্তিতেই চাটুকার ও নিন্দুক আছে। যখন শূর্পণখা লক্ষ্মণ

কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করে, তখন সে মনে মনে এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল যে, সহোদরকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিব; কেননা, লঙ্কাধিপতির ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিতে না পারিলে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; এক নিন্দাই ক্রোধের প্রধান উদ্দীপক। এই যুক্তি স্থির করিয়া শূর্পণখা রাজ সভায় প্রবিষ্ট হইল, এবং কর্কশ বচনে সহোদরকে বলিল, যে রাজা দিন যামিনী স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে বাস করে, অচির কাল মধ্যেই সে রাজ্য ভ্রষ্ট হয়। লঙ্কাধিপতিরও তাহাই ঘটিতেছে। আমাদিগের অধিকৃত স্থান কি না দুই জন সামান্য মনুষ্যে আসিয়া অধিকার করিয়া লইল! কামুকের আবার রাজ্য কেন? যে দিন যামিনী স্ত্রী সেবায় অনুরক্ত, কোন্ কালে তাহার সম্মান রক্ষা হয়? ভ্রাতঃ, তুমি ঘরে বসিয়া আপনাকে বড় দেখিতেছ, আর মন্দোদরীর দাসত্ব করিতেছ। যাহারা রাবণের ভগিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিল, এখনও তাহারা জীবিত আছে, এই আশ্চর্য্য! ভগিনীর এই সকল কটূক্তি শুনিয়া রক্ষঃকুলপতি আরক্ত নয়নে কহিলেন, তুই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে সকল কটু বাক্য বলিতেছিস্, কেবল সহোদরা বলিয়াই তাহা সহ্য করিলাম; নতুবা, এক্ষণেই তোর শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিতাম। আমি কি রাজ্য শাসনে অক্ষম? শীঘ্র বল্, কে আমার অধিকৃত স্থানে উপদ্রব করিতেছে? কে তোর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়াছে? যদি এই দণ্ডে তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমাকে যেন আর কেহ বিশ্ববিজয়ী বলিয়া সম্বোধন না করে। সহোদরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে দেখিয়া শূর্পণখা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। রাবণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সীতাহরণে বহির্গত হইলেন।

এ সম্বন্ধে আর পৌরাণিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পদে পদে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কেবল এক নিন্দার ভয়ে অনেক অজ্ঞ লোক আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া মনের শান্তি ভঙ্গ করে। কেহ কেহ বা কেবল আপনার স্তুতিবাদ শুনিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। এই রূপ লোককে সাধারণ কথায় 'নাম পাগ্‌লা' বলে। নাম পাগ্‌লা লোকের অগ্র পশ্চাৎ জ্ঞান নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই, ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। আমাকে কিসে লোকে পুণ্যাত্মা বলিবে, কিসে লোকে দাতা বলিবে, কিসে লোকে ধনাঢ্য বলিবে, সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, এবং নাম কিনিবার অনুরোধে আপনার ধনও নষ্ট করে। ধন ক্ষয়ে এবং বিরোধে যেরূপ মনের শান্তি ভঙ্গ হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। তবেই স্তুতি ও নিন্দার মধ্যে একটিতে ধন ক্ষয় ও অপরটিতে মনের গ্লানি আনিয়া উপস্থিত করে। যে স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করিবার মানসে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সমূহ চেষ্টা করিয়া থাকেন, ভিক্ষুকেরা তাহা অনেকাংশে অনায়াসে শিক্ষা করে। যাচকদিগকে আমরা যত কেন নিন্দা করি না, কিছুতেই তাহাদের মনের গ্লানি হয় না, মনোমধ্যে কিছু মাত্র ক্রোধ জন্মে না, সেই সকল কটূক্তি অনায়াসে সহ্য করিয়া তাহারা আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। যদি শত সহস্র কটু বাক্য শ্রবণান্তর তাহাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হয়, তাহা হইলেও ভিক্ষুকের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। পাঠক, আপনি যদি সেই ভিক্ষুককে যথোচিত স্তব স্তুতি করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে চাহেন, তাহা হইলে, সে স্তুতিতে তাহাদিগের মনের প্রফুল্লতা জন্মে না;

তবেই নিন্দা ও স্তুতি তৎ কালে তাহাদের পক্ষে সমান হয়।

কোনও চতুর ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যে সকল লোক স্তবে তুষ্ট হয়, কিম্বা নিন্দাবাদ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, এরূপ লোক যদি মহাধনবান্ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে অল্প কালের মধ্যে দরিদ্র করিয়া দিতে পারি। সত্যই, যে ব্যক্তি ব্যঙ্গ স্তুতি শুনিলে বিচলিত হয়, তাহাকে অল্পায়াসে চতুরেরা নষ্ট করিতে পারে। স্তুতি ও নিন্দা সুহৃদ্ ভেদের এক অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে তাহা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং, যাঁহা-দিগের ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সত্যের দিকে দৃষ্টি আছে, তাঁহারা স্তুতি বাক্য শুনিয়া মনকে উল্লাসিত করেন না, এবং কটু কথা বা নিন্দাবাদ শ্রবণে সহসা কুপিত হইয়া উঠেন না। রামচন্দ্র ভর-তের স্তুতি বাক্যে পিতৃসত্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই, এবং বালি রাজার মর্ম্মভেদী রূঢ় কথা অনায়াসে সহ্য করিয়া তাঁহাকে চরম চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছিলেন। কটু বাক্য সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়াই কুরুপতি দুর্য্যোধন একাকী ভীমসেনের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুর্য্যো-ধন যখন কুরুক্ষেত্র সমরে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির চর মুখে সেই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের কোনও চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, তিনি হতাশ হইয়া মন্ত্রি-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ লাভ যে কঠিন হইয়া উঠিল। সে এই গভীর হ্রদের যে কোথায় রহিয়াছে,

তাহার কোনও চিহ্নই লক্ষ্য হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, চিন্তিত হইবেন না, ইহার সদুপায় করিতেছি। আপনি এই হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে দুর্য্যোধনকে গালি দিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে, অক্লেশে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনার সহিত এই রূপ নিন্দা করিতে ও কটু বাক্য বলিতে লাগিলেন ;—

"এত শুনি যুধিষ্ঠির বলিলা রাজাকে,—
'জলের ভিতর কেন আছ মায়া পাকে ?
ভ্রাতৃ বন্ধু আত্মীয়েরে মারিয়া পামর,
আপনার প্রাণ লাগি হইলে কাতর !
উঠ উঠ নরাধম দুষ্ট কুরুবর,
ভয় পরিহরি কর আসিয়া সমর।
নিজ বাহু বলে তুমি শাসিলে সংসার,
এক্ষণে হইলে কেন কুলের অঙ্গার ?
আপনি পণ্ডিত বট জান ধর্ম্মাধর্ম্ম,
ভূপতির যোগ্য নহে পলায়ন কর্ম্ম।
সমর সাগর যেই নাহি হয় পার,
মনে ভাবি দেখ তার জীবন অসার।
ইষ্ট বন্ধু সখা আর সম্বন্ধী মাতুল,
সবারে মারিয়া তুমি করিলে নির্ম্মূল ;
মরিয়াছে মহাযোদ্ধা ঊনশত ভাই,
কেমনে জীবন আশা কর মম ঠাঁই ?
হইলে যে ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম আচারী,
প্রাণ লয়ে লুকাইলে রণ পরিহরি।

কর্ণ শকুনির যত শুনিলে বচন,
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্য্যোধন।'
এতেক কটূক্তি যদি করিলেন ধর্ম্ম,
শুনি কোপে জ্বলিলেক দুর্য্যোধন মর্ম্ম;—
'ধিক্ মম বীরত্বে, অসার ভুজ ভার,
হেন নিন্দা বাক্যবাণ সহে না আমার!'
ঘন শ্বাস ছাড়িয়া বলিলা ক্রোধ মনে,—
'নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী করিব আজি রণে।
শুন যুধিষ্ঠির, তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত,
একেশ্বর আছি আমি পদাতি রহিত।
একাকী করিব রণ শুন ধর্ম্মরায়,
অনিয়ম সমর করিলে পাপ তায়।'
স্ববর্ণ সাঁজোয়া বীর হৃদয়েতে ধরি,
দীপ্তিমান্ কুরুবর যেন হেম গিরি।
ভুজবলে বিদারিয়া জল গুণনিধি,
উঠিলা মৈনাক যেন হ'তে জলনিধি।"

দুর্য্যোধন যে ভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যুধিষ্ঠির বহু দিন অনুসন্ধান করিলেও তাহা জানিতে পারিতেন না; কিন্তু কর্কশ বাক্য মহামানী দুর্য্যোধনের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আপনা হইতে প্রবল শত্রুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরং মৃত্যু হয়, হইবে, তথাপি, দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে পারিব না, এই ভাবিয়া দুর্য্যোধন শত্রুগণের সহিত একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, দ্যূত ক্রীড়ার সময় দুঃশাসন ও কর্ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ বিদ্রূপ

করিয়াছিল, এক জন হীন বল পুরুষ ও তাহা সহ্য করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির এক বার মাত্র ইঙ্গিত করিলেই, ভীম ও ধনঞ্জয় সেই ক্ষণেই কুরু সভায় সমস্ত দুর্ম্মতিগণকে অতি অল্প কালের মধ্যে নিপাত করিয়া ফেলিতেন; কিন্তু এরূপ ক্ষমতা স্বত্ত্বেও যুধিষ্ঠির অসময় জানিয়া ধৈর্য্যের সহিত জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সহ্য করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি চরমে পুনর্ব্বার হস্তিনার সিংহাসন লাভ করেন। দুর্য্যোধন সর্ব্বতোভাবে হীনবীর্য্য হইয়াও দাম্ভিক স্বভাব বশতঃ জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না বলিয়াই অবশেষে ভীমের পদাঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইলেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রেরই সময় বিশেষ স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করা উচিত। স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট হওয়ায়,ও নিন্দাবাদে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করায় বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা সময়ে একটি সামান্য কথা সহ্য করে না, কিন্তু অসময়ে তাহাদিগকেই তাহা অপেক্ষা শত গুণ অপমান সহ্য করিতে দেখা যায়। চাটুকারের অযথা স্তবে কর্ণপাত করিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সময়ে সময়ে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। অসুরেরা অন্তরের সহিত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইত না, কেবল আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই প্রধান প্রধান দেবগণকে স্তুতি করিত। দেবতারাও সেই কপটী-দিগের কপটতায় মুগ্ধ হইয়া দুরাত্মাগণকে মনোমত বর প্রদান করিতেন; তাহার পর, সেই অসুরগণেরই দৌরাত্ম্যে আপনারা স্থান ছাড়িয়া পলাইবার পথ পাইতেন না। এক্ষণে বিপুল ধনের অধীশ্বরগণকেই দেবতার ন্যায় ধরিলাম। তাঁহারা প্রতা-

স্তুকগণের অযথা স্তুতি বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে সেই নরপ্রেতগণ দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। চাটুকারেরা সময় বুঝিয়া ধনবানগণকে কৌশলে নিন্দা ও স্তব করে, যিনি সেই সকল কথায় কর্ণপাত করিয়া রুষ্ট বা তুষ্ট হন, পদে পদে তাঁহাদিগের মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে। প্রশংসা লাভের জন্য সৎকার্য্যে ও নিন্দাবাদ শুনিয়া কলহে প্রবৃত্ত হওয়া দুইই সমান; অতএব, যদি শান্তিসুখ সম্ভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান কর। মনের শান্তি থাকিলে, বিবেক ও বৈরাগ্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেক।

সংসারবাসী জনগণ যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহাই অধিক মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করে। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে আমাদিগের মুহূর্ত্ত কাল চলে না। মাতৃগর্ভ হইতে এই মৃত্তিকাতেই নিপতিত হইয়াছি। যখন অক্ষম ছিলাম, তখন জড়ের ন্যায় মৃত্তিকাতেই পড়িয়া থাকিতাম। মৃত্তিকাই আমাদিগের শরীর পোষণ করিতেছে; সেই মৃত্তিকা আমরা দুই পদে দলন করিয়া থাকি। এই সংসারে মৃত্তিকার যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা এক বারও ভাবিয়া দেখি না। জল, বায়ু, অগ্নির প্রতিও আমরা মৃত্তিকার ন্যায় অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকি। যে সকল পদার্থ লইয়া আমাদিগের দেহ, যাহা না হইলে, আমরা ক্ষণ কাল প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, প্রায় সেই সকল বস্তুর প্রতিই সর্ব্বদা অনাদর করিয়া থাকি। শরীর ধারণ পক্ষে যে সকল দ্রব্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাই আমাদিগের আদরের ধন। যিনি অঙ্গুরীয়কে সংলগ্ন করিয়া এক টুক্‌রা হীরক অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার আর অহঙ্কারের পরিসীমা থাকে না। এক অহঙ্কার ব্যতিরেকে

হীরক আর আমাদিগকে কি দিতে পারে ? প্রয়োজনের মধ্যে হীরার ধারে কাচ কাটা যায়, এই মাত্র। এই নিষ্প্রয়োজন দ্রব্যের জন্য কত শত লোক লালায়িত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হীরক খনির মধ্যে জন্মিয়া থাকে ; সেই হীরকের অনুসন্ধানে শত সহস্র লোক দিন যামিনী উৎকট পরিশ্রম করিতেছে। হীরক মৃত্তিকা সম্ভূত, তণ্ডুলও মৃত্তিকা সম্ভূত। তণ্ডুল ভক্ষণে জীবন ধারণ হয় ; কিন্তু হীরক মুখে রাখিলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। যে দ্রব্য অনায়াসে আমাদিগের প্রাণ নষ্ট করিতে পারে, আমরা তাহাই যত্ন সহকারে হৃদয়ে ধারণ করি।

হীরক দ্বারা কাচ কাটা হইয়া থাকে। হীরকের ধার ব্যতিরেকে আর কোনও অস্ত্রেই সহজে কাচ কাটা যায় না। তবেই সংসারে হীরক দ্বারা একটা উপকার সাধিত হইতেছে ; কিন্তু মুক্তা দ্বারা কি উপকার সাধিত হয় ? কি জন্যই বা অগাধ জলধি হইতে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া মানবগণ মুক্তা পাইবার আশায় শুক্তি তুলিতে যায় ? শুনিয়াছি যে, পূর্ব্ব কালে মুসলমান বাদশাহগণ মুক্তা ভস্ম করিয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া, সেই চূণ দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিতেন। যদি চূণের জন্যই মুক্তার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, সে কার্য্য সামান্য প্রস্তর খণ্ড দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত, মুক্তা ভস্ম দ্বারা চূণ প্রস্তুত করার কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না ; তথাপি যে, মুসলমান বাদশাহগণ প্রস্তরের চূণ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তার চূণ ব্যবহার করিতেন, সে কেবল তাঁহাদিগের অহঙ্কার মাত্র। বৈদ্যক গ্রন্থের মতে কোনও কোনও ঔষধ প্রস্তুত করণ কালে মুক্তা ভস্মের প্রয়োজন হয় ; এরূপ স্থলে হীরক অপেক্ষা মুক্তার প্রয়োজন অধিক বলিয়া ধরিতে হইবে।

কিন্তু কেবল এক ঔষধের জন্য কি বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র লোক পারস্য উপসাগরে ও সিংহল দ্বীপের নিকটস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে মুক্তা তুলিতে যায়? না, তাহা নহে। ঔষধের উপযুক্ত মুক্তা জনপদের কোনও কোনও অকৃত্রিম জলাশয়েও জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মুক্তা ভস্ম ও স্বর্ণ ভস্ম যে সকল ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণের জন্য নহে। যাঁহারা মুক্তার চূর্ণ সংযোগে তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, স্বর্ণ ও মুক্তার ঔষধ তাঁহাদিগেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; কারণ, অধিক মূল্যবান্ না হইলে, ধনবান্ লোকের কোনও পদার্থই মনোনীত হয় না। ধনাঢ্য লোকের চক্ষু থাকিতে চক্ষু নাই। যাহার অধিক মূল্য, তাঁহারা তাহাকেই সারবান্ বলিয়া জ্ঞান করেন। এই জন্য নির্দ্ধন ও ধনী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল বিষয়েই তারতম্য দৃষ্ট হয়। কদলী পত্রে অন্নাহার করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু ধনীরা তদ্বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। অল্প মূল্যের শীতবস্ত্রে শীত নিবারণ হয়, কিন্তু ধনীদিগের শীতবস্ত্রের মূল্য অধিক হইয়া থাকে। এক পয়সা মূল্যের এক পাত পাঁচনে নির্ধনের যে রোগ আরোগ্য হয়, ধনীর সেই রোগ দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয়েও আরোগ্য হয় না। যদি কোনও রুগ্ন ধনীর গৃহে এক জন সুযোগ্য চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রকৃত রোগের ঔষধের মূল্য অবধারিত করেন, তাহা হইলে, সেই চিকিৎসককে হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ঘোটকারোহণে নগর ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি এক দিন তাঁহার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমন কোনও মাদক দ্রব্য আছে, যাহা সেবন মাত্রেই আমার

মনের বিলক্ষণ প্রফুল্লতা জন্মে ? যদি থাকে, তাহা হইলে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ সেই মাদক দ্রব্য সেবন করিব। মন্ত্রী কহিলেন, জাঁহাপনা, আমি কল্য ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। পর দিন প্রত্যূষে মন্ত্রী এক কলিকা গাঁজা প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং সিংহদ্বারে উপস্থিত রহিলেন। নবাব সাহেব অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী কহিলেন, জাঁহাপনা, গত কল্য যেরূপ মাদক সেবনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। নবাব আগ্রহের সহিত মন্ত্রীর হস্ত হইতে গাঁজার হুঁক্কা লইয়া তাহার ধূম পান করিলেন, ও মস্তক সঞ্চালন দ্বারা কহিলেন, ইহা বড় চমৎকার দ্রব্য। তৎপরে মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে মন্ত্রী কহিলেন, ইহার মূল্য যৎসামান্য, অর্দ্ধ পয়সা মাত্র। অর্দ্ধ পয়সার কথা শ্রবণ মাত্রেই নবাব সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে আমি এরূপ যৎসামান্য মূল্যের মাদক দ্রব্য কি করিয়া খাইব ? স্বার্থপর মন্ত্রী হইলে, এক ছিলিম গাঁজা খাওয়াইয়া নবাব সাহেবের নিকট সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, নবাব সাহেবেরও গাঁজার প্রতি শ্রদ্ধা হইত। এই রূপে বড় মানুষে সকল বিষয়েরই মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। যাহা বড় মানুষে চাহেন, তাহারই মূল্য অধিক; সেই কারণেই হীরক ও মুক্তার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি বড় মানুষে ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে, কোনও কালেই হীরা মুক্তার এত আদর হইত না, এবং বহু কষ্টে কেহ তাহা সংগ্রহ করিতেও যাইত না।

জ্ঞানবান্ লোকেরা অসার বস্তুর কোন্ কালে আদর করিয়াছেন ? যাহা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না, যাহা ব্যতীত জ্ঞানের

উন্নতি হয় না, যাহা ব্যতীত ঈশ্বর আরাধনা হয় না, তাহাই তাঁহাদিগের নিকট মূল্যবান্। এক জন রাজা দৈবাৎ কোনও তপস্বীর কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাপসের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, তপোধন, আপনার ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনাকে আমার একটি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে। আপনার গলদেশে যে বৃহৎ বৃহৎ রুদ্রাক্ষের মালা রহিয়াছে, তাহার বিনিময়ে আপনি এক গাছি মুক্তার মালা পরিধান করুন, এবং আপনার কমণ্ডলুটি স্বর্ণে মণ্ডিত করাইয়া লউন। রাজার প্রস্তাব শুনিয়া তপোধন হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে তস্কর দ্বারা বিনষ্ট করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন? মুক্তার মালা তাপসের কণ্ঠ ভূষণ নহে, ও স্বর্ণ পাত্রও তাপসের জল পাত্রের যোগ্য নহে; কেননা, মণি মাণিক্য অহঙ্কারের উদ্দীপক। আমি যদি অদ্য একটি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, তাহা হইলে, কল্য আর মৃগচর্ম্মে শয়ন করিতে ইচ্ছা হইবেক না; অদ্য যদি স্বর্ণ পাত্রে জল পান করি, তাহা হইলে, কল্য অলাবু পাত্রে জল পান করিতে ঘৃণা বোধ হইবে। আপনি যদি আমাকে এক গাছি মুক্তার মালা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিয়া যান, তাহা হইলে, তাহাতে কেবল আমার অহঙ্কার হইবে। বহু কষ্টে অহঙ্কার ও ঈর্ষার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছি, এক একটি বিলাস পরিত্যাগ করিতে এক একটি বৎসর গিয়াছে। গুরু গৃহে বহু কাল যোগ শিক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তুপুস্তক পাঠে কিছু মাত্র ফল দর্শে নাই। তাহার পর, এই

বিপিন মধ্যে যোগাসন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করায়, তাহারা একে একে আমার বশে আসিয়াছে। আমার এক্ষণে কেবল ভগবানের চরণ ব্যতিরেকে আর সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। আপনি যে মুক্তার মালার প্রলোভন দেখাইতেছেন, আমি তাহা শুষ্ক হরীতকী অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করি; কেননা, আমার শুষ্ক হরীতকীর যে শক্তি আছে, আপনার বহু মূল্যের মুক্তার মালার সে শক্তি নাই। হরীতকী ভক্ষণে দুই এক দিবস প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, আপনার মুক্তার মালা গ্রহণ করিলে, অদ্যই তস্করেরা আমার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া যাইবে। রাজন্, ঐশ্বর্য্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল; এই জন্যই জ্ঞানবান্ লোকেরা ঐশ্বর্য্যের দাস হইতে চাহেন না। সংসারে কেহ কাহারও শত্রু নহে, কেবল এক ঐশ্বর্য্যই ধনাঢ্য লোকের শত্রু সংগ্রহ করিয়া দেয়। আপনি যদি কৌপীন ধারণ করিয়া অরণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে, কেহই আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না; কিন্তু এই রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনি তস্কর পরিপূরিত বিপিনে পরিভ্রমণ করিলে, অচিরাৎ প্রাণে বিনষ্ট হইবেনই হইবেন। ধনে কত দূর শান্তি ভঙ্গ হয়, ও ধনের অভাবে কি রূপ দিব্য জ্ঞান হয়, তাহার একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—

এক ব্যক্তি বহু কষ্টে শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল। মুদ্রাগুলি গণনা করিবার সময় ক্ষণ কালের জন্য তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং মনে করিল, আমি এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়াই এত দূর আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যাহাদিগের সহস্র মুদ্রা আছে, তাহারা কত দূর আনন্দ ভোগ করে, আমাকে এক বার

দেখিতে হইবে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই ব্যক্তির মনে সহসা ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিল, আমি সহস্র মুদ্রার চিন্তা করিতেছি কি! এই শত মুদ্রাই রক্ষা করা আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিবে! কেননা, আমার লোক বল নাই, শরীরও তাদৃশ বলিষ্ঠ নহে। যদি তস্করেরা ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে, তাহা হইলে, আমার এই বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইবে। এই টাকা গুলি এক জন বিশ্বস্ত লোকের বাটীতে রাখিয়া আসি; কারণ, এই ভগ্ন কুটীরে এত টাকা রাখা কোনও ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। এই রূপ ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ পল্লীস্থ কোনও বিশ্বস্ত লোকের বাটীতে টাকাগুলি রাখিয়া আসিল; কিন্তু কুটীরে পুনঃ প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহার মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিল, কি করিলাম! আপনার বুদ্ধির দোষে সর্ব্বনাশ করিলাম! এত কষ্টের টাকা এক জনকে হাতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম! যদি সে বলে, আমার কাছে রাখিয়া যাও নাই, তাহা হইলে, আমি তাহার কি করিতে পারিব? এই রূপ প্রতিকূল চিন্তায় মগ্ন হইয়া সে ব্যক্তি সমস্ত রজনীর মধ্যে এক বারও নিদ্রা যাইতে পারিল না। প্রত্যূষে উঠিয়া সেই প্রতিবেশীর নিকটে গিয়া কহিল, মহাশয়, আমার টাকা গুলি দিন; এই টাকায় আমি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিব। প্রতিবেশী তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি আনিয়া দিলেন। উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবা মাত্রই সে একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আহ্লাদও ক্ষণ কালের মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল। পুনর্ব্বার ভয় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে ভাবিল, প্রতিবেশীর নিকট টাকাগুলি রাখা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়া-

ছিল, আমার এতগুলি টাকা হইয়াছে, এ কথা ত কেহই জানিত না ; প্রতিবেশী কি পাঁচ জনের নিকট গল্প করিতে ক্ষান্ত হইবে ? এখন যদি নগদ টাকা না রাখিয়া এই টাকায় ধান্য ক্রয় করিয়া রাখি, তাহা হইলে, হঠাৎ চোরে লইয়া যাইতে পারিবে না।

পর দিন সে শত মুদ্রার ধান্য ক্রয় করিয়া একটি মরাই বাঁধিয়া রাখিল ; কিন্তু ধান্য ক্রয় অবধি পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, প্রায় সমস্ত রাত্রি এক গাছি যষ্টি হস্তে করিয়া কুটীরের বহির্ভাগে বসিয়া থাকিত। প্রতিবেশীরা নিজ নিজ গৃহে অগ্নি জ্বালিলেই, সে অকারণ তাহাদিগের সহিত বাগ্বি-তণ্ডা উপস্থিত করিত। প্রতিক্ষণ সে ভাবিত, যেন পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে। এই রূপে হৃদয় মধ্যে অগ্নিভয় উপস্থিত হওয়ায়, সে মনে মনে ভাবিল, ধান্যের মরাই আর রাখিব না ; কোন্ দিন একেবারে হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া যাইব ? ধান্য বিক্রয় করিয়া গুটি-কতক দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করি ; তাহা হইলে, টাকাকে টাকা বজায় থাকিবে, এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আরও দশ টাকা লাভের সম্ভাবনা হইবে। এই ভাবিয়া সে ধান্য বিক্রয় করিয়া পর দিনেই চারিটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিল। গাভী কয়েকটি গৃহে আনিয়া ভাবিল, যদি ইহার একটি মরিয়া যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ !—না, গাভী ক্রয় করিয়া ভাল কাজ করিলাম না। এমন কোনও দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাখি, যাহার উপর চৌর্য্য ভয়, অগ্নি ভয় প্রভৃতি কোনও ভয়েরই সম্ভাবনা নাই। পর দিন সে চারিটি গাভী বিক্রয় করিয়া ফেলিল, ও টাকাগুলি পুনরায় একটি পোঁটলা বাঁধিয়া ধান্যের জালার ভিতর লুকাইয়া রাখিল, এবং প্রতি রজনীতে উঠিয়া দুই চারি বার জালার গাএ হাত বুলাইত

লাগিল। যে দিন অবধি তাহার হস্তে এক শত টাকা আসিয়াছে, সেই দিন হইতে সে আর কুটীর পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিতেও যায় না। তাহার নূতন ভাব দেখিয়া প্রতিবেশীরা আশ্চর্য্য হইল। এক দিন কয়েক জন লোক সমবেত হইয়া বলাবলি করিল যে, নিধিরাম আর কুটীরের বাহির হয় না কেন? পূর্ব্বে ত লোকের বাড়ীতে ভাত চাহিয়া খাইত। গৃহস্থদিগের গৃহে কোনও সমারোহের কাজ কর্ম্ম হইলে, নিধিরাম পরম আহ্লাদের সহিত তাহাতে আসিয়া যোগ দিত। পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় কুটীরের দ্বারে বসিয়া মনের আনন্দে রামপ্রসাদী গীত গাহিত; কিন্তু এক্ষণে কেহ ডাকিলেও কথা কয় না; সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত হইয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া থাকে। সদানন্দ নিধিরাম এই রূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেই হইবে।

এই রূপে নিধিরামের টাকার কথা প্রতিবেশীরা সকলেই জানিতে পারিল। কয়েক জন চতুর প্রতিবেশী এক দিন পরামর্শ করিল যে, অদ্য রজনীতে আমরা নিধিরামের টাকাগুলি হরণ করিয়া লইয়া আসিব। দেখি, নিধিরাম টাকার শোকে কি করে? যদি টাকার শোকে সে মর মর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, সেই সময় উহাকে টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া উহার প্রাণ রক্ষা করিব। দিনের বেলায় এই পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল। রজনীতে কয়েক জন বলবান্ যুবা বল পূর্ব্বক নিধিরামের টাকা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। নিধিরাম টাকার শোকে সমস্ত রজনী মৃতবৎ কুটীরে পড়িয়া রহিল। প্রত্যূষে উঠিয়া ভাবিল, আর এখানে থাকিয়া কি করিব? যে দেশে টাকা আছে, সেই দেশে গমন

করি। যদি পুনরায় টাকা করিতে পারি, তাহা হইলেই, জন্ম ভূমিতে আসিব; নতুবা, জন্মের মত নিধিরাম বাটী পরিত্যাগ করিল। এই ভাবিয়া কাঁথা, লাঠী ও জলপাত্র লইয়া নিধিরাম কুটীরের বাহির হইল, এবং কোনও নগরে যাইবার অভিপ্রায়ে ক্রমাগত চলিতে লাগিল। দুই ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই তাহার এক জন প্রতিবেশী যুবা দস্যু-বেশে আসিয়া নিধিরামের কাঁথা, লাঠী ও জলপাত্র কাড়িয়া লইল। এই ঘটনার পর, নিধিরাম কিয়ৎ ক্ষণ এক বৃক্ষতলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে হঠাৎ আর এক জন লোক আসিয়া নিধিরামের পরিধেয় বস্ত্র খানি কাড়িয়া লইল। নিধিরাম উলঙ্গ হইয়া সেই বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—উলঙ্গ হইয়া কি প্রকারে লোকালয়ে যাইব? এক্ষণে লজ্জা আবরণের উপায় কি? এই রূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মুখস্থ এক কদলী কাননে প্রবিষ্ট হইয়া শুষ্ক এক খানি কলার খোলা কলার ছোটায় বাঁধিয়া নিধিরাম শুভ ক্ষণে লজ্জা আবরণ করিল। কৌপীন পরিধান করিয়া নিধিরাম কদলী কাননের বহির্ভাগে আসিয়া মনে মনে ভাবিল,—আর আমাকে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইবে না। এ কি! আমার মন যে একেবারে ভয় শূন্য হইয়াছে। কি জন্য এরূপ হইল? ওহো! বুঝিয়াছি, পূর্ব্বেও ভয় ছিল না, এবং এক্ষণেও নাই। মধ্যে কিছু দিন পাছে আমার টাকাগুলি কেহ লয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম। এক্ষণে টাকার সহিত, অবশেষে, জলপাত্র, কন্থা ও যষ্টির সহিত, এবং সর্ব্বশেষে আমার পরিধেয় বস্ত্র খানির সহিত আমার সমস্ত ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। তবে কি এক অর্থই সমস্ত ভয়ের কারণ? আজ ত আমার মন একেবারে শান্ত হই-

য়াছে, আমি অকুতোভয়ে এই জন শূন্য স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছি; কই আমি ত সাবধান হইতেছি না? এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল ধনের জন্যই সংসারে লোকের শান্তি থাকে না। ধনের জন্যই রাজা প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন, ধনের জন্যই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়, ধনের জন্যই সহোদরে সহোদরে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, ধনের জন্যই দস্যুরা নরহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, এবং এক ধনের জন্যই নিধিরাম শর্ম্মা ভগ্ন কুটীরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর আমি ধন চাহি না, এখন এই কৌপীন পরিয়া সেই নিত্য ধনের অনুসন্ধান করিব। তবে এই মাত্র আক্ষেপ যে, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্য পথের পথিক হইতে পারি নাই; দস্যুরাই বল পূর্ব্বক আমাকে কৌপীন পরিধান করাইয়াছে। আমার স্ত্রী ছিল না, পুত্র কন্যা ছিল না, উন্নত অট্টালিকা ছিল না, কেবল শত মুদ্রা ও ছিন্ন কন্থার মায়ায় ভগ্ন কুটীরে পড়িয়া থাকিতাম। যাঁহারা অতুল বিভব অকিঞ্চিৎকর পদার্থের ন্যায় জ্ঞান করিয়া স্বেচ্ছায় কৌপীন ধারণ করেন, তাঁহারাই সাধু। আমি যদি কিছু কাল তাঁহাদিগের দাসত্ব করিতে পারি, তবেই কৃতার্থ হইব। দস্যুগণ আমার শত্রু নহে, তাহারা যথার্থই মিত্রের কার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে, আমার কাচ ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান হইতেছে, আর আমার মরিতেও ভয় নাই, আমি আর রাজাকেও ভয় করি না। ওঃ! গৃহবাস কি ভয়ানক কষ্টকর!

হে নরপতে, কেবল এক ঐশ্বর্য্য ভোগ লালসাতেই মানবগণ সংসারিক দুর্দ্দশা ভোগ করে। কেবল মনুষ্য কেন, ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রও সময়ে সময়ে দুঃসহ দুর্দ্দশা ভোগ

করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্য ত্যাগী পরম যোগী মহাদেবের প্রতি কেহই কোনও কালে কটাক্ষ পাত করে নাই। পুরন্দর কত বার শত্রু কর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন; কিন্তু মহাদেবকে কেহ কখনও কৈলাসচ্যুত করিবার চেষ্টা করে নাই। রাজন্, আমি যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া পরাৎপরের আরাধনা করিতেছি; বোধ হয়, আপনি এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেছেন না। আপনি অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ আপনার দাস নহে। দিগ্বিজয় করিয়া নানা স্থানের ধন রত্ন আনিয়া রাজকোষে সঞ্চয় করিয়াছেন, এবং সেই গুলি 'আমার' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, এই সংসারে কে কাহার? ধন রত্ন এবং রাজ্য খণ্ড আপনার হওয়া দূরে থাকুক, আপনার এই দেহও আপনার নহে। যেমন ধন জন পরিপূর্ণ আপনার রাজ্য পাছে শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এই আশঙ্কায় শশব্যস্ত হইয়া আছেন, সেই রূপ নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখুন, আপনার এই সুন্দর দেহের সারাংশ এক দিন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। তাহার পর, আপনার পুত্র কলত্রাদি অনায়াসে এই সুন্দর শরীর অনলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। অদ্য যে রত্নাদি আপনার হস্তে আসিয়াছে, তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইতেছেন; কিন্তু কল্য হয় ত আপনাকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া সেই সকল রত্নাদি অন্যের হস্তগত হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছি যে, কাচ ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান না করিলে, কোনও কালেই মনের শান্তি হয় না। আমাদের চক্ষে এক্ষণে মুক্তার মালা ও রুদ্রাক্ষ মালা সমান বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমাদিগকে আর স্ত্রীপুত্রের দাসত্ব করিতে হয় না, ধন রত্ন নাই

বলিয়া শত্রু ভয়ে ভীত হইতে হয় না, কোনও প্রকার অধিকার রাখি না বলিয়া ভূস্বামীর পীড়ন সহ্য করিতে হয় না ; এই জন্যই শান্তি দেবী অনুক্ষণ আমাদের হৃদয় মন্দিরে বিরাজিত হইতেছেন। অতএব, ঐশ্বর্য্যের লালসা একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, কোনও ক্রমেই আপনার মনের শান্তি হইবে না।

তাপসের মুখে এই সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়া রাজার মনে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি সবিনয়ে বলিলেন, হে তাপস, আমি এক বিস্তীর্ণ রাজ্য খণ্ড পাইয়াছি, ধন রত্নেরও আমার অভাব নাই ; তথাপি, আমার ভোগ লালসা নিবৃত্ত হইতেছে না কেন ? তাপস কহিলেন, রাজন্, অগ্নিতে সর্ব্ব ক্ষণ ঘৃতাহুতি দিলে, কোন্ কালে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া থাকে ? ভোগ লালসাও প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, তাহাতে যত আহুতি দিবেন, ততই প্রবল হইয়া উঠিবে ; কোনও কালেই তাহার নিবৃত্তি হইবে না। আপনি ত রাজ্যভোগে লিপ্ত হইয়া আছেন, যখন জ্ঞানগুরু শুকদেব গোস্বামী এক খানি ছিন্ন কন্থার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তখন আপনি যে এই অতুল ঐশ্বর্য্য সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাজা কহিলেন, হে মহাভাগ, সে কথা আমার নিকট বিস্তারে বর্ণন করুন।

তাপস কহিলেন, নরনাথ, বেদব্যাস নন্দন শুকদেব পিতার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে যোগ শিক্ষা করিবার অভিলাষে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। পুত্রের অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া মহর্ষি বেদব্যাস কহিলেন, বৎস, তোমার যদি নিতান্তই যোগ শিখিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, মহাপ্রভু

জনক ঋষির নিকট গমন কর। পিতার উপদেশানুসারে শুকদেব জনক ঋষির ভবনে উপস্থিত হইলেন। জনক ঋষি শুকদেবকে নিতান্ত বালক দেখিয়া সহাস্য আস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, তুমি কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ ? শুকদেব কহিলেন, কিঞ্চিৎ যোগ শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে। ঋষিরাজ কহিলেন, উত্তম কল্প। এই রূপে শুকদেব রাজর্ষির নিকট যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন।

এক দিন গুরু ও শিষ্য একাসনে সমাসীন হইয়া যোগ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অল্প দূরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বৈশ্বানর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজর্ষি জনকের নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী ভস্মীভূত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্নি দেখিয়া শুকদেব কহিলেন, গুরো, ভৃত্যগণকে অনল নির্ব্বাণ করিতে আদেশ করুন ; নতুবা, এই অনল দ্বারা সমূহ অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে। ঋষিরাজ সে কথার কিছুই উত্তর দিলেন না ; পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ভাবে যোগ শাস্ত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। শুকদেব দেখিলেন, অনল ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তখন তিনি ভয় প্রযুক্ত আপনার কন্থা খানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। জনক ঋষি তদ্দৃষ্টে কহিলেন, ঋষিকুমার, এ কি করিলে ? সামান্য কন্থার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে না ? তবে তুমি কি প্রকারে যোগাভ্যাস করিবে ? সর্ব্ব ত্যাগী হইতে না পারিলে, যোগশাস্ত্রের অধিকারী হইতে পারা যায় না। আমি যদিও রাজত্ব করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহি। শুকদেব গুরুর কথায় লজ্জিত হইয়া কন্থা খানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে জনক ঋষি

হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস, এ আবার কি করিলে? তুমি এখনও চিত্ত শুদ্ধি করিতে পার নাই, এখনও তোমার স্তুতি তিরস্কার সমান জ্ঞান হয় নাই; আমার এই সামান্য তিরস্কার তোমার অসহ্য হইয়াছে। গুরুর কথা শুনিয়া শুকদেব বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, গুরুদেব, আপনার কথার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এই অজ্ঞ জনকে জ্ঞান দান করুন। এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, যোগশাস্ত্র শিক্ষা করা যার পর নাই সুকঠিন। জনক ঋষি কহিলেন, অদ্য এই খানেই বিশ্রাম। কল্য হইতে আমি তোমাকে সাধ্যানুসারে যোগ শিক্ষা দিব।

পর দিন শুকদেব যথা সময়ে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যোড়শী যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। গুরুর কদাচার দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া অবনত মস্তকে রহিলেন। ঋষিরাজ শিষ্যের মনোগত ভাব বুঝিয়া গম্ভীর স্বরে নিম্ন লিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন,—

"গৃহ্ণাতি দন্তৈঃ সুতমাখুমোক্তুঃ
পুষ্পেষু কাষ্ঠেষু বসন্তি ভৃঙ্গাঃ।
আলিঙ্গতে স্ত্রীঞ্চ সুতাং মনুষ্যঃ
প্রবৃত্তি রেষা মনসঃ প্রধানা॥"

হে শিষ্য, মার্জ্জারগণ যে সুতীক্ষ্ণ দন্তে ইন্দুর চর্ব্বণ করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ধারণ ও বহন করিবার সময় স্বীয় শাবকের গাত্রে দন্ত বিদ্ধ করে না। ভ্রমরগণ প্রস্ফুটিত সুকোমল পুষ্পে বসিয়া মধু পান করে, তাহাতে পুষ্পের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় না; কিন্তু তাহারাই কঠিন শুষ্ক কাষ্ঠে বসিয়া শত শত ছিদ্র করিয়া থাকে।

মানবগণ যে প্রবৃত্তির অধীন হইয়া প্রেমময়ী পত্নীকে হৃদয়ে ধারণ করে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রবৃত্তি বশে সেই হৃদয়েই বাৎসল্য রসের আধার স্নেহময়ী দুহিতাকে ধারণ করিয়া পুলকিত হয় ; অতএব, মনুষ্যের মনে প্রবৃত্তিই প্রধান। আমি যখন সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়াছি, তখন এই ষোড়শীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহি। আর একটি কথা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, রক্তজবার নিকট একটি মুক্তা রাখিলে, মুক্তাটি রক্তিমাভাময় হইয়া থাকে ; কিন্তু মুক্তার প্রভায় রক্তজবা কখন শ্বেতবর্ণ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, নিকৃষ্টের দোষের ভাগ উৎকৃষ্টে বর্ত্তে ; কিন্তু উৎকৃষ্টের গুণ নিকৃষ্টে বর্ত্তে না। দেখ, আমি এই মূর্ত্তিমান্ কামাগ্নি তুল্য কামিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনের কিছু মাত্র ভাবান্তর হইতেছে না, প্রত্যুত, স্নেহরসে হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। হে শিষ্য, মৃত্তিকা কিম্বা দারু নির্ম্মিত, অথবা চিত্রিত নারীমূর্ত্তি দেখিয়া অনেক স্থৈর্য্যহীন পুরুষের চিত্ত বিকার ঘটে ; কিন্তু প্রকৃত রমণী হৃদয়ে ধারণ করিয়াও সাধুজনেরা মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন। আমার হৃদয়স্থিতা রমণীকে কাষ্ঠময়ী প্রতিমা বলিয়া জানিও, এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে যে মণি মুক্তার আভরণ রহিয়াছে, এ সমুদায় আমার পক্ষে শুষ্ক হরীতকী ফল বলিয়া জানিও। আমি মৃতও নহি, জীবিতও নহি; আমি গৃহীও নহি, আমি সন্ন্যাসীও নহি; আমার শঙ্কা নাই, জন্ম নাই, জাতি নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, পিতা মাতা প্রভৃতি সংসার বন্ধন কেহই নাই। আমি অসংলিপ্ত ভাবে ইহ লোকে কাল যাপন করিতেছি।

হে শিষ্য, অগ্রে অহং তত্ত্ব দূর কর, তাহার পর, অনায়াসেই যোগ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। আমার বলিয়া কিছুই জ্ঞান করিও না; তোমার ছিল, এক্ষণে আমার হইল, ইহাও ভাবিও না। তুমিও তোমার নহ, এবং আমিও আমার নহি, কেবল চৈতন্য স্বরূপ এক ঈশ্বরই সমস্ত। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, অনায়াস লভ্য এক খানি প্রস্তর আনিয়া ভাস্করেরা একটি কল্পিত দেবমূর্ত্তি গঠন করিল। কোনও ধনাঢ্য লোকে সেই মূর্ত্তি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনিল, ও একটি উৎকৃষ্ট মন্দির প্রস্তুত করিয়া সেই মূর্ত্তি তাহার অভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল। ভাবিয়া দেখ, কল্পিত মূর্ত্তি যদি মুক্তিদাতা হইতে পারিত, তাহা হইলে, কল্পনা বশে দরিদ্র মনুষ্যে যে রাজ্য ভোগ করে, তাহাও সত্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে যে প্রস্তর খণ্ডের এক কপর্দ্দকও মূল্য ছিল না, এক্ষণে সেই প্রস্তরে দেবমূর্ত্তি গঠিত হওয়ায়, উহা মূল্যবান্ হইয়া উঠিল। আবার, সেই মূর্ত্তি যখন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাই নরের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা হইল। সেই রূপ যখন মুক্তা সমুদ্র গর্ভে ও হীরক মেদিনী গর্ভে ছিল, তখন তাহার এক কপর্দ্দকও মূল্য ছিল না। এক্ষণে জ্ঞানি লোকেরা এক বদরীফলের বিনিময়েও তাহা ক্রয় করিতে বাসনা করেন না; কিন্তু অজ্ঞানান্ধ ধনিগণ সেই সকল অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া আপনাদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে। আমার বিবেচনায় হীরক, মুক্তা ও মাণিক্য, এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি মনুষ্যকে এক অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই প্রদান করিতে সক্ষম নহে। অহঙ্কার যেমন আমাদিগের শত্রু বৃদ্ধি করে, সে রূপ আর কিছুতেই করে না; অতএব,

ঐ সকল দ্রব্য উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া কেবল পদে পদে আমা-দিগকে শত্রুর আশঙ্কা করিতে হয়। জ্ঞানি জনেরা সেই জন্যই তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমূল্য জ্ঞান রত্ন হৃদয় ভাণ্ডারে রাখিয়া পরমানন্দে শান্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া শুকদেব কহিলেন, আমার যথেষ্ট হইয়াছে; আর আপনাকে অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। ইহা বলিয়া শুকদেব আপন পরিধেয় বল্কল পরি-ত্যাগ করিয়া দিগম্বর বেশে জনকপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

যে ভূপাল পূর্ব্ব কথিত তাপসের নিকট তত্ত্ব কথা শুনিতে ছিলেন, তাঁহার মনোমধ্যে কাচ ও হীরক খণ্ডকে সমান, এবং কণ্ঠভূষণ মুক্তামালাকে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বোধ হওয়াতে, তিনি কহিয়া উঠিলেন, কি ভয়ানক ভ্রম! এই সকল পদার্থের প্রতি আমাদিগের এত দূর যত্ন? এই সকল পদার্থ অপচয় হইলে, আমাদিগের মনঃপীড়ার অবধি থাকে না? ইহাদিগেরই জন্য আমরা শশব্যস্ত? এই আমার কণ্ঠভূষণ মুক্তামালা দূরে নিক্ষেপ করিলাম। এই সকল পদার্থই যখন আমাদিগের শত্রু অপেক্ষাও শত্রু, ও শান্তি ভঙ্গের প্রধানতম কারণ, তখন আর ইহাতে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। এই সকল কথার পর রাজা রাজর্ষি হইয়া তাপসের সহিত কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ, যেমন সর্ব্বস্ব অপহৃত হইবার পর, নিধিরামের দিব্য জ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাহার শান্তি লাভ হইয়াছিল, মনে আর কিছু মাত্র ভয় ছিল না, সেই রূপ তাপসের যোগমার্গের কথা শুনিয়া পূর্ব্ব কথিত রাজার মুক্তাদিকে বদরী ফলবৎ জ্ঞান হইল। তিনি সংসারের মায়াজাল ছেদন করিয়া প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক

হইয়া উঠিলেন, এবং অমূল্য শান্তি লাভ করিলেন; কেননা, যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকেই পরম রত্ন জ্ঞানে তদীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, এবং সেই সকল ধন রত্নকে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বোধ করেন। উক্ত অসার বস্তু লাভে বা ক্ষয়ে তিনি কখনই আকুলিত হন না; সুতরাং, তাঁহার মনোমন্দিরে অনুক্ষণ শান্তি দেবী বিরাজ করিতে থাকেন। অতএব, যদি ইহ সংসারে শান্তি ভোগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, এক খণ্ড হীরক ও এক খণ্ড কাচকে সমান জ্ঞান করা উচিত; অকিঞ্চিৎকর পদার্থ লাভে বা ক্ষয়ে কদাচ আকুল হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মেদিনী মণ্ডলে থাকিয়া কালের উচিত কার্য্য কর, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত হইও না। ভ্রমরগণ প্রফুল্ল শতদলের মধু পান করিয়াও বেড়ায়, আবার, শুষ্ক কাষ্ঠ কর্ত্তন করিতেও ক্রটি করে না; কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণ মিষ্ট রসের আস্বাদ পাইয়া প্রাণ থাকিতেও আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এই জন্যই বলিতেছি, কালের উচিত কার্য্য কর, কিন্তু কিছুতেই অন্তরের সহিত লিপ্ত হইও না।

কৃষ্ণের জীবনী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি কালের উচিত কার্য্য করিতে কোনও সময়ে ক্রটি করিতেন না। কৈশোরে ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ যে ভাবে দিন যামিনী কামিনী মণ্ডলীতে কাল হরণ করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া কাহার না বোধ হইবে? তাহার পর, পিতৃশত্রু কংসরাজকে নিপাত করিবার জন্য মথুরা যাত্রা করিলেন, তখন ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেম একেবারে যমুনার জলে ভাসাইয়া

দিয়া বীর বেশে মথুরা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কংসকে নিপাত, পিতা মাতাকে কারামুক্ত ও মাতামহ উগ্রসেনকে পুনরায় রাজ্যে স্থাপন করিয়া বিদ্যার্জ্জনে অনুরাগী হইয়া উঠি-লেন। কিছু কালের মধ্যে নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রবল শত্রু জরাসন্ধের সহিত দীর্ঘ কাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। সে সময়েও তিনি মথুরায় আসিয়া কংস কিঙ্করী কুব্জার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে, জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ আরম্ভ করাতে, শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেন ও যাদবগণকে লইয়া সমুদ্রতীরস্থ একটি নিরাপদ স্থান মনোনীত করেন, এবং তাহার দ্বারকা নগর নাম দিয়া রাজা উগ্রসেনের রাজ সিংহাসন স্থাপিত করিলেন। দ্বারকায় আসিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন; কিন্তু কুব্জাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বারকায় উপনিবেশ সংস্থা-পন করিয়া পর্য্যায় ক্রমে রুক্মিণী প্রভৃতি আটটি সুরূপা রমণীর পানি গ্রহণ করেন। তৎপরে, দুর্দ্দান্ত নরকরাজকে বিনষ্ট করিয়া তদীয় অন্তঃপুর হইতে বহুসংখ্য বন্দিনী কামিনীগণকে দ্বার-কায় আনিয়াছিলেন। তৎকালের ব্যবস্থানুসারে সেই সকল কামিনী শ্রীকৃষ্ণেরই পরিণীতা হইয়াছিল। কাল ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিতে যদুকুল বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহারা ভুজবলে ও অর্থবলে উন্মত্ত হইয়া সংসারে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহাতে তিনি কৌশলে আপন সম্মুখে আপনার বিপুল বংশ ধ্বংশ করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বল-ভদ্রের সহিত মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। যখন যাদবেরা

বারুণী পানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদারম্ভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিবৃত্ত না করিয়া পদে পদে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগণ যখন পরস্পর যুদ্ধ করিয়া একে একে সমরাঙ্গনে শয়ন করিতে লাগিল, তখন তিনি দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের মৃত্যু দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার বংশনাশ হইতেছে বলিয়া অণুমাত্রও বিষাদিত হইলেন না।

কৃষ্ণ চরিত্রে যদিও অনেক অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন কথা আছে, কিন্তু আমরা তাহার এই মাত্র সার ভাগ গ্রহণ করিতেছি যে, তিনি বাল্যে, যৌবনে ও বৃদ্ধ কালে প্রকৃত সংসারীর ন্যায় সমস্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও কালে কিছুতেই লিপ্ত হন নাই। এই সংসার যে অলীক ও মায়াময়, তাহা তিনি আত্ম কার্য্যের দ্বারা সকলকে জানাইয়া গিয়াছেন। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে, অর্জ্জুন আত্মীয় বন্ধুগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল যোগের কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে ভগবদ্গীতায় তাহা পাঠ করিয়া এই সংসারকে নিতান্ত অলীক ও মায়াময় বলিয়া কাহার না উপলব্ধি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পদে পদে বলিয়াছিলেন যে, সখে, কালের উচিত কার্য্য কর, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিও না। এ সময় যদি সম্মুখ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে, ইহ কাল ও পরকাল দুই কাল নষ্ট করা হইবে। যদি আপাততঃ সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হও, তাহা হইলে, কৌরবেরা তোমাকে আর বীর পুরুষের মধ্যে গণ্য করিবে না। তাহাদিগের নিতান্ত বিশ্বাস হইবে যে, তুমি ভয় প্রযুক্তই ভীষ্মের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে বিরত হইলে। পূর্ব্বে ভুজবলে

যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলে, অদ্য তাহা বিনষ্ট করিতে বসিয়াছ; সুতরাং, ইহা দ্বারা ইহ কাল নষ্ট করা ভিন্ন আর কি বলিব? আবার ক্ষত্রিয় হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হইলে, নরকগামী হইতে হয়, তাহাও তুমি বিশিষ্ট রূপে অবগত আছ। আমি দারুকের মুখে শুনিয়াছি, সুভদ্রা হরণ কালে যখন আমার পুত্র পৌত্রগণ তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল, তুমি তৎকালে বীরদর্পে দারুককে বলিয়াছিলে, সারথে, শীঘ্র রথ ফিরাও, ক্ষত্রিয়গণ আমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে। সে সময় দারুক তোমার ন্যায় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, বীরবর, আমি রথ ফিরাইতে পারিব না! তুমি এই রথে উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের পুত্রগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহা আমি কখনই দেখিতে পারিব না; অতএব, আমরা সুভদ্রার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করি। দারুকের এই কথায় তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিয়াছিলে, কি! আমি শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিব? ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে বিরত হইব?

সখে, সুভদ্রা হরণ কালে প্রবল পরাক্রান্ত যাদবগণের সহিত যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুরোধে সংগ্রাম করিতে চাহিয়াছিলে, অদ্য কি বলিয়া সেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছ? তবে কি আমাদিগের অপেক্ষা আততায়ী দুর্য্যোধন তোমার প্রিয় হইল? আততায়ীকে বিনাশ করা ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ লিখিয়াছেন,— যে সকল লোকে গৃহে অগ্নি দেয়, বিষ পান করায়, ধনাদি অপহরণ করে, পদচ্যুত করে, ও বল পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিবার চেষ্টা পায়, তাহারাই আততায়ী। বলে ছলে ও কৌশলে এই রূপ আততায়ীকে অবশ্য বিনষ্ট করিবে। পূর্ব্বে

যে কয়েকটি আততায়ীর লক্ষণ বলিলাম, তোমাদের প্রতি দুর্য্যো-ধন ইহার কোন্‌টি করিতে বা কি রাখিয়াছে? সেই ভয়ানক আততায়ীকে সম্মুখ যুদ্ধে পাইয়া তুমি কি বলিয়া তাহার সংহারে বিরত হইতেছ? যাহারা আততায়ীর সাহায্য করে, তাহারাও আততায়ী। কুরু পাণ্ডবের সহিত ভীষ্মের কি সমান সম্বন্ধ নহে? দ্রোণাচার্য্য কি তোমাদিগেরও শিক্ষাগুরু নহেন? তবে তাঁহারা কি বলিয়া তোমাদিগের বিনাশার্থ অস্ত্রধারী হইয়া-ছেন? যে হেতু, তাঁহারা কর্ত্তব্য বিমূঢ় নহেন, তাঁহারা অন্নদাতা দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থে প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়াছেন। সখে, আমি তোমাকে সার কথা কহিতেছি, এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে; যে হেতু, কাল ইহা দিগকে সমর ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছে। তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র দুর্য্যোধন কেবল মাত্র কালের বশবর্ত্তী যইয়া পূর্ব্ব কথা সমস্ত বিস্মৃ-ত হইয়াছে। মৈত্র ঋষির অভিশাপ উহার মনে নাই, দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যদ্বাণীও উহার স্মরণ হইতেছে না। মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পদে পদে বলিয়াছেন যে, স্বয়ং ইন্দ্র আসিয়া যদি তোমার সহায়তা করেন, তথাপি, তুমি পাণ্ডববিজয়ী হইতে পা-রিবে না। দুর্য্যোধন তাহাতেও সম্মুখ সংগ্রামে বিরত হইল না। কি জন্য হইল না? উহার কালপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া। সখে, এই যুদ্ধে তুমি কেবল মাত্র নিমিত্তের ভাগী হইবে; নতুবা, এই সমস্ত সৈন্যই অচিরাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে। অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি মায়ায় মুগ্ধ হইও না, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কার্য্য কর। কে কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে? কে বা কাহার শত্রু? কালই সকলের অরি, কালই সকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়

কুল নিধন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাদিগকে সমরশায়ী করিবার তুমি উপলক্ষ মাত্র হইবে। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই 'আমার আমার' করিয়া সংসার রূপ কারাগারে আবদ্ধ হয়। তোমার যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া এরূপ মোহ উপস্থিত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। অর্জ্জুন, সমাগত যোদ্ধৃগণের যদি পরমায়ু থাকে, তাহা হইলে তোমার অস্ত্রাঘাতে কখনই বিনষ্ট হইবে না; আর যদি কাল আগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভীম-সেনের এক হুঙ্কার ধ্বনি উপলক্ষ করিয়া দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরাঙ্গনে শয়ন করিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

কৃষ্ণের এই সকল যোগ কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের মোহান্ধ-কার দূর হইল। তিনি সদর্পে গাণ্ডীব ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। সংসার বিমুক্ত পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ কাহারও মোহ পাশ ছিন্ন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিধায় সংসারী হইয়াও সংসারে কোনও বিষয়েই লিপ্ত ছিলেন না, ভগবদ্গীতায় তাহা বিশেষ প্রমাণ হইয়াছে। তিনি যদিও সংসা-রীর ন্যায় সকল কার্য্যই করিতেন, কিন্তু এই সংসার যে অলীক ও মায়াময়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম মতে দেহের বিনাশই জীবের মুক্তি। সেই অনা-য়াস লভ্য মুক্তির জন্য কেবল অজ্ঞ জনেরাই ক্রিয়া কাণ্ড জপ তপ করিয়া অনর্থক শরীরকে কষ্ট দিয়া থাকে। এই মত খণ্ডন করিয়া এক জন মহাপুরুষ লিখিয়াছেন যে, যদি "মৃত্যুরেব মুক্তিরিতি" এই কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, শূকরেরাও কেন মুক্তি লাভ করুক না? পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার মতে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান

নাই, তাহার মুক্তি কি রূপে সম্ভবে? মৃত্যুর পর যাহা হইবে হউক, কিন্তু জীবন্মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ এই;—

"জীবঃ শিবঃ সর্ব্বত্রৈব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একমেবাভিপশ্যন্ বৈ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ, জীব মাত্রেই শিব স্বরূপ; কারণ, এক মাত্র পরব্রহ্মই সর্ব্ব ভূতে বিরাজিত আছেন। এই রূপে যিনি সর্ব্ব ক্ষণ সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত কথিত হইয়া থাকেন।

"কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

কাহারও কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতিতে কিছু মাত্র জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি যদি সমুদায় কর্ম্মকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া জানেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহা যাইতে পারে।

"সর্ব্ব ভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বেত্তি যঃ।
একমেবাভিপশ্যন্ বৈ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

যিনি আত্মাকে সর্ব্ব ভূতস্থ জানিয়া এই জগৎ সংসারকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, যিনি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। যেমন উজ্জ্বল প্রভাকর সহস্র সহস্র জল পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ, তাহার একটিতেও লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও সেই রূপ সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়াও সংসার সুলভ সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। যাঁহার

এই রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত পুরুষ; কেননা, সাংসারিক সুখ দুঃখে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, এবং স্বর্গ, পরকাল ও মুক্তির জন্যও তিনি ব্যতিব্যস্ত নহেন।

" শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জ্জিতম্।
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ "

যিনি এই সংসারের যাবদীয় কার্য্যে শোক মোহাদি রহিত হন, ও কার্য্য সকলের শুভাশুভ ফলের কামনা পরিত্যাগী হইয়া কেবল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অভীষ্ট কার্য্য সমাধা করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইলে, সংসার যে সম্পূর্ণ মায়াময়, তাহা বিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। ইহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করা উচিত যে, পৃথিবীর কোনও বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান আমাদিগের নাই, কেবল তাহাদিগের কতকগুলি গুণ আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অবগত হই, এই মাত্র। ইহ সংসারে সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অদ্য যে ব্যক্তি রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শত শত লোকের উপর আধিপত্য করিতেছেন, কল্য আবার হয়ত তিনিই ভিখারী হইতে পারেন। অদ্য যে স্থানে নদী প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, কিছু কাল পরে হয়ত সেই স্থানে একটি বহু জনাকীর্ণ নগর হইতে পারে। এই যে রক্ত মাংসের সুন্দর শরীর অদ্য সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা শোভা দর্শন করিতেছে, অহঙ্কারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পৃথিবীকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছে, হয়ত, কল্য সেই শরীরই চৈতন্য রহিত হইয়া ভস্ম রাশিতে পরিণত হইবে। অতএব, এই

বিবেক ও বৈরাগ্য।

সংসারের তাবদীয় বস্তুই অলীক, কেবল সেই চৈতন্য স্বরূপ জগদীশ্বরই এক মাত্র সত্য পদার্থ। যে ব্যক্তি মনে এই রূপ অটল বিশ্বাস ও ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া ন্যায় ও যুক্তি সহকারে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করেন, এবং আনন্দে উন্মত্ত বা শোক মোহ ও মৃত্যু ভয়ে অভিভূত না হন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ, ও সেই ব্যক্তিই অনেকাংশে শান্তি সুখের অধিকারী হইয়া পৃথিবীতে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম সমাপ্ত।

CALCUTTA

Aroonodoy Ghose Printer Vidya Ratna Press.

285 Upper Chitpore Road.

বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম।

অর্থাৎ

মনের শান্তি ও বিবেক উদ্দীপক কতিপয় প্রস্তাব।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলম্।"

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, রাজবাটী, ২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা ২৮৫ সংখ্যক অপর চিৎপুর রোড্
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৬।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা, রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।



পূর্ব্বভাষ।

মৎ প্রণীত বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা গ্রন্থ আদরের সহিত সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে উৎসাহের সহিত বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ন্যায় বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণীত বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম কিয়দংশেও যদি পাঠার্থিগণের শান্তিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, শ্রম সফল ও অর্থ-ব্যয় সার্থক বোধ করিব। বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার নিতান্ত ভক্তি-ভাজন শিক্ষা-গুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা, রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্;
আশ্বিন, ১৮০৫ শকাব্দাঃ।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বভাষ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম বারে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল, তৎসমুদায় যথাসাধ্য সংশোধিত হইয়াছে; অনেক স্থলে আবশ্যক বোধে ভাষাগত পরিবর্ত্তও ঘটিয়াছে। তথাপি, এখনও যে ইহা একেবারে দোষ শূন্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই বলিতে পারা যায় না; কেননা, মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রায়ই সকল পাঠকের নিকট সুন্দর ও মনোহর হওয়া সহজ নহে। অতএব, কৃতবিদ্য মহাশয়গণ এই সংস্করণেরও সংশোধন এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য যে-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহাই সাদরে ও সযত্নে কৃতজ্ঞতা সহকারে পরিগৃহীত হইবে।

কলিকাতা, রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্;
পৌষ, ১৮০৬ শকাব্দাঃ।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।